ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

[অর্থাৎ চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম।]

উত্তর বিভাগ।

তৃতীয় সংস্করণ।

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

[আদি পুরাণ।]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

নূতন আর্য্য যন্ত্রে

শ্রীগৌরমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৩।১ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন।

শকাব্দা ১৮০৬ শ্রাবণ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

—o—

ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকার পূর্ব্ব বিভাগের প্রথম সংস্করণ তিন মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। ইহার উত্তর বিভাগও মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। যেরূপ আগ্রহের সহিত সকলে এই পুস্তক ক্রয় করিতেছেন, তদ্দর্শনে উৎসাহী হইয়া আমি পূর্ব্ববিভাগ পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিলাম। প্রথম বারের অবতরণিকার কোন কোন স্থান পরিবর্জ্জন করিয়া তাহাতে নূতন সন্নিবেশ করা হইল।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

[উত্তর বিভাগ]

চৈতন্যের নীলাচল গমন !

অনন্তর হে যুবক বন্ধুগণ ! গায়ক মুকুন্দের প্রমুখাৎ প্রভুর উৎকল দেশগমনের বৃত্তান্ত আমি যাহা যাহা শুনিয়াছি বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই তেজস্বী প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষ এইরূপে স্নেহময়ী জননী, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, এবং অনুগত প্রাণতুল্য পারিষদ ধর্ম্মবন্ধু ও সংসারের যাবতীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে ভিখারীর বেশে বনপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশের নবাব সৈয়দ্ হুসেন সাহার সঙ্গে উড়িষ্যানৃপতির মহাসংগ্রাম চলিতেছিল। একে পথ অতি দুর্গম, তাহাতে দস্যুভয়ে আরও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাঁরা গঙ্গার ধারে ধারে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথে এক স্থানে মহাপ্রভু আপনার সঙ্গীদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সঙ্গে কে কি সম্বল লইয়া আসিয়াছ নিষ্কপটে বল। যখন শুনিলেন তাঁহার বিনা অনুমতিতে কাহারো নিকট কিছু লইবার তাঁহাদের ক্ষমতা নাই, তখন গৌরচন্দ্র নিরতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন দেখ, ভক্ষ্য বস্তু ভগবান্ যে দিন দিবেন অরণ্যে বসিয়া থাকিলেও সে দিন তাহা মিলিবে। কিন্তু তিনি যে দিন না দেন, রাজপুত্র হইলেও তাঁহাকে সে দিন উপবাস করিতে হয়। এক জনের অন্ন প্রস্তুত আছে, হয়ত অকস্মাৎ কাহারো সঙ্গে বিবাদ করিয়া সে ক্রোধভরে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল যে আজ আমি ভাত খাইব না। কিংবা আহারের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে এমন সময় দেহে হঠাৎ জ্বরের সঞ্চার হইল। অতএব জানিবে, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেই

দয়াময় অন্নদাতা সমস্ত ভূমণ্ডলে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার যে দিন আদেশ থাকিবে সে দিন সর্ব্বত্র অন্ন মিলিবে।

হরিকথা কহিতে কহিতে এবং হরিগুণ গাইতে গাইতে ক্রমে ইহাঁরা আঠিসারা নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং অনন্ত নামক এক গৃহস্থভবনে এক রাত্রি বাস করেন। পর দিন প্রাতে হরিস্মরণপূর্ব্বক বাহির হইয়া ছত্র-ভোগে সকলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ভাগীরথীস্রোত শতধা বিভিন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। সেই তরঙ্গা-কুলিত সুবিস্তীর্ণ জলরাশিদর্শনে চৈতন্যের মন আহ্লাদে পূর্ণ হইয়াছিল। স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খাঁ এক জন পরম ভক্ত, তিনি বহু সমাদরে সাধুদিগকে আপনার আলয়ে রাখিলেন এবং যত্ন সহকারে উড়িষ্যা প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। রজনীতে মহানন্দে ভক্তগণ তথায় সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। হরিনামরসে রামচন্দ্রের ভবন আনন্দময় হইল। প্রতিবাসী শত শত নর নারী সেখানে সমবেত হইয়াছিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালাপ করিয়া নিশাবসানে তাঁহারা নৌকারোহণ করিলেন। নদীর সলিলসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে এবং লহরীলীলা সন্দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় পুলকিত হইল, চৈতন্যের আদেশে মুকুন্দ গান ধরিলেন। নাবিক সঙ্গীত ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া বলিল "ওগো ঠাকুর! যে পর্য্যন্ত উড়িষ্যা দেশে না যাই তাবৎ কাল তোমরা একটু নীরব হইয়া থাক; এখানে জলে কুমীর, উপরে বাঘ, নৌকাযোগে দস্যু-দল স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে, তাহারা জানিতে পারিলে এখনই সকলের প্রাণ নষ্ট করিবে"। নাবিকের বাক্যে সঙ্গিগণকে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়া গৌরসিংহ হরি! হরি! বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। নাবিক ভাবিল কি বিপদ্! সাবধান করিতে গিয়া যে আরও গোল বাধিল দেখিতেছি! চৈতন্য সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, "কেন? তোমরা কাহার জন্য এত ভয় কর? বৈষ্ণবগণের বিঘ্নহারী দয়াময় প্রভুর সুদর্শন চক্র এই না সম্মুখে ফিরিতেছে? কিছু চিন্তা নাই, সঙ্কীর্ত্তন কর, তোমরা কি সুদর্শন চক্র দেখিতে পাইতেছ না? হরিভক্ত জনকে কে সংহার করিতে পারে? বিষ্ণুর চক্র তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত

নিরন্তর ঘুরিতেছে"। বিশ্বাসী ভক্তগণ স্বীয় অভীষ্টদেবের দৃষ্টিরূপ অভয়প্রদ কবচে সদাকাল আবৃত থাকিয়া সর্ব্বত্র তন্ময় দর্শন করেন, ভীরু নাবিকের বাক্য কি তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারে? গৌরের অগ্নিময় জীবন্ত বাক্যশ্রবণে সকলে অভয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন সকলে নির্ভরচিত্তে আনন্দমনে গান করিতে করিতে চলিলেন এবং নিরাপদে যথাসময়ে উৎকলদেশে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সমাগমবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্দেশীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ পথে স্থানে স্থানে দেখা করিতে আসিয়া ছিলেন।

এক দিন গৌরসুন্দর সঙ্গীদিগকে এক দেবালয়ের নিকট রাখিয়া একাকী পল্লীমধ্যে ভিক্ষা করিতে যান। তাঁহার অনুপম দেহলাবণ্য দেখিয়া গৃহস্থ নরনারীগণ বিবিধ উপাদেয় ফল শস্য এবং তণ্ডুল আনিয়া দিতে লাগিল। সর্ব্বলোকপূজ্য ভক্তাবতার মহাপুরুষ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছেন, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তরুতল আশ্রয় করিয়াছেন, চিরবৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, পৃথিবীতে এ দৃশ্য কি মনোহর! সকলের উপযুক্ত ভিক্ষা আনিয়া তিনি পুনর্ব্বার বন্ধুবর্গের নিকট উপস্থিত হই-লেন। তাঁহারা প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলি-লেন "বুঝিলাম ঠাকুর তুমি আমাদিগকে পুষিতে পারিবে!" গদাধর এই তণ্ডুল রন্ধন করিয়া ভক্তবৃন্দের সেবা করেন।

পথে এক স্থানে নদী পার হইতে হইবে, পারের নাবিক জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! তোমার সঙ্গে কয় জন লোক আছে? চৈতন্য বলিলেন আমার সঙ্গে কেহ নাই, আমি একাকী, এবং সকলি আমারই। এইকথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। নাবিক বলিল ঠাকুর, তুমি পার হইয়া যাও, কিন্তু দান না লইয়া এ সকল লোককে আমি ছাড়িয়া দিব না। প্রথমে তিনি একাকী পার হইয়া পরপারে এক স্থানে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন দেখিয়া সঙ্গিগণের চিত্তে যুগ-পৎ বিষাদ এবং কৌতূহলের উদয় হইল। তাঁহারা কিছু বিস্মিত হইলেন এবং গুরুদেবের নিরপেক্ষ ভাব দর্শনে তাঁহাদের কিছু আমোদও বোধ

হইল। নিত্যানন্দ সকলকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়া কখন যাইবেন না। নাবিক কহিল, তোমরাত সন্ন্যাসীর লোক নহ, তবে আমাকে দান দিয়া পার হইয়া চলিয়া যাও। এদিকে চৈতন্য অধোমুখে বসিয়া এমনি রোদন আরম্ভ করিয়াছেন যে তাহা শ্রবণে পাষাণ বিগলিত হইয়া যায়। নাবিক এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে সঙ্গীদিগকে প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ভক্তগণ তাহার নিকট আপনাদের এবং গৌরের পরিচয় দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন তখন নাবিকের মোহাসক্ত কঠিন হৃদয় বিগলিত হইল, এবং সে সকলকে বিনামূল্যে পার করিয়া দিয়া চৈতন্যের পদতলে লুটাইতে লাগিল।

এই রূপে তাঁহারা আনন্দ মনে হরিগুণ গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। গৌরের প্রেমের বেগ এমনি প্রবল যে, শত শত ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিতেছেন তথাপি কিছুমাত্র শ্রান্তিবোধ নাই। ধর্ম্মের জন্য সে সময় তাঁহারা কত কষ্টই সহ্য করিয়া গিয়াছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ অনিদ্রায় তাঁহাদের হৃদয়ের শান্তি সুখ উদ্যম হরণ করিতে পারিত না। এক দিন জগদানন্দ নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষা করিতে যান, আসিয়া দেখেন যে নিতাই দণ্ড গাছটি ভগ্ন করিয়া বসিয়া আছেন, ইহাতে জগদানন্দের মনে ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। "আমি যাঁহাকে হৃদয়ে বহন করি, সেই প্রাণাধিক গৌরচন্দ্র দণ্ড বহন করিবেন," এই ভাবিয়া নিতাই তাহা ভগ্ন করিয়াছিলেন। চৈতন্য এ কথা শুনিয়া বলিলেন নিতাই, কেন তুমি আমার দণ্ড ভগ্ন করিলে? অবধূত উত্তর করিলেন, বাঁশখান ভাঙ্গিয়াছি, যদি ক্ষমা করিতে না পার শাস্তি দাও। গৌরচন্দ্র বলিলেন, যে দণ্ড সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান স্থান তাহা কি তোমার মতে এক খান বাঁশ হইল? চৈতন্যের গম্ভীর আত্মা, স্নেহপূর্ণ হৃদয় কখন কঠোর হইতে জানে না, যাহাকে তিনি প্রহার করেন সে ব্যক্তিও প্রেমে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, প্রাণতুল্য শিষ্যদিগের প্রতিও তাঁহার নিতান্ত নিরপেক্ষ ব্যবহার ছিল। তখন

মহাপ্রভু দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, একমাত্র দণ্ড আমার সঙ্গী ছিল, ঈশ্বরপ্রসাদে তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল; যাউক, আর আমার সঙ্গী কেহ নাই, এক্ষণে হয় তোমরা অগ্রসর হও, না হয় বল আমি আগে চলিয়া যাই। শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার, অভিমান রাগের মধ্যেও যেন প্রেমরসপরিপূর্ণ। মুকুন্দ বলিলেন তবে তুমিই আগে যাও, আমরা পশ্চাতে যাইতেছি। এইস্থান হইতে জলেশ্বরের দেবমন্দির পর্য্যন্ত গৌরসুন্দর একাকী আপনার ভাবে মগ্ন হইয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে অনুগামী সঙ্গীগণের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া ঐ স্থানে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ করেন। অল্প কাল বিচ্ছেদের পর গৌরের ভ্রাতৃপ্রেমানল যেন আরও জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তখন তিনি নিতাইকে কোলে লইয়া বলিলেন নিতাই, কোথায় তুমি আমার সন্ন্যাসব্রতের সাহায্য করিবে, তাহা না করিয়া তুমি আমাকে আরও পাগল করিতে চাও? আমার মাথা খাও আর এমন কর্ম্ম করিও না। তদন্তর নিতাইয়ের অনেক প্রশংসা করিলেন, তাহা শুনিয়া অবধূতের মহা লজ্জা বোধ হইল। পথে এক স্থানে পঞ্চ মকারের সেবক একজন মদ্যপায়ী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়, সে ইহাদিগকে আপনার মঠে লইয়া আনন্দ করিতে চাহিয়াছিল। পুরীর পথে অনেক সুরম্য দেবালয় এবং রমণীয় স্থান আছে, প্রায় প্রত্যেক স্থানেই মহাপ্রভু নৃত্য গীত সঙ্কীর্ত্তন বিহার করিয়াছিলেন। দেবমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। হরিভক্তিরসে সর্ব্বক্ষণ জীবন অভিষিক্ত, প্রাকৃতিক বাহ্য শোভা দেখিয়াই মনে কত আহ্লাদ, দেবালয় বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিলেত হইবেই, কারণ তাহার সঙ্গে তিনি চির দিন পবিত্র ভাবযোগে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ ছিলেন। যাজপুর, কটক, ভুবনেশ্বর অতিক্রম করিয়া কমলপুর নামক স্থানে তাঁহারা সকলে উত্তীর্ণ হইলেন। সেখান হইতে জগন্নাথের ধ্বজা নয়নগোচর হয়। ধ্বজা দেখিয়াই চৈতন্যদেব ভাবে একবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। এস্থান হইতে পুরী চারি দণ্ডের পথ, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিয়া আসিতে তাঁহার তিন প্রহর সময় লাগিয়াছিল। মহাভাবরসে মণ্ডিত গৌরতনু দর্শনে তীর্থবাসী সাধু এবং অপর যাত্রিগণ এককালে মুগ্ধ

হইয়া গেল। সে রূপ যাহারা একবার দেখিল তাহারা আর ভুলিতে পারিল না। জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া গৌরচন্দ্র আপনার সমভিব্যাহারী ভক্তগণের নিকট প্রমুক্তহৃদয়ে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ দেবের অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য চৈতন্যের এত দূর ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে, শেষোক্ত স্থানে তিনি সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী পুরীর মধ্যে চলিয়া যান। দুই চক্ষে নিরন্তর প্রেমের অগ্নি জ্বলিতেছে, যাহা কিছু দেখেন তাহাতেই ভাবোদয় হয়, বিশেষতঃ তখন জগন্নাথের দর্শনপিপাসা তাঁহার মনে অতিশয় ঘনীভূত হইয়াছিল; শ্রীমন্দিরে পৌঁছিয়া যাই সেই সুন্দর বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিলেন, অমনি অনুরাগের আবেশে উন্মত্ত হইয়া ঠাকুরকে কোলে করিবার জন্য সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত আর যাইতে হইল না, মন্দিরমধ্যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। তৎকালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে পাণ্ডাদিগের বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিয়া নিজশিষ্য দ্বারা আপন ভবনে পাঠাইয়া দেন। নবীন সন্ন্যাসীর অসাধারণ প্রেমবিকার, তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তি অবলোকনে ভট্টাচার্য্যের মন বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল। গৌরাঙ্গের সে দিনকার মূর্চ্ছা অতি গাঢ় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। এমন প্রগাঢ় মূর্চ্ছা যে, তিনি জীবিত কি মৃত তাহা জানিবার জন্য তাঁহার নাসিকার নিকট তুলা রাখিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। তদনন্তর রাজপণ্ডিত স্থির হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, এত দেখিতেছি নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের জীবনে যে সুদীপ্ত মহাভাব লক্ষিত হয় সেই প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার! এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ভাবদর্শনান্তর সুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষণকাল স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

এ দিকে নিতাই মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়া পথিকদিগের মুখে শুনিলেন, একজন গোসাঞী মন্দিরে এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া-

ছেন। ইত্যবসরে হঠাৎ সেই স্থানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি নবদ্বীপবাসী বিশারদের জামাতা, সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি, এবং গৌরের এক জন অনুবর্ত্তী প্রেমিক বৈষ্ণব। গোপীনাথকে পাইয়া তাঁহারা বড় আহ্লাদিত হইলেন। পরে তাঁহার সঙ্গে সকলে উক্ত ভট্টাচার্য্যের আলয়ে উপনীত হন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এক জন প্রসিদ্ধ তত্বজ্ঞানপরায়ণ পণ্ডিত, নিবাস পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল, এক্ষণে পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত এবং জগন্নাথমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। চৈতন্য সেই যে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন আর সংজ্ঞামাত্র নাই, তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থাতে অতিবাহিত হইল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ জন প্রভুকে তদবস্থায় রাখিয়া জগন্নাথদর্শনে চলিয়া গেলেন। গৌরের অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া সার্ব্বভৌমের মনে শঙ্কা হইয়াছিল যে পাছে নিত্যানন্দাদি সঙ্গিগণও মন্দিরমধ্যে গিয়া বেসামাল হইয়া পড়েন, তজ্জন্য তিনি আবার সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি এবং আগন্তুক মুকুন্দকে নিকটে রাখিয়া সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করত জানিলেন যে তিনি বিশারদের বন্ধু নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের মনে বড় আশ্চর্য্য ভাব উদয় হইল। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ ফিরিয়া আসিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চৈতন্যের মূর্চ্ছাপনোদন করেন। চেতনা লাভ করিয়া মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন, পরে একত্র সকলের সঙ্গে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। প্রসাদের মধ্যে লাফরাঘণ্ট তাঁহার নিকট বড় উপাদেয় বোধ হইয়াছিল। আর আর সমস্ত সুখ্যাদ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবল লাফরা (ভুতঘণ্ট) আর ভাত খাইলেন। সার্ব্বভৌম স্বহস্তে তাঁহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই প্রেমোন্মত্ত যুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার চিত্ত ভাবান্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর গোপীনাথ আপনার মাসীর ভবনে আগন্তুক ভক্তদিগের জন্য বাসা স্থির করিয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌমের ভক্তি গ্রহণ

মত্ততার অবসানে গৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বসিলে সার্ব্বভৌম "নমো নারায়ণ" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, শচীতনয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক!" তিনি যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহা তখন ভট্টাচার্য্যের বোধগম্য হইল। সার্ব্বভৌম জ্ঞানেতে অদ্বৈতবাদী কিন্তু বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানে কিয়ৎ পরিমাণে বৈষ্ণবের ন্যায় ছিলেন। এই কারণে তিনি পণ্ডিত হইয়াও জগন্নাথের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন? পণ্ডিত মানুষ কি না, ভারতী ইত্যাদি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে অতি নিকৃষ্ট মনে করিতেন। তিনি অনুষ্ঠানে পৌরাণিক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতেতে বৈদান্তিক দর্শনবিদ্ ছিলেন, এই জন্য উভয় ভাবের আভাস তাঁহার ব্যবহারে লক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি গৌরাঙ্গকে বলিলেন সহজেই তুমি পূজ্য তাহাতে আবার সন্ন্যাসী, অতএব আমি তোমার দাস হইলাম। ইহা শুনিয়া চৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করত বলিলেন, আমি বালক, কিছুই জানি না, তুমি গুরুতুল্য ব্যক্তি, তোমার আশ্রয় লইয়াছি, আমার প্রতি দয়া রাখিবে, অদ্য তোমারই কৃপায় আমি শ্রীমন্দিরে রক্ষা পাইয়াছি, আর আমি ভিতরে যাইব না, বাহিরে থাকিয়া ঠাকুর দর্শন করিব। যাহাতে আমি ভাল থাকি, সংসারকূপে না পড়ি, এমন উপদেশ তুমি আমাকে দাও, তোমার কৃপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত বলিলেন তুমি এত অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হইয়া ভাল কর নাই। যদিও মাধবপুরী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সমস্ত বিষয়সুখ ভোগ করিয়া শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হন। সার্ব্বভৌমের সহিত আলাপ করিয়া গৌরচন্দ্র গোপীনাথের সঙ্গে নূতন বাসায় চলিয়া গেলেন, এবং সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের আরতি দেখিলেন।

এইরূপে তাঁহারা পুরীতে থাকেন, এক দিন মুকুন্দ এবং গোপীনাথ

সার্ব্বভৌমের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন দেখ, এই বিনীতস্বভাব প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রতি আমার অত্যন্ত ভালবাসা সঞ্চারিত হইয়াছে, এমন যৌবন বয়সে ইহাঁর সন্ন্যাসধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পাইবে তাহাই ভাবিতেছি, আমি তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। ইনি কাহার নিকট দীক্ষিত হইলেন, ইহাঁর উপদেষ্টা কে, বল দেখি শুনি? যখন শুনিলেন ভারতীসম্প্রদায়ের কেশব ভারতী নামক দণ্ডীর নিকট চৈতন্য দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন ভট্টাচার্য্যের মন বড় ক্ষুব্ধ হইল। তাঁহাকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়া গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হওয়াই উদ্দেশ্য, অমুক সম্প্রদায় ভাল কি অমুক সম্প্রদায় মন্দ তদ্বিষয়ে প্রভুর দৃষ্টি নাই, সে সব কেবল লোকগৌরব বাহ্য ভাব মাত্র। ভট্টাচার্য্য এ কথার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, লৌকিক বাহ্যাড়ম্বর ইহাতে লিপ্ত আছে বলিয়া কোন আশ্রমকে উজ্জ্বল করা এই ব্যবহারটি সামান্য মনে করিবে না। তাঁহার মতে গিরি, পুরী, তীর্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ। আশ্রম বা সম্প্রদায়নিষ্ঠা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে এত প্রবল দেখা যায় ইহার ভিতরে একটি গভীর অর্থ আছে। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণোক্ত শ্লোকের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সম্প্রদায়-বর্জ্জিত ব্যক্তিদিগের মন্ত্র নিষ্ফল হয়। এই জন্য বৈষ্ণবগণ সর্ব্বাগ্রে সম্প্রদায়, শ্রীপাট, গুরু ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সম্প্রদায় যে বিধিপ্রেরিত মুক্তির বিধান এতদ্দ্বারা এই গুরুতর সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে। বিধানে অর্থাৎ সম্প্রদায়ে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে ধর্ম্মদ্রোহী যথেচ্ছাচারী বলিয়া যে তাঁহারা মনে করিতেন ইহা আমার ভাল লাগিত না। কারণ ভগবান্ সকল ঘটেই বিরাজ করেন, তিনি পতিতপাবন অগতির গতি; তবে বিধানবিরোধী ব্যক্তি যে কঠোরহৃদয় বৌদ্ধ, ভক্তিরসহীন অল্পবিশ্বাসী, এ সংস্কার আমার এখনও আছে এবং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পরে সম্প্রদায়ের গুরু লঘু বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, যদি আমি ইহাঁকে পাই, তাহা হইলে বেদান্ত শুনাইয়া যোগপট্ট পরাইয়া পুনরায় অদ্বৈত-

মার্গে আনয়ন করি। এ কথা শ্রবণে গোপীনাথ নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন তুমি ইহাঁর মহিমা জান না, স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভূরি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ সত্য, কিন্তু ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত গৌরের তত্ত্ব কেহ বুঝিতে পারে না। সার্ব্বভৌমের ছাত্রগণ গোপীনাথের কথা শুনিয়া উপহাস করিল, এবং অনুমান ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এইরূপ বলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য নিজেও, কলিতে যুগাবতার হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন উল্লেখ নাই, ইহা অপ্রামাণ্য কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইত্যাদি অনেক কথার বাদানুবাদ করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন, জ্ঞানেতে বস্তুতত্ত্ব কেবল জানা যায় মাত্র, কিন্তু ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন সে বস্তুর প্রমাণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। অতএব ভট্টাচার্য্য, তুমি প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিয়াও বস্তু চিনিতে পারিলে না? শ্যালক ভগিনীপতি সম্বন্ধ, তর্কের সঙ্গে উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু উপহাস বিদ্রূপও চলিয়াছিল। কিন্তু মুখে তর্ক বিতর্ক করিলে কি হইবে, ও দিকে গৌরপ্রেমের সুতীক্ষ্ণ বড়শীতে সার্ব্বভৌমের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদ, জ্ঞান এবং ভক্তিপথসম্বন্ধে উভয়েই বহুল শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। সে সময় প্রধান প্রধান ভক্ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। লিখিত শাস্ত্রসকল পণ্ডিতদিগের আন্তরিক মত বিশ্বাস ও অভিপ্রায়ের অধীন, ভাষার উপর সমধিক অধিকার থাকিলে একই শাস্ত্র দ্বারা তাঁহারা পরস্পরবিরোধী মতকে সমর্থন করিতে পারেন। তৎকালে মায়াবাদী পণ্ডিত হিন্দু শাক্তগণ এবং ভক্তিপথাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এ প্রকার তর্কবিবাদের অল্পতা ছিল না। গোপীনাথ বিতণ্ডা করিতে করিতে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া দুই একটা শক্ত কথাও বলিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌম বলিলেন, তুমি এখন বাসায় যাও, গোসাঞীজীকে আমার নিমন্ত্রণ বলিবে, কল্য সশিষ্য তিনি আমার গৃহে যেন ভিক্ষা করেন।

চৈতন্য গোপীনাথের প্রমুখাৎ ঐ সমস্ত বাদানুবাদের কথা শুনিলেন,

কিন্তু সার্ব্বভৌমের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন না, বরং তাঁহার বিষয়ে অনুরাগ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে সেই রাজপণ্ডিত দিগ্‌গজ জ্ঞানীকে তিনি বিনয় ভক্তির জালে একবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমের বয়ঃক্রমও অধিক, অন্তরে জ্ঞানের যথেষ্ট গরিমাও আছে, গৌরকে আপনার মতে আনিবেন, বেদান্ত শুনাইবেন, এই বড় অভিলাষ। বিচারে পরাজয় করিয়া তাঁহার উপর যে স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করিবেন এরূপ ইচ্ছা নহে, কেন না মহাপ্রভুর স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তিতে তিনি ইতিপূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে শাস্ত্রানুযায়ী প্রকৃত সন্ন্যাসী করিতে তাঁহার মনে বড় ঔৎসুক্য জন্মে। এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভুর দেখা পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেদান্ত পড়িতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে স্নেহসম্বোধন পুরঃসর বলিলেন, দেখ বাপু! বেদান্ত শ্রবণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, অতএব আমি পাঠ করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। ক্রমাগত উপর্য্যুপরি সাত দিন তিনি পড়িয়া যান, চৈতন্যের মুখে হাঁ কি না, কোন কথাই নাই, বিনম্রভাবে অনুগত শিষ্যের ন্যায় কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ক্রমাগত সাত দিন কেবল শুনিয়াই যাইতেছ, ভাল মন্দ কিছুই বল না, বুঝিতেছ কি না, তাহাও জানি না, এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কিছু প্রকাশ কর? সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি মূর্খ, কি জানি, কিই বা বলিব, তোমার আজ্ঞায় এবং সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুরোধে কেবল মাত্র শুনিতেছি, কিন্তু তোমার কৃত অর্থ আমার বোধগম্য হইতেছে না। সূত্রের অর্থ বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি কিন্তু ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার চিত্ত বিকল হইতেছে। ভাষ্যের দ্বারা সূত্রের অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তুমি সেই ভাষ্য দ্বারা সূত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া কল্পিত গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিতেছ। ব্যাসসূত্রে উপনিষদের যথার্থ অর্থ প্রকাশিত আছে, কিন্তু তোমার স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘের ন্যায় সূর্য্যকিরণতুল্য সেই মূলার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বেদ এবং পুরাণে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু, ঐশ্বর্য্য লক্ষণে ভূষিত হইয়া তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান্ তাঁহাকে

তুমি নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ? শ্রুতি সকল তাঁহাকে এই জন্য নির্ব্বিশেষ নির্গুণ বলিয়াছে যে সৃষ্ট পদার্থের লক্ষণ তাঁহাতে নাই। তাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া তাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়, তিনি স্বয়ং অপাদন, করণ এবং অধিকরণ কারক, ইহাই তাঁহার বিশেষ চিহ্ন। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া প্রাকৃত শক্তি অর্থাৎ মায়াকে অবলোকন করিলেন,—প্রাকৃত চক্ষে নহে, অপ্রাকৃত নয়নে তিনি অবলোকন করিলেন। বেদেতে যে নিগূঢ় অর্থ নিশ্চিত হয় নাই তাহা পুরাণদ্বারা হইয়াছে। শ্রুতিতে বলে তাঁহার হস্ত পদ নাই, অথচ তিনি চলেন, গ্রহণ করেন। অতএব মুখ্যার্থে শ্রুতিতে তাঁহাকে সবিশেষ বলে, কল্পিত অর্থে নির্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যিনি, যে ব্রহ্মেতে স্বাভাবিক সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিন শক্তি বিরাজ করে, তাঁহাকে তুমি নিঃশক্তি বলিতেছ? ঈশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা এই তিন শক্তিতে মিলিত হইয়া পরাশক্তিযোগে ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াছেন। এই পরাশক্তি হ্লাদিনী সন্ধিনী এবং সংবিৎ *ভেদে ত্রিবিধা। অন্তরঙ্গা-পরাশক্তি এবং ঈশ্বর, অভিন্ন ও অদ্বিতীয়। বহিরঙ্গামায়াশক্তি এবং তটস্থাজীবশক্তি উপাদান, এবং পরাশক্তি নিমিত্তকারণ। এই উপাদান এবং নিমিত্ত কারণযোগে চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে।” এই শক্তিত্রয়বিশিষ্ট ঈশ্বরকে চৈতন্য কৃষ্ণ বলিতেন। অমূর্ত্ত ঈশ্বরের আশ্রয়ীভূত মূর্ত্ত ঈশ্বর, যথা স্বচ্ছ স্ফাটিকমণি এবং তাহার আভা, অর্থাৎ নিত্য এবং লীলা এই উভয় স্বরূপে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। উন্নত শ্রেণীর ভক্তগণ প্রাকৃত মুর্ত্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু উহাকে ঘনচিদানন্দরূপে গ্রহণ করেন। তদনন্তর প্রভু বলিলেন, এমন যে মায়াধীশ ভগবান্, মায়াবশ জীবের সঙ্গে

---

* ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, অথচ যে শক্তি-যোগে তিনি সমুদায় দেশকালের সঙ্গে সংযুক্ত হন তাহাকে সন্ধিনী বলে। যে শক্তিযোগে তিনি সমুদায় জানেন তাহাকে সংবিৎ, এবং যে শক্তিযোগে আনন্দ অনুভব করেন তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলে।

তাঁহাকে এক করিতেছ? শুদ্ধসত্ত্বময় এই যে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, ইহা যাহারা না মানে তাহারা বেদ মানিয়াও বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক। জীবের নিস্তার জন্য ব্যাসদেব যে সূত্র করিয়াছেন, মায়াবাদীর ভাষ্যে তাহার বিপরীত অর্থ হয়। জীবের আত্মবুদ্ধি মিথ্যা, কিন্তু জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর।

চৈতন্যের এই সকল কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম অবাক্ হইলেন, তথাপি সাধ্যানুসারে কুতর্ক করিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু শেষে একবারেই তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। পণ্ডিতকে নির্ব্বাক্ ও বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া চৈতন্য বলিলেন, ভট্টাচার্য্য! তুমি বিস্মিত হইও না, ভগবানেতে যে ভক্তি ইহাই পরম পুরুষার্থ জানিবে। আত্মারাম মুনিগণ তাঁহাকেই ভজনা করেন। ভাগবতে সৌনকাদির প্রতি সূত শএইরূপ বলিয়াছেন, "আত্মা-রামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থং-ভূতগুণো হরিঃ।" হরির এমনি গুণ যে, বিমুক্ত চিত্ত আত্মারাম মুনি-গণও সেই মহিমান্বিত দেবতাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভট্টা-চার্য্য এই শ্লোকের অর্থ শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে চৈতন্য বলিলেন, অগ্রে তুমি ব্যাখ্যা কর তাহার পর আমি যাহা জানি বলিতেছি। সার্ব্ব-ভৌম তর্ক শাস্ত্র অনুসারে নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। তখন প্রভু ঈষ-দ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, ভট্টাচার্য্য! তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, এইরূপে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিবার আর কাহারো ক্ষমতা নাই, কিন্তু তুমি কেবল পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় ব্যাখ্যা করিলে; ইহা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে। পরে তিনি ইহার আঠার প্রকার নূতন অর্থ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম কেবল পরাজয় স্বীকার করিলেন তাহা নহে, উক্ত শ্লোকের ভাবরসে মত্ত হইয়া গৌরকে শত শ্লোক দ্বারা স্তব স্তুতি বন্দনা করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তি প্রেমের লক্ষণ সকল তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এক জন সুবিখ্যাত রাজপণ্ডিত এইরূপে চৈতন্যের অনুবর্ত্তী হন, এবং ভক্তিরসে মাতিয়া উঠেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তনে পুরীমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, উৎকল প্রদেশের শত শত লোক গৌরাঙ্গের অলৌকিক মহত্ত্ব বুঝিতে পারিল। শেষ

এমনি হইল যে, যেখানে যখন তিনি উপস্থিত হন সেখানে চারিদিক্ হইতে হরিধ্বনি উঠে। নগরময় প্রচারিত হইল যে, গৌড়দেশ হইতে একজন পরম ভাগবত প্রেমিক সন্ন্যাসী আসিয়া সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে বিচারে পরাভূত করত হরিভক্তিতে তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছেন। বিচারের পর দিন অতি প্রত্যূষে জগন্নাথের প্রসাদ হস্তে লইয়া চৈতন্যদেব একবারে সার্ব্বভৌমের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই বৈদিক আচার লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইল। অনন্তর দুই জনে ভাবে প্রমত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের প্রতি এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, দিবা নিশি ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান, গৌর ভিন্ন আর কোন কথা নাই। ভাগবত পাঠ করেন, তাহাতেও মুক্তির স্থানে ভক্তি অর্থ করেন। মুক্তিতে ত্রাস এবং ঘৃণা, ভক্তিতে রুচি এবং উল্লাস জন্মিতে লাগিল। ঘোর মায়াবাদী গম্ভীর প্রকৃতি পণ্ডিতের মুখে এ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্য নিরতিশয় প্রীত হইলেন, তাঁহার ভক্তিপ্রলাপ দর্শনে অপর ভক্তগণও হাসিতে লাগিলেন। তখন কোথায় বা রহিল তাঁহার জ্ঞানগর্ব্ব, কোথায় বা সে বিজ্ঞতা গাম্ভীর্য্য, বালকের ন্যায় নাচিতে গাইতে এবং হাসিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কতদূর তাঁহার মত্ততা জন্মিয়াছিল তাহা এই শ্লোকদ্বারা বিশদরূপে পরিস্ফুরিত হইয়াছে। "পরিবদতু জনো যথাতথাঽয়ং ননু মুখরো বয়ং ন বিচারয়াম। হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি লুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥" যেখানে সেখানে লোকে পরিবাদ করুক না কেন, মুখর বলিয়া তাহাদিগকে আমরা বিচার করিব না। হরিরসমদিরাপানে মত্ত হইয়া আমরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইব, নৃত্য করিব এবং সম্ভোগ করিব। ভট্টাচার্য্য ভাবে মোহিত হইয়া এই শ্লোকটি দ্বারা চৈতন্যের মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন। "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" এই বচনদ্বারা চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে উপদেশ প্রদান করত সর্ব্বদা তাঁহাকে

সঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ক্রমে সেখানেও দুই একটি করিয়া ভক্ত দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মাধবপুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী এবং দামোদর নামক এক জন ভক্ত ও প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দ, শঙ্কর পণ্ডিত, ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি অনেকে সেখানে একত্রিত হইলেন। ভক্তসমাগমে অল্পকাল মধ্যে নীলাচলধাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠিল। তদনন্তর কয়েক দিবস পরে গৌরাঙ্গ প্রভু সমুদ্র তীরে গিয়া বাস করিতে লাগি-লেন। তথায় চন্দ্রের শুভ্র কিরণ, দক্ষিণ মলয়বায়ু, ফেনময় উত্তাল-তরঙ্গশ্রেণী এবং দিগন্তব্যাপ্ত প্রশস্ত জলরাশির শোভা তাঁহার চিরপ্রমত্ত হৃদয়কে আরও উন্মত্ত করিয়া তুলিল। সেই নির্জ্জন সুরম্য প্রদেশে কিছু দিন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তিনি সৎপ্রসঙ্গ এবং নামসংকীর্ত্তনে মগ্ন ছিলেন। দিবা নিশি ঘননীল বিশালবক্ষ জলনিধির গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর প্রাণ নিরন্তর আনন্দসাগরে ভাসমান থাকিত। গদাধর সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন ও ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেন। সমুদ্র উপকূলে কিছু দিন ভক্তগণ সঙ্গে বিহার করিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে চলিলা যান।

তীর্থভ্রমণ ও রামানন্দের সহিত মিলন.

চৈতন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের প্রারম্ভে মাঘ মাসের শুক্ল-পক্ষে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে গমন করেন, ফাল্গুনের দোলযাত্রা দেখিয়া, চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে ভক্তি প্রদান করিয়া বৈশাখের প্রথমে তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন। সিন্ধুতটে সাধু-সঙ্গে বিহার করিতে করিতে একদা তিনি সকলের নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে, তোমরা এক্ষণে আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও, আমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশ্বরূপের অন্বেষণে যাইব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না। যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি তাবৎ কাল তোমরা আমার জন্য এই স্থানে প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এ কথা শুনিয়া তাঁহা-দের মুখ ম্লান হইল। নিতাই বলিলেন, এমন কথা তুমি কিরূপে বলিলে যে একাকী যাইব। ইহা কে সহ্য করিতে পারে? যাহাকে ইচ্ছা কর আমরা দুই এক জন সঙ্গে যাই, বিশেষতঃ দক্ষিণের তীর্থ স্থান আমি অবগত আছি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। চৈতন্য বলিলেন, তোমাদের ভালবাসাতে আমার ব্রতভঙ্গ হয়। একবারত তুমি আমার দণ্ড ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে। জগদানন্দের ইচ্ছা যে আমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। তাঁহার কথা যদি না শুনি, তিনি রাগ করিয়া তিন দিন হয়ত কথাই কহিবেন না। আমি সন্ন্যাসী হইয়া প্রতি দিন তিন বার স্নান করি, মাটিতে শুই, মুকুন্দের প্রাণে ইহা সহ্য হয় না; তাঁহার বিষণ্ন মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হয়। আমিত সন্ন্যাসী, দামোদর আবার আমার উপর ব্রহ্মচারী হইয়া সর্ব্বদা উপদেশের দণ্ড ধরিয়া আছেন। ঈশ্বর-কৃপায় ইনি কোন লোকের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমি তাহা না করিয়া পারি না। অভিযোগচ্ছলে এইরূপে বন্ধুগণের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমার দুইটি হাতত সর্ব্বদা নামজপেই বদ্ধ, প্রেমাবেশে কোথায় কখন অচেতন হইয়া

পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই, অতএব এই কৃষ্ণদাস নামক সরল হৃদয় ব্রাহ্মণটি তোমার কৌপীন, বহির্ব্বাস, জলপাত্র লইয়া সঙ্গে যাইবেন, কোন কথা বার্ত্তা কহিবেন না, যাহা তুমি বলিবে তাহাই করিবেন, অতএব তুমি ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া যাও। অনন্তর চৈতন্য সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে আরো চারি পাঁচ দিন তাঁহাকে থাকিতে হইল। বিদায়কালে সার্ব্বভৌম বলিয়া দিলেন, গোদাবরী নদীতীরে পরমজ্ঞানী এবং ভক্ত রামানন্দ রায় আছেন, তাঁহার সঙ্গে অবশ্য অবশ্য দেখা করিয়া যাইবে, বিষয়ী দেখিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে না, তাঁহাতে পাণ্ডিত্য এবং ভক্তিরস উভয়ের সামঞ্জস্য হইয়াছে। রামানন্দের মহত্ব আমি এত দিন না বুঝিয়া তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছি, এখন তোমার চরণ প্রসাদে তাঁহাকেও চিনিতে পারিলাম। সার্ব্বভৌমের বচন অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইবার সময় চৈতন্য তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি ঘরে বসিয়া কৃষ্ণনাম ভজনা করিতে থাক, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রসাদে পুনরায় আমি নীলাচলে ফিরিয়া আসি। এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে, ভট্টাচার্য্য শোকে মুগ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িলেন, চৈতন্য তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। মহাপুরুষদিগের লৌকিক ব্যবহার অচিন্তনীয়। এক দিকে যেমন তাঁহাদের হৃদয় পুষ্পের ন্যায় সুকোমল, তেমনি অপর দিকে বজ্রের ন্যায় কঠিন এই জন্য ভবভূতি বলিয়াছেন, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ। "বজ্রতুল্য কঠিন, কুসুমতুল্য কোমল যে মহৎ ব্যক্তিদিগের চরিত্র তাহা কে জানিতে সক্ষম ? গৌরচন্দ্র আলালনাথ নামক স্থানে উপনীত হইলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সে রাত্রি তথায় বাস করিলেন ; পরদিন সেই স্থানে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক আসিতে লাগিল। এত লোকের সমাগম হইল যে তাঁহারা আহার করিতে অবসর পান না ; পরিশেষে দেবালয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া সকলে আহারাদি করেন। দ্বিতীয় রজনীও এই স্থানে অতিবাহিত হয়। তৎ-

পর দিবস চৈতন্য দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন, তাঁহার বিরহে সঙ্গী ভক্ত পঞ্চজন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন ; সে দিকে প্রভু আর না চাহিয়া একাকী উদাসীনভাবে চলিয়া গেলেন, কৃষ্ণদাস কমণ্ডলু হস্তে লইয়া যোগীবরের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। নিতাই প্রভৃতি কয়েক জন সঙ্গী সে দিন আলালনাথে সমস্ত সময় উপবাসী থাকিয়া পর দিনে পুরীতে ফিরিয়া আসেন। তীর্থভ্রমণের বিবরণ কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণের মুখে যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মহাত্মা চৈতন্য উচ্চ নিনাদে হরিনাম গান করিতে করিতে পথে চলিতে লাগিলেন। গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের প্রেরিত কয়েকটি ব্রাহ্মণ সঙ্গে গিয়াছিল। গৌর যেখানে যে দিন বাস করিতেন সেখানে বহু লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত এবং বৈষ্ণব হইয়া যাইত। অনেকে আবার তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্যও প্রার্থী হইত। ইহা কেবল তীর্থভ্রমণ নহে, এই উপলক্ষে একাকী দেশে দেশে হরিভক্তিও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে যাহা করেন নাই, তীর্থে বাহির হইয়া তাহা করিয়াছিলেন। দক্ষিণের শৈব ও রামাইৎ সম্প্রদায়স্থ অনেক লোককে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। কর্ণাটরাজ্যে গিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরা তাঁহার অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব দর্শনে ভক্তিপথ আশ্রয় করে। ক্রমে বহু দেশ গ্রাম নগর নদী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিনি গোদাবরী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতে স্নান করিয়া তত্তীরবর্ত্তী এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় বহু লোক জন সঙ্গে লইয়া দোলারোহণে রায় রামানন্দ তথায় স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বাদ্য বাজিতেছে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে ইহা দেখিয়াই চৈতন্য বুঝিলেন যে ইনিই সেই রামানন্দ। এমনি তাঁহার প্রেমের উত্তেজনা যে, তখনি ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। অনন্তর বেগ সম্বরণ করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে সন্ন্যাসী দেখিয়া রামানন্দ আপনিই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। যোগীবরের প্রদীপ্ত মুখশ্রী, সুকোমল পদ্মাক্ষ দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে রায়

তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরিচয়ের পূর্ব্বে উভয় উভয়কে চিনিতে পারিলেন। সঙ্গের লোক জন ইহাঁদের ভাব ভক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তদনন্তর নানাবিধ ইষ্টালাপ এবং সার্ব্বভৌমের বিষয় আলোচনা করিয়া রামানন্দ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত চৈতন্যের ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্বসম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয় তাহার সার এখানে বিবৃত হইতেছে। চৈতন্য প্রশ্ন করেন, রামানন্দ রায় তাহার উত্তর দেন।

গৌরাঙ্গ গোসাঞী সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বসিয়া আছেন, অতি দীনবেশে রামানন্দ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্তি প্রেম এবং তাহার সাধনসম্বন্ধে কিছু বল আমি শ্রবণ করি।

রায় কহিলেন বিষ্ণুভক্তিই সার। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষ কর্ত্তৃক কেবল সেই পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন, তাঁহার সন্তোষের অন্য পন্থা নাই। চৈতন্য বলিলেন, ইহা বাহিরের কথা, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় কি বল। ঈশ্বরেতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করাই সার। ভাগবতে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আহার পান দান যজ্ঞ তপস্যা যাহা কিছু কর হে অর্জ্জুন! সে সমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে।" ইহাও বাহ্য, তাহার পর কি বল। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়া সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসাধন করাই সার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমার আদিষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করত যে ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে ভজনা করে সেই ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গীতায় উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকশরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।" ইহাও বাহিরের কথা, তাহার উপরে কি আছে বল। জ্ঞানমিশ্রা যে ভক্তি তাহাই সার সাধন। গীতায় বলিয়াছেন, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।" সর্ব্বভূতে সমদর্শী নিস্পৃহ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করে। ইহাও বাহ্য, পরে বল। তবে জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সার। ভাগবতে কথিত আছে,

"জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তোমার গুণ কীর্ত্তনকে বন্ধু মনে করে, তাহারা ত্রিলোকজয়ী হয়।" ইহাও বাহ্য, তাহার পর বল। প্রেমভক্তি উত্তম। "ক্ষুধা, তৃষ্ণা না থাকিলে আহার পানে যেমন সুখবোধ হয় না, হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে তেমনি নানা উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াও ভক্তের হৃদয় সুখবিগলিত হয় না।" "ভক্তি-রসসিক্ত চিত্ত যদি কোথাও পাওয়া যায় ক্রয় কর; এক মাত্র লোভই উহার মূল্য, কোটি জন্মের পুণ্য দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না।" ইহা সত্য, আরো আগে বল। দাস্যপ্রেম ইহা অপেক্ষা উচ্চ। ভাগবতে দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে বলিয়াছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীবের পরিত্রাণ হয় তাঁহার দাসদিগের আর কি অবশিষ্ট থাকে?" চৈতন্য বলিলেন ইহা বটে, আর একটু আগে বল। তবে সখ্যপ্রেম। সখ্যপ্রেম সকল সাধনের সার। ইহাও উত্তম বটে, আরো আগে বল। বাৎসল্য প্রেম। ইহাও উত্তম তাহার পর বল। কান্তভাব প্রেম সাধনের সার। ইহা মাধুর্য্য রস; শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি রসচতুষ্টয় ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছেন, "আমার প্রতি ভক্তি জন্মিলে জীবের অমৃতত্ব লাভ হয়, ভাগ্য বশতঃ আমার প্রতি তোমাদের ভক্তি হইয়াছে।" ইহা চরম সাধন, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম এক্ষণে আর যদি কিছু থাকে তাহা বল। রামানন্দ বলিলেন, ইহার উপরের সাধন জানিতে চায় এমন লোক পৃথিবীতে আছে অগ্রে আমি জানিতাম না। মহাভাব প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ইহার উপর আর সাধন নাই।

চৈতন্য প্রভু মহা আহ্লাদিত লইয়া রামানন্দকে বলিলেন, যে জন্য আমার তোমার নিকট আগমন তাহা সফল হইল; এক্ষণে আমি সাধন-তত্ত্ব সমুদায় অবগত হইলাম; কিন্তু তোমার মুখে আরো শুনিতে আমার বাসনা হইতেছে; রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ এবং কাহাকে কোন্ রস বলে তাহা সবিশেষ বল, শুনিয়া সুখী হই। রামানন্দ কহিলেন, সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। তিনি আদিপুরুষ, সর্ব্বরস ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ অনন্তশক্তিশালী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। হ্লাদিনী, সন্ধিনী,

এবং ত্রিবিধ এই তিন শক্তি দ্বারা তাঁহার পরমাশক্তিকে বিভাগ করা যায়। ভক্তচিত্ত-সুখ-প্রদায়িনী এই হ্লাদিনী শক্তির নাম প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব, এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ। সেই মহাভাবরূপা যে রাধিকা তাঁহার প্রতি ভগবানের যে প্রেম তাহা সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায়, তাহার সুঘ্রাণ রাধিকার অঙ্গকান্তি সদৃশ। এই সুগন্ধযুক্ত উজ্জ্বলদেহ ঈশ্বরকরুণামৃতে প্রথম অভিষিক্ত হয়, তাঁহার নিত্য নূতন ভাবরসে তাহার দ্বিতীয় অভিষেক হয়, পরে হরির লাবণ্যামৃত রস তদুপরি বর্ষিত হইতে থাকে। এই রূপে মহাভাব যখন সেই সচ্চিদানন্দ রূপরসে স্নাত হইল, অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন লজ্জা আসিয়া মহাভাবকে অধিকার করিল। এই লজ্জা রাধিকার পট্টবসন, অনুরাগ তাঁহার অধরের তাম্বুলরাগ, কুটিল প্রেম নয়নের অঞ্জন, প্রণ-য়ের অভিমান কাঁচুলি, প্রচ্ছন্ন মান মস্তকের ধর্ম্মিল্ল, হরিপ্রেম মৃগমদ, স্বেদ কম্প পুলক হাস্য ক্রন্দন ক্রোধ অভিমানাদি সাত্বিক ও সঞ্চারী গুণ সকল অঙ্গাভরণ, সৌভাগ্য তিলক, এই সমস্ত প্রেম লক্ষণে ভূষিত রাধিকাদেবী কৃষ্ণলীলার অনুকূল মনোবৃত্তিরূপসখীগণের সমভিব্যাহারে বিরাজ করেন। তিনি নিজ অঙ্গের সৌরভালয়ে প্রেমগর্ব্বের পর্য্যঙ্কে বসিয়া কিরূপে কৃষ্ণসঙ্গ (হরিপাদপদ্ম লাভ) হইবে তাহাই সর্ব্বদা ভাবেন। প্রাণসখার যশঃ ও গুণের কথা শ্রবণ কথন ভিন্ন আর তাঁহার কোন কার্য্য নাই। তিনি বিশুদ্ধ প্রেমরত্নাকর অনুপম গুণে ভূষিত সেই জীবিতেশ্বরকে প্রেমরূপ সোমরস পান করাইয়া তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করেন। রামানন্দের উপদেশে প্রকাশ পাইতেছে, ব্রজগোপীগণ আর কেহ নহেন, কেবল এই মহাভাবরূপা প্রেমপ্রতিমা রাধিকার বিভিন্ন ক্রিয়া মাত্র। এ সমস্ত অবশ্য তত্ত্বপক্ষীয় কথা, বৃন্দাবনের ঐতি-হাসিক প্রকৃত ঘটনা এই প্রেমতত্ত্বের দৃশ্যমান প্রতিকৃতি বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

চৈতন্য গোসাঞী বলিলেন, রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিলাম, এক্ষণে ইহাঁদের বিলাসের মহত্ত্ব বর্ণন কর শুনি। অতঃপর রায় কহিতে লাগি-লেন, এবম্ভূত যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহারা উভয়ে প্রেমরসে মত্ত হইয়া নিরন্তর

কুঞ্জকাননে ক্রীড়া করত কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গৌর পুনরায় বলিলেন, ইহা ঠিক বটে, কিন্তু আরো আগে বল। রায় তখন কহিলেন, আরত আমার বুদ্ধি চলে না আর যে এক প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত আছে তাহা তোমার ভাল লাগিবে কি না জানি না। তদনন্তর তিনি বিরহসূচক একটি গান করিলেন। চৈতন্য তাহার ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, সাধনতত্ত্ব সমুদায়ত বুঝিলাম, এক্ষণে সাধনের উপায় কি বলিয়া দাও। রামানন্দ বিনীতভাবে কুণ্ঠিত মনে কহিতে লাগিলেন, সখীভাব না হইলে রাধাকৃষ্ণের ভজনা হয় না। সখীদিগের প্রেম নিস্বার্থ, তাহারা রাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সম্মিলন করাইয়া তাঁহাদের উভয়ের সুখে সুখী হইত, নানা ছল কৌশল করিয়া সখীরা এই প্রেমযোগ সম্পাদন করিত। ইহা তাহাদের নিজের ভোগ সুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখকর বোধ ছিল। মনোবৃত্তিরূপা সেই সখীগণ এইরূপে প্রেমাধার হৃদয়কে হৃদয়নাথকে সম্ভোগ করিতে দিয়া আপনারা পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমে পুষ্টিতা লাভ করে, তাহা দেখিয়া সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদিত হন। গোপীদিগের প্রেম অপ্রাকৃত, তাহা শারীরিক ইন্দ্রিয়বিকার জনিত নহে, প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ সকল ইহাতে বর্ণিত আছে বলিয়া এই রূপ রূপক ভাষায় উহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ধর্ম্মবিষয়ক উদাহরণের মধ্যে এই প্রকার রূপক বর্ণনার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। রামানন্দের কথার আধ্যাত্মিক অর্থ এই, চিত্তবৃন্দাবনে হৃদয়রাধিকা পরমাত্মাতে রমণ করেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম অনুরাগ ইত্যাদি মনোবৃত্তি নিচয় সুখী হয় এবং তাহারা রাধাকৃষ্ণ উভয়ের পরিচর্য্যা করে। যদিও তাহাদের সেবা নিস্বার্থ কিন্তু হৃদয় পরিতৃপ্ত হইলে তাহাতে সকলেই তৃপ্ত্যানুভব করে, সুতরাং তদ্দ্বারা সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ লাভ হয়। ইহাতে অবিশুদ্ধ কামগন্ধ থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। পরসুখে সুখী হওয়া সখীগণের ধর্ম্ম, বৈধীভক্তিতে তাহাদের সে ধর্ম্ম লাভ করা যায় না, রাগানুগা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমমূলক ভক্তির প্রয়োজন। কোমল স্বভাবা মধুর প্রকৃতি স্ত্রী জাতির সঙ্গে ভক্তির অত্যন্ত

সৌসাদৃশ্য আছে। এই জন্য জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে এই প্রকার রূপক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানপুরুষ, সে কেবল ঈশ্বরের বাহির মহলের সংবাদ বলিতে পারে; কিন্তু ভক্তি স্ত্রীলোক, সে ঠাকুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তথাকার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হয়, অন্দরমহলে জ্ঞানের প্রবেশ নিষেধ।

রামানন্দ রায়ের মুখে গভীর ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া চৈতন্য পরমাহ্লাদিত মনে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, এবং বিদায় চাহিলেন। রায়ের অনুরোধে তাঁহাকে আরো দশ দিন কাল সেখানে থাকিতে হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দুই জনে অনেক কথা বার্ত্তা হইত। আর এক দিন গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসু হইলে রায় বলিলেন, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর কিছু বিদ্যা নাই। প্রেমভক্তিতে খ্যাত লাভ করাই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রেমই অমূল্য সম্পত্তি। ভক্তিবিরহ সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের অবস্থা। প্রেমিক ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ। প্রেমলীলার সঙ্গীতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত। ভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ কিছু নাই। হরি স্মরণীয়, হরি উপাস্য, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। তদনন্তর গৌরাঙ্গ সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করেন। বিদায়কালে রামানন্দকে বলিলেন, তুমি বিষয়-কার্য্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলবাসী হও, আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি, একত্র হরিপ্রসঙ্গে তথায় দুই জনে অবস্থান করিব।

নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক দিগকে হরি-নাম শুনাইয়া, মহাপ্রভু ক্রমে মান্দ্রাজ অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে স্থানে স্থানে পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্কও হইত। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্তিপ্রভা অবলোকন করত বহুলোক ভক্তিপথ অবলম্বন করে। দক্ষিণাঞ্চলে রামানুজ ও রামাইৎ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করিত। একস্থানে কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোক ছিল। তাহাদের প্রধান আচার্য্য চৈতন্যের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে অত্যন্ত অপমানিত হয়। এই কারণে তাহারা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া এক পাত্র অশুদ্ধান্ন প্রসাদ বলিয়া তাঁহাকে দিতে আইসে।

এমন সময় উপর হইতে এক চিল সেই অন্নপাত্র তুলিয়া লইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল, এবং বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকের উপর তাহা পড়িয়া গেল। তাহাতে সে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইল। তাহার এইরূপ দুরবস্থা দর্শনে আর সকলে শেষে চৈতন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি বলিলেন, তাহার কর্ণে উচ্চরবে হরিনাম শ্রবণ করাও তাহা হইলে সে এখনি জাগিয়া উঠিবে।

এইরূপে নানা স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। কত পথই হাঁটিতে পারিতেন। দীন কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ, মুখে কথা নাই, ক্রমাগত ছায়ার ন্যায় গুরুদেবের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। অতঃপর গৌরচন্দ্র কাবেরী নদীতটে উপস্থিত হইলেন। নদীতে অবগাহন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে দেবালয় দর্শন করিলেন। তথায় বেঙ্কট ভট্ট নামে এক জন ভক্তিপথাবলম্বী বিপ্র থাকিতেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক গোসাঞীকে নিজগৃহে রাখিলেন। গোপাল ভট্ট নামক এক জন পণ্ডিত এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠ যিনি বৃন্দাবনে রূপসনাতনের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতেন তিনি এই বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। গৌরের প্রেমের ছায়া যার পরিবারে পড়িত তাহার ভাবী বংশগণ পর্য্যন্ত ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হইত। সেই স্থানে প্রভু চাতুর্মাস্য করেন। শ্রীরঙ্গবাসী ব্রাহ্মণেরা এক এক দিন সকলেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখানে একজন জ্ঞানহীন ভক্ত ব্রাহ্মণ প্রতি দিন ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পড়িতেন আর তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত। তাঁহার ভাষা বোধ নাই, উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না। অথচ গীতাপাঠ করেন জ্ঞানান্ধ পণ্ডিতাভিমানী দিগের ইহা সহ্য হয় না। কিন্তু তাহাদের উপহাস নিন্দা না শুনিয়া ব্রাহ্মণ প্রতি দিন প্রেমাবিষ্ট চিত্তে গীতা পাঠ করিতেন। এক দিন মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ অর্থ পড়িয়া তোমার এত সুখ হয় আমাকে বলিতে পার? বিপ্র বলিল, আমি মূর্খ, শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দার্থ কিছুই বুঝি না, গুরুর আজ্ঞায় গীতা পাঠ করি। যখন আমি পড়িতে বসি, তখন অর্জ্জুনের রথে বসিয়া ঠাকুর তাঁহাকে হিতোপদেশ দিতেছেন সেই অপরূপ দৃশ্য আমার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়, আর মনের মধ্যে আনন্দরস উথলিয়া উঠে;

যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণ সেই ছবি আমি দেখিতে পাই, এই জন্য আমার মন ইহা ছাড়িতে চায় না। ব্রাহ্মণের বাক্যে ভক্তরাজ গৌরাঙ্গ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমিই ইহার সার অর্থ বুঝিয়া থাক। তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দান করিলেন। চৈতন্যের পবিত্র অঙ্গসংস্পর্শে ব্রাহ্মণের এক গুণ ভাব ভক্তি দশ গুণ হইল, সে বিনয় প্রেমকৃতজ্ঞতারসে ডুবিয়া গেল। এই স্থানে বাসুদেব নামক এক জন গলিতকুষ্ঠ রোগীকে গৌরাঙ্গ কোল দিয়াছিলেন। অনন্তর ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কামকোষ্ঠী দক্ষিণমথুরা, মহেন্দ্র-শৈল, সেতুবন্ধ, পাণ্ডুদেশ, মলয় পর্ব্বত, কন্যাকুমারী ভ্রমণ করিয়া মল্লার দেশে তিনি উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ভট্টমারি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বাস করিত। তাহারা গৌরের সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে একটি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রলোভিত করে, এবং নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণেরও তাহাতে চিত্ত বিচলিত হয়। সে এক দিন প্রাতে উঠিয়া দুর্ম্মতি বশতঃ গুরুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভট্টমারির ঘরে চলিয়া যায়। তাহাকে বাহির করিয়া আনিতে চৈতন্যকে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছিল। যেখানে কোন ভাল গ্রন্থ কিম্বা গ্রন্থের অংশবিশেষ তিনি পাইতেন তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। পয়স্বিনী নদীতীরে এক দেবালয়ে "ব্রহ্মসংহিতা" পুস্তকের কয়েক অধ্যায় প্রাপ্ত হন। ইহার শ্লোক সকল তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। ক্রমে মান্দ্রাজ হইতে চৈতন্য প্রভু বোম্বাই দেশস্থ কোলাপুর প্রভৃতি স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে বিঠল নামক বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার যথেষ্ট আনন্দোদয় হয়। তথায় তাঁহার গুরুগোষ্ঠী মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী ছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া চৈতন্য অতিশয় সুখী হইলেন। শ্রীরঙ্গ-পুরী বলিলেন, "আমি নবদ্বীপ দেখিয়াছি, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীর হাতের রন্ধন উপাদেয় মোচার ঘণ্ট খাইয়াছি, তাঁহার এক যোগ্য পুত্র শঙ্করারণ্যের সঙ্গে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, এই তীর্থে শঙ্করারণ্য সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন।" গৌর বলিলেন, পূর্ব্বাশ্রমে তিনি আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র পিতা ছিলেন। দুই জন পরস্পরের প্রেমে বিগলিত হইয়া দ্বারকাতীর্থ দর্শনে গমন করেন এবং একত্র কয়েক দিবস অবস্থান

করেন। তথায় চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণদিগের মুখে বিল্বমঙ্গলকৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করত মুগ্ধ হইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত দুই খানি পুস্তক পাইয়া তাঁহার মহা আহ্লাদ বোধ হয়। পরে পম্পা সরোবর, তাপী ও নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া, ঋষ্যমুখ, দণ্ডকারণ্য হইয়া পঞ্চবটীতে উপনীত হইলেন। নাসিক্, ত্র্যম্বক্ কুশাবর্ত্ত পর্য্যটনান্তর রামানন্দের বাসস্থান বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। রামানন্দকে প্রভু বলিলেন, তুমি যে তত্ত্বকথা শুনাইয়াছিলে, এই দুই পুস্তক তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। পুনরায় চৈতন্যকে পাইয়া রামানন্দ প্রেমসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ইহাঁকে নীলাচলে লইয়া যাইবার জন্যই প্রভুর পুনর্ব্বার এ স্থানে আগমন। কয়েক দিন একত্র বাসের পর রায় বলিলেন, আপনি অগ্রসর হউন, আমার সঙ্গে অনেক লোক জন হস্তী অশ্ব সৈন্য সামন্ত যাইবে, সুতরাং কিছু বিলম্ব হইবে, কিন্তু আমি শীঘ্রই আপনার পশ্চাদ্গামী হইতেছি। বীরের ন্যায় নির্ভয় ও সদানন্দ মনে শত শত যোজন পথ, পর্ব্বত, অরণ্য প্রান্তর পরিভ্রমণ করিয়া আবার সেই পথে নীলাচলাভিমুখে গৌরাঙ্গ যাত্রা করিলেন। পরিচিত পথের পরিচিত হরিভক্তগণেরা তাঁহাকে দেখিয়া হরিধ্বনিসহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রভু আলালনাথে আসিয়া সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাস দ্বারা নিত্যানন্দাদি বন্ধুবর্গের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেন।

নীলাচলে প্রত্যাগমন।

তৃষিত চাতকের ন্যায় ভক্তগণ আশাপথ চাহিয়াছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র প্রফুল্ল মনে নাচিতে নাচিতে সকলে আলালনাথে আসিয়া গৌরপ্রেমসিন্ধুতে প্রবেশ করিলেন। বহু দিনের অদর্শনের পর মিলন, আনন্দের আর অবধি রহিল না। সকলের নয়নে আনন্দধারা বহিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সমুদ্রতটে সার্ব্বভৌম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুকে সে দিন পথ হইতে অমনি নিজগৃহে লইয়া যান এবং বিধি-মতে সেবা শুশ্রূষা করেন। ভক্তপরিবারমধ্যে মিলিত হইয়া গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, পুরাতন এবং নূতন বৈষ্ণব সাধুগণের সমাগম হইল, আবার নীলাচলে আনন্দের মেলা বসিল।

সার্ব্বভৌমের মন পরিবর্ত্তনের পর চৈতন্যদেব তীর্থযাত্রা গমন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার গুণে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। কি রূপে তাঁহাকে দেখিবেন, কোন্ উপায়ে তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবেন এই কেবল তাঁহার ভাবনা ছিল। এক দিন ভট্টাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতা সহকারে তিনি অনুরোধ করেন যে, একবার তুমি আমাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করাও, আমার নয়ন সফল হউক, আমি শুনিয়াছি সেই গৌড়দেশবাসী সাধু পরম ভাগবত। সার্ব্বভৌম বলি-লেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ সকলই সত্য, কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকেন, অকিঞ্চন প্রেমিকদিগের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদা সহবাস, স্বপ্নেও তিনি রাজদর্শন করেন না, তবে তোমার সঙ্গে কিরূপে তাঁহার দেখা হইবে? সম্প্রতি তিনি তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রভু অন্য তীর্থে গমন করি-লেন কেন, রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর তীর্থস্থান সকল পাপীদিগের পুনঃ পুনঃ সমাগমে কলঙ্কিত হয়,

এই জন্য সাধুরা তীর্থে গিয়া তাহাকে পুনরায় পবিত্র করেন, কেন না তাঁহাদের অন্তরে ভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন। সামান্য সাধুর পদার্পণেই এইরূপ হয়, চৈতন্যত স্বয়ং ভগবান্! শেষোক্ত বাক্যে রাজা কিছু বিস্ময় প্রকাশ করত মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এবং কবে প্রভুর প্রত্যাগমন হইবে এই ভাবনায় দিন যাপন করিতে থাকেন। কর্ণাট রাজার মন্ত্রী মল্লভট্ট এবং গোদাবরী হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণদিগের মুখে তাঁহার তীর্থভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতি আগ্রহের সহিত তিনি শুনিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমের মন পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া কেবল রাজা নহেন, আরও অনেক বড় বড় লোক চৈতন্যের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া প্রভু কাশীমিশ্রের ভবনে বাসা করেন। তথায় সার্ব্বভৌম তাঁহার সঙ্গে আর সকলের পরিচয় করিয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। চৈতন্য তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করেন। ভবানন্দ বাণীনাথ নামক আপনার আর এক পুত্রকে প্রভুর সেবার্থ সমর্পণ করিয়া বলিলেন, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে বলিয়া পাঠাইবেন, আমাকে পর ভাবিবেন না। আলাপ পরিচয়ের পর সকলে বিদায় হইলে চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে কৃষ্ণদাসের পতনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া ভট্টমারিদিগের সঙ্গে মিশিয়াছিল, অনেক কষ্টে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে আমি আর দায়ী নহি, উহাকে আমি বিদায় করিলাম। ইহা শুনিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া আকুল হইল। কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের পরিচিত লোক, তিনি গদাধর মুকুন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন তুমি থাক, নিরাশ হইও না, প্রভুর পৌঁছাসংবাদ দিবার জন্য তোমাকে শান্তিপুর ও নবদ্বীপে পাঠান যাইবে। পরে গৌরের মত লইয়া তাহাকে গৌড়দেশে পাঠান হয়।

কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতা এবং ভক্তবৃন্দকে চৈতন্যের নীলাচলপ্রত্যাগমন-বার্ত্তা প্রদান করিল, অদ্বৈতের নিকটও সংবাদ প্রেরিত হইল। শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ

আনন্দের সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, মহা আনন্দধ্বনি উঠিল, আমিও এই সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। চৈতন্য প্রভু নীলাদ্রি গমন করিলে আমরা তাঁহার বিরহে এবার তাদৃশ খিদ্যমান বা ম্রিয়মাণ হই নাই। কেন না, তিনি বিদায়কালে যে বলিয়াছিলেন, তোমরা হরিকে ভজনা কর, তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বদা নিকটে পাইবে, যেখানে হরিভক্তি আমি সেইখানে জানিবে, বাস্তবিক এ কথার অর্থ আমরা অনুভব করিয়াছিলাম। হরিভক্তি এবং হরিভক্ত এক স্থানেই অবস্থিতি করেন। আমরা সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে গৌরের প্রেমময় ছবি দেখিতে পাইতাম। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সাধন ভজন কীর্ত্তনকে পোষণ করিয়াছিল। কেহ কেহ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়াও যান। পুরুষোত্তম পরে যিনি দামোদর নাম ধারণ করিয়া নীলাচলে ভক্তসমাজে গৌরপ্রিয় হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি গৌরসন্ন্যাসের কিছুকাল পরে কাশীধামে গিয়া দণ্ড গ্রহণ করত তথায় বেদ বেদান্ত পাঠ করিয়া মহা পণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ভক্তিভূমির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দামোদর সময়বিশেষে চৈতন্যকেও উপদেশ দিতেন, এই জন্য তিনি স্পষ্টবক্তা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সন্ন্যাসী পরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে অগ্রে গিয়া চৈতন্যকে গৌড়ভক্তগণের আগমনবার্ত্তা অবগত করেন।

এক দিন ভক্তগণসঙ্গে চৈতন্য বসিয়া আছেন, এমন সময় গোবিন্দ নামক ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল, পুরী গোসাঞী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার চরণ সেবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন, তাই আমি আসিয়াছি। সার্ব্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরী গোসাঞী শূদ্র ভৃত্য কেমন করিয়া রাখিতেন? শচীনন্দন বলিলেন, ঈশ্বরের কৃপা বেদের অধীন নয়, তাঁহার কৃপায় ভক্ত জাতি কুল মানে না, সম্ভ্রমাকাঙ্ক্ষা হইতে স্নেহদান কোটী গুণে সুখকর; এই বলিয়া তিনি সসম্ভ্রমে গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। গুরুদেবের ভৃত্য বলিয়া প্রথমে তাহাকে সেবায় নিযুক্ত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন, পরে গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। গোবিন্দ এক জন

ভক্তভৃত্য। ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক জনৈক নিরাকারবাদী ব্রহ্মচারী এই স্থানে আসিয়া চৈতন্য প্রভাবে ভক্তিপথ অবলম্বন করেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস পরেন। তাঁহার ভক্তি দেখিয়া প্রভু এক দিন বলিলেন, তুমি হরিকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাও। সার্ব্বভৌম চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া ভারতীকে কহিলেন "ইহাঁর কৃপাতে ইহাঁর দর্শন হয়।" চৈতন্য বিষ্ণু! বিষ্ণু! করিয়া উঠিলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে স্পষ্টই বলিলেন, "অতিস্তুতি নিন্দায় পরিণত হয়।" প্রবল বন্যার কালে যেমন উচ্চ ভূমিতে শত শত নদী বহিয়া যায়, গৌরপ্রেম বন্যায় তেমনি শত শত ভক্ত সে সময় চারিদিকে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ আশা ও আহ্লাদের বিষয় এই ছিল যে, সকলে মনে করিতেন আমরা স্বয়ং ভগবান্‌কে লইয়া বিহার করিতেছি। মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করাতে যে কত সুখ শান্তি আনন্দ তাহা বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে পারেন না। স্বর্গের ঈশ্বরকে হাতে পাইলে কে আর তাহা পরিত্যাগ করে? অতি সহজে ধরিতে এবং স্পর্শ করিতে পারা যায়, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়, হৃদয়ের আশা ব্যাকুলতার নিবৃত্তি হয়, এমন সুবিধা ত্যাগ করিয়া যোগ তপস্যা লোকে কেনই বা করিবে? এই জন্য চৈতন্যের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও অদ্বৈত সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বিজ্ঞ ভক্তগণও তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং অনিচ্ছার সহিত দশচক্রে পতিত হইয়া তাঁহাকে ভগবান্ হইতে হইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবগণ পরস্পরসম্বন্ধেও অতি উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন। কারণ তাঁহাদের সংস্কার ছিল যে প্রত্যেকেই নিত্যসিদ্ধ জীবের অবতার। এই বিশ্বাস হেতু বহু লোক ভক্তিপথ আশ্রয় করে।

এক দিন সার্ব্বভৌম অতি সঙ্কুচিতভাবে সভয় অন্তঃকরণে চৈতন্যকে নিবেদন করিলেন, প্রতাপরুদ্র রাজা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এ কথায় তিনি কাণে হাত দিয়া নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, সার্ব্বভৌম! কেন এরূপ অযোগ্য কথা তুমি বলিতেছ? আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রীদর্শন তুল্য

বিষভক্ষণ। ভট্টাচার্য্য বলিলেন তিনি জগন্নাথের সেবক এবং ভক্তো-ত্তম। চৈতন্য বলিলেন তথাপি রাজা কালসর্প সদৃশ। দারুপুত্তলিকা সংস্পর্শেও চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। এরূপ কথা পুনরায় বলিলে আর আমাকে তুমি এখানে দেখিতে পাইবে না। সার্ব্বভৌম ভয় পাইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং কি করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। এই সময় রামানন্দের সঙ্গে প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদর্শনে নীলাচলে আগমন করেন। চৈতন্য রামানন্দের নিকটেও রাজার ভক্তি অনুরাগ বৈরাগ্যের কথা সমস্ত শুনিলেন। ওদিকে রাজা সার্ব্বভৌমের মুখে গৌরচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণে বহু খেদ করত বলিতে লাগিলেন, তাঁহার দেখা না পাইলে আমি এ প্রাণ আর রাখিব না, রাজ্য ধন মানে আমার কি প্রয়োজন? ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, রথ যাত্রার দিনে সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রভু যখন একাকী বিশ্রাম করিবেন তখন তুমি দীনবেশে তাঁহার চরণ ধারণ করিও প্রভু তোমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন দান করিবেন। তচ্ছ্রবণে রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন এবং সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

চৈতন্য ভক্তসঙ্গে বিহার করিতে করিতে বিরহজ্বালায় অস্থির হইয়া এই সময় এক দিন আলালনাথে পলাইয়া যান। পরে গৌড়ের বৈষ্ণব-গণ শ্রীক্ষেত্রে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে পুরীতে আনয়ন করিলেন। বঙ্গদেশের দুই শতভক্ত বৈষ্ণব বহু লোক জন সঙ্গে লইয়া ক্রমে সমুদ্রতটে গিয়া উপনীত হইলেন। পথে চলিবার সময় সমস্ত দিন রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন আর সদালাপ ইহা ভিন্ন অন্য কথা ছিল না। একে ভক্তির উচ্ছ্বাস তাহার উপর গৌরদর্শনস্পৃহা বলবতী, উৎ-সাহে অগ্নিময় হইয়া ভক্তগণ নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পুরীর অভি-মুখে চলিলেন। মৃদঙ্গ করতাল সহ হরিধ্বনির গভীর নিনাদে সাগর-তট প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎকালে প্রতাপরুদ্র গৃহে থাকিয়া অট্টালিকার ছাদে উপবেশন করত অদূরবর্ত্তী সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখি-তেছিলেন, এবং গোপীনাথ তাঁহাকে এক এক করিয়া প্রতিজনের পরি-চয় দিয়া দিতেছিলেন। যাত্রিদল জগন্নাথ না দেখিয়া অগ্রে চৈতন্যের

আশ্রমের দিকে চলিলেন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ পাইয়া মহাপ্রভুও ভক্তসহ প্রত্যুদ্গমনার্থ পথে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে যে স্থানে উভয়ের মিলন হইল, সে স্থান উভয় পক্ষের গাত্রসংঘর্ষণে এবং পদদলনে আলোড়িত হইয়া গেল। প্রতিজনকে গৌরচন্দ্র আলিঙ্গন দিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বহস্তে প্রত্যেককে মালা ও প্রসাদ বিতরণ করিলেন। কে কেমন আছেন, কি বৃত্তান্ত সমস্ত বিশেষ করিয়া প্রতি জনকে জিজ্ঞাসা করা হইল। অপরিচিত নবাগত ব্যক্তিদিগের সহিতও আলাপ পরিচয় হইল। বাসুদেব দত্তকে তীর্থ হইতে আনীত সেই পুস্তক দুই খানি প্রভু দেখাইলেন, পরে হাতে হাতে অনুলিপি দ্বারা ক্রমে তাহা বৃদ্ধি হইয়া যায়। দলের মধ্যে হরিদাসকে না দেখিয়া চৈতন্য কিছু দুঃখিত হইলেন। বৃদ্ধ হরিদাস দীনভাবে পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন, অস্পৃশ্য যবনজাতি কেমন করিয়া সাধুস্পর্শ করিব এই কেবল তাঁহার আশঙ্কা। অপর সকলের স্নানাহারের আয়োজন করিয়া দিয়া গোসাঞী নিজেই হরিদাসকে আনিতে গেলেন। তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের ধন জন ঐশ্বর্য্য সমস্ত যেন তাঁহার করতলস্থ। রাজার আদেশ আছে, ইঙ্গিতমাত্র যাবতীয় বস্তুর আয়োজন করিয়া দিবে। সেই বনচারী দণ্ডধারী পথের ভিখারী গৌরাঙ্গ এখানে রাজার রাজা হইয়া বসিয়া আছেন। বৈরাগ্যের যে কি মহোচ্চ অধিকার তাহা আমরা এই স্থলে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামী ভগবানের চরণাশ্রয় করিলে পৃথিবীর যাবতীয় ধন সম্পদ্ তাঁহার পদচুম্বনের জন্য আপনা হইতে গিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রতাপান্বিত রাজন্যবর্গ সর্ব্বত্যাগী বৈরাগীর কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। চৈতন্যদেব হরিদাসের জন্য রাজকর্ম্মচারী হইতে স্বীয় বাসস্থানের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান এবং তন্মধ্যস্থিত এক কুটীর চাহিয়া লইলেন। গরিব হরিদাস তৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন, কিছুতেই আর প্রভুর নিকট আসিতে চাহেন না। আমি নরাধম অস্পর্শীয়, এই বলিয়া বার বার কৃতঞ্জলিপুটে মিনতি করিতে লাগিলেন। চৈতন্য বলিলেন, তোমার স্পর্শে আমি পবিত্র

হইব, তুমি পরম পবিত্র যোগী, বেদ এবং তপস্যা। অতঃপর তাঁহাকে ঐ কুটীরে বাসা দিয়া প্রভু নিজভৃত্য গোবিন্দের দ্বারা প্রতিদিন প্রসাদ পাঠাইতেন। অন্যান্য বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপের সময় আমার প্রতিও দয়াল গৌরাঙ্গ একবার করুণা কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। সে দৃষ্টি কি হৃদয়ানন্দকর! হরিগতপ্রাণ ভক্তের অপাঙ্গভঙ্গীতেই সন্তপ্তচিত্ত দীনজনের প্রাণ শীতল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবিগলিত কমলনয়ন বাস্তবিকই পাপদগ্ধ ভগ্নাত্মাদিগের পরম শান্তির আলয় ছিল। যাঁহার দৃষ্টি হরিপদারবিন্দে সদাকাল নিবদ্ধ তাঁহার একবারের সস্নেহ প্রেম-দৃষ্টি আমার ন্যায় পাপীর পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। পরে আমরা সকলে সমুদ্রে স্নান করিয়া ভোজনে বসিলাম, মহাপ্রভু নিজহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এক এক পাতে তিন তিন জনের ভোজ্য সামগ্রী দিলেন; হৃদয় যেমন প্রশস্ত, হস্ত ও তেমনি দরাজ। তাঁহার হাতের গুণেই জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে ভাল লাগিল, নতুবা তাহাতে তৃপ্তিবোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সকলে হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন, গুরুদেবের সেবা না হইলে কেহ বসিতে পারেন না, প্রভু তাহা বুঝিয়া আপনিও তৎসঙ্গে ভোজন করিলেন। আহারের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহকর হরিধ্বনি আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। আমরা যে সময় পুরীতে গিয়া পৌঁছিলাম তাহার পূর্ব্বেই চৈতন্যের সঙ্গে আরও কয়েক জন দণ্ডী সন্ন্যাসী একত্রিত হইয়া জাতিবিনাশের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিলেন। হরিদাস কেবল নিজের বিনয়গুণে পংক্তিভোজনে সে দিন বসেন নাই, নতুবা মহাপ্রভুর তাহাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইহাঁর জাতিনাশচেষ্টা ম্লেচ্ছাচার কিম্বা অসার সামাজিক ব্যবহার নহে, ভ্রাতৃভাবমূলক এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুগত। আমি একে ব্রাহ্মণ তাহাতে কুলীনের ঘরের মূর্খ, প্রথমে কিছু দিন পর্য্যন্ত যার তার হাতে অন্ন খাইতে রুচি হইত না। আরও অনেক গুলি ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারাও এবিষয়ে তত অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু গৌর-প্রেমের স্রোতে পড়িয়া সে সব ঘৃণা অভিমান ক্রমে লোপ হইয়া গেল। তিনি স্বয়ং যাহা করিতেছেন আমরা কি আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ

করিতে পারি? তবে শেষটা বড় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গের ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত একত্র খাইত এবং পরস্পরের মুখে ভাত তুলিয়া দিত। সামান্য জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে অন্ন খাওয়াইতে পারিলে যেন আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, কিন্তু সে কেবল শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইবার ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। গৌরচন্দ্রই এখানে ছত্রিশ জাতির মধ্যে অন্ন প্রচলিত করেন এ কথা আমি আরও কোন কোন ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি। কেহ কেহ বলেন ইহাঁর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময় এই প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু তাহা হইলে কেবল পুরীর সীমায় কেন ইহা বদ্ধ থাকিবে? চৈতন্যের সময় হইতে শ্রীক্ষেত্র বিশেষরূপে বাঙ্গালী-দের নিকট পরিচিত হইয়াছে। এবং যথেষ্ট সম্ভব যে তাঁহারই প্রেম-ভক্তির তরঙ্গাঘাতে জাত্যভিমানের বন্ধুরতা সমতল হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদিগের বিচার তর্ক এ পক্ষে অনুকূল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা এককালে সাধারণ জাতীয় প্রথার উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে, তবে বলিতে পারি না, কিন্তু গৌরের মত্ততার ধর্ম্ম যে জাতিনাশের এক প্রধান কারণ হইয়াছিল তাহা আমি জানি।

অনন্তর সন্ধ্যাকালে আরতির সময় মহা সমারোহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাহা দেখিয়া রাজা এবং উৎকলবাসিগণ মোহিত হইয়া গেলেন। সে দেশে ইহার পূর্ব্বে কেহ আর এ প্রকার প্রণালীতে কীর্ত্তন করে নাই। প্রতিসন্ধ্যাতে কীর্ত্তনানন্দ হইত, আর তাহার মধ্যে মিশিবার জন্য রাজার মন ছাকুলি বিকুলি করিয়া উঠিত। ভক্তদলে প্রবেশের জন্য তিনি কত সাধ্য সাধনা করিলেন, কিছুতেই গৌরাঙ্গের অভিমত হইল না। রাজার আর্ত্তনাদ ও বিলাপপূর্ণ দুই তিন খানি পত্র নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ দেখিয়া তদ্বিষয়ে প্রভুকে অনুরোধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু হঠাৎ সে কথা সাহস করিয়া কেহ তাঁহাকে বলিতে পারিলেন না। আভাসে তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চৈতন্য বলিলেন, "দামোদর এ বিষয়ে কি বলেন?" তিনি বলিলেন, "উভয়েরই যখন প্রেমাকর্ষণ হইয়াছে তখন আপনিই শেষে তুমি গিয়া মিলিবে, আমি আর কি বিধান দিব?" নিতাইয়ের

অনেক অনুরোধে রাজাকে এক খণ্ড বহির্ব্বাস দেওয়া হইল, রাজা তাহাতেই অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। অবশেষে রামানন্দ অনেক উপরোধ অনুরোধ করাতে এই পর্য্যন্ত হইল যে রাজার পুত্রকে তিনি দেখা দিবেন এই অঙ্গীকার করিলেন। যদিও রাজা অতি সৎলোক এবং একজন হরিভক্ত, তথাপি রাজা নাম থাকাতেই সাধুদর্শনে তাঁহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইল। চৈতন্য বলিলেন, শুভ্র বস্ত্রে এক বিন্দু মসী, এবং এক কলসী দুগ্ধে এক বিন্দু সুরা পড়িলে যেমন হয়, সন্ন্যাসীর পক্ষে এ সব তেমনি জানিবে; অল্প ছিদ্র পাইলে লোকে তাহাই অগ্রে ঘোষণা করে। অতএব "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" রাজপুত্রকে আমার নিকট আসিতে বল। কিশোরবয়স্ক সুন্দর রাজতনয়কে দেখিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইল। তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। ইহাতে রাজাও কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হন।

চৈতন্য পুরীধামে এক এক দিন এক একটি নূতন উৎসব আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে জগন্নাথের সেবা উৎসব সমস্ত তাঁহার ইচ্ছামত হইতে লাগিল। এক দিন সশিষ্য শত শত সম্মার্জ্জনী ও জলপূর্ণ ঘট লইয়া জগন্নাথের মন্দির পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দির মধ্যে সেই ব্যস্ততার ভিতর তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দেয় তাহাতে তিনি মহা বিরক্ত হন। মন্দির ধৌত করিয়া হরিদাসের আশ্রমে সে দিন সকলে ভোজন করিলেন। একত্র ভোজন করিবার জন্য হরিদাসকে প্রভু বার বার ডাকিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না, নিতান্ত কাতর এবং কুণ্ঠিত দেখিয়া শেষে আর তাঁহাকে সে জন্য অনুরোধ করা হইল না। আহারের সময় গৌরের পাতে জগদানন্দ নানা কৌশল করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য ফেলিয়া দেন; তদ্দর্শনে প্রভুর মনে লজ্জা ও রাগ হয়। পাছে জগদানন্দ অভিমানে উপবাস করে সেই ভয়ে তিনি কিছু কিছু খাইতেও বাধ্য হইলেন। ভালবাসার নানা অবস্থা, বিচিত্র ক্রিয়া ইহাঁদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত। এ বৎসর রথযাত্রার দিনে অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল। চৈতন্য ভক্তসঙ্গে দলে দলে বিভক্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লোকদিগকে মত্ত করিয়া তুলিয়া-

ছিলেন। রথের অগ্রে রাজা প্রতাপরুদ্র স্বর্ণসম্মার্জ্জনী এবং সচন্দন সলিল দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি চৈতন্যের প্রেম সঞ্চারিত হইল। তখন উৎকলবাসীরা কীর্ত্তন করিতে জানিত না, পরে বাঙ্গালীদের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। বঙ্গদেশের এক এক স্থানের বৈষ্ণবেরা এক একটি স্বতন্ত্র দল হইয়া সাত দল গায়ক চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ সহ হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, গৌর সকল দলেই এক একবার যোগ দিয়া গান ও নৃত্য করিয়াছিলেন। এমনি তাঁহার প্রেমের উজ্জ্বল প্রভাব, বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি এক সময়েই সাত দলে নাচিতে-ছেন। অবশেষে সাত দল একত্রিত করিয়া মহা উদ্যমের সহিত গৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাভাবময়ী ভক্তির অত্যদ্ভুত অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার শ্রীঅঙ্গে দর্শন করিয়া লোক সকল মোহিত ও বিস্মিত হইয়া গেল। ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি বারম্বার ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন, যেন সোণার পর্ব্বত ধূলায় লুটাইতে লাগিল। তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্য নিতাই ক্রমাগত হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিলেন। এত উন্মত্ততা, তথাপি রাজা একবার যাই তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া ধরিয়া তুলিতে গিয়াছেন, অমনি চৈতন্যোদয় হইয়াছে। রাজাকে নিকটে দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু "ছি! ছি! বিষয়ীর অঙ্গস্পর্শ হইল" এই মনে করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজার মনে ভয় হইল, পরে সার্ব্বভৌমের প্রবোধ বাক্যে তিনি সান্ত্বনা লাভ করিলেন। রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য এবং কীর্ত্তন একটি অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁহার রোমহর্ষণ, ফেন-উদ্গীরণ, দন্তঘর্ষণ, অশ্রুবর্ষণ, হস্ত পদ সঞ্চালন ইত্যাদি একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য। বহুক্ষণ নৃত্য গীতের পর শ্রান্ত গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া সমীপস্থ এক পুষ্পোদ্যানে বিশ্রামার্থ গমন করেন। উপবনের প্রত্যেক বৃক্ষমূলে ভক্তগণ উপবেশন করিলেম। কুসুমিত সুরম্য পাদপশ্রেণীর মধ্যে ভক্তকুসুম বিকসিত হইয়া উদ্যানের রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিল। এই স্থানে রাজা প্রতাপরুদ্র দীন ভক্তবেশে যাবতীয় ভক্তগণের ইঙ্গিতক্রমে চৈতন্যের পদযুগল আলিঙ্গন করেন। ঠাকুর ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়া মুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে

ভক্তমণ্ডলী, এমন সময় নরপতি প্রতাপরুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণব জ্ঞানে রাজাকে তৎক্ষণাৎ তিনি আলিঙ্গন দান করিলেন। নৃপতির অমৃতায়মান প্রীতিপ্রদ বচনাবলী শ্রবণে গৌরের মন উল্লসিত হইল। পরে এই উপবন মধ্যে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া সে দিন সকলে নানা রসযুক্ত প্রসাদান্ন ভক্ষণ করেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনের যে কি ভয়ানক পরিশ্রম তাহা কেবল গৌর রায়ই জানিতেন, তথাপি তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত ভক্ত-দিগকে নিজহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন।

স্বরূপ দামোদরের মুখে চৈতন্যপ্রভু ভাগবতব্যাখ্যা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। একদা তিনি বৃন্দাবনের বিশুদ্ধ প্রেমলীলা বিষয়ে এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ, স সত্যকা-মোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য-কথা রসাশ্রয়াঃ ॥" এইরূপে সত্যকাম ভগবান্ এবং অনুরক্তা অবলাগণ ইন্দ্রিয়বিকার নিরোধ করিয়া শরৎকালীয় কাব্যরসাশ্রিত বাক্য সেবনে শশাঙ্কবিরাজিতা নিশা যাপন করিলেন। এইটি রাসলীলার শেষ এবং সার কথা।

প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে গৌড়ীয় ভক্তগণসঙ্গে নানা লীলা করিয়া এক দিন গৌরচন্দ্র অদ্বৈত এবং নিতাইকে বলিলেন, তোমরা বঙ্গদেশে গিয়া আচণ্ডালে হরিভক্তি বিতরণ কর, মধ্যে মধ্যে আমিও তথায় যাইব। শ্রীবাসের হাতে একখানি বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদ দিয়া বলিলেন, জননীকে এই সকল দিয়া আমার প্রণাম জানাইবে এবং বলিবে যেন তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, পাগল সন্তানের দোষ মায়ে গ্রহণ করেন না। বন্ধুগণকে বিদায় দিবার কালে তিনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাঁচড়াপাড়াবাসী শিবানন্দ সেনকে বলিলেন, তুমি এই উদারচরিত্র বৈরাগী বাসুদেব দত্তের পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, কারণ ইনি পর দিবসের জন্য কিছু সঞ্চয় করেন না। আর তুমি বর্ষে বর্ষে দেশের যাত্রী লইয়া রথযাত্রায় এখানে আসিবে। কুলীন-গ্রামের রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁ প্রণাম করিয়া বলিলেন প্রভো! গৃহী বিষয়ী লোক আমরা, আমাদিগকে কিরূপে সাধন ভজন করিতে হইবে?

গৌর অনুমতি করিলেন, তোমরা সাধুসেবা এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করিও, ইহাই পরম সাধন। সত্যরাজ বলিলেন, বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে? "যাহার মুখে একবার হরিনাম শুনিবে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিও" তিনি এই আদেশ করিলেন। মুরারি গুপ্ত বলিলেন, জীবগণের দুর্গতি দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সকলের পাপভার আমাকে দিয়া তাহাদিগকে আপনি উদ্ধার করুন। চৈতন্য এই কথায় বিগলিতহৃদয় হইয়া বলিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায় সকলেই মুক্ত হইবে, কাহারো জন্য তোমাকে নরক ভোগ করিতে হইবে না, তিনিই সকলকে উদ্ধার করি–বেন। এইরূপে একে একে বিদায় লইয়া সকলে দেশে চলিয়া গেলেন, আমি তথায় রহিলাম। সঙ্গিগণ আমাকে ভয় দেখাইয়া তাড়না করিতে লাগিল। চৈতন্য আমার পানে চাহিয়া স্নেহভরে একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তোমরা যাও, আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। আমি জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিতাম, আর আমোদ আহ্লাদে দিবা নিশি প্রভুর আনন্দময় সহবাসে কাল যাপন করিতাম। হরিদাস ঠাকুর, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রভুর সঙ্গে রহিয়া গেলেন।

বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ বিদায় হইলে সার্ব্বভৌম অবসর পাইয়া গোসাঞীকে পাঁচ দিন ঘটা করিয়া নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। তাঁহার এক গৃহপালিত কুলীন জামাতা ছিল, তাহার ষাইটটী স্ত্রী, সে বড় নিন্দুক স্বভাবের লোক। ভোজনের সময় পাছে প্রভুকে সে কোন মন্দ কথা বলে এই জন্য ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লাঠি হাতে করিয়া দ্বারে বসিয়া রহিলেন। উহারই মধ্যে যাই একটু সুযোগ পাইয়াছে, অমনি সে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "দশ জনের খাদ্য একজন সন্ন্যাসী খাইতেছে?" ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করিলেন, তাঁহার গৃহিণী শাঠীর মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া "ওরে তোর ষাইটটী স্ত্রী বিধবা হউকরে "এই বলিয়া গালি পাড়িতে লাগি-লেন। গৃহজামাতার মান্য সকল কালেই সমান। আমি এ সকল ব্যাপার দেখিয়া কিছুতেই আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ক্রোধাস্ফালন, তাঁহার ব্রাহ্মণীর আর্ত্তনাদ ক্রন্দন, জামাই বাবুর উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান এ সমস্ত অতিশয় কৌতুকজনক। অনন্তর চৈতন্য মিষ্ট বাক্যে উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান করেন, তবে সে বিবাদ মীমাংসা হয়। ভট্টাচার্য্যের অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল, কিছুতেই আর তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না; ব্রাহ্মণীকে বলিলেন শাঠীকে বল, তাহার স্বামী পতিত হইয়াছে, তাহাকে যেন সে আর গ্রহণ না করে। জামাতাটি বিধিমতে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়া শেষে শান্ত শিষ্ট হয় এবং গৌরের পথ অনুসরণ করে।

দেখিতে দেখিতে আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিল, নিতাই অদ্বৈত সকলে রথ দেখিতে আসিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ নৃত্য কীর্ত্তন হইল। এবার শিবানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদির পরিবারেরাও আসিয়াছিলেন। ভক্তসহবাসে কয়েক মাস পান ভোজন নৃত্য কীর্ত্তন মহোৎসব ইত্যাদি আমোদে পরম সুখে সকলে অবস্থান করিতেন। চৈতন্য এ অবস্থাতেও মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্গের সঙ্গে জলে সাঁতার খেলিতেন। জলকেলী ভক্তিপথের অনুরূপ ক্রীড়া। প্রেম ভক্তিরসে সন্তরণ এবং ক্রীড়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। দেশে বিদায় দিবার সময় প্রভু নিত্যানন্দের হাতে ধরিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, প্রতি বৎসর তোমার এখানে আসিলে চলিবে না, দেশে থাকিয়া আমার ইচ্ছা সফল করিবে, তুমি ভিন্ন আমার কার্য্য করে সেখানে এমন কেহ নাই। কুলীনগ্রামবাসীরা পূর্ব্বের ন্যায় বৈষ্ণবের লক্ষণ কিরূপ জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় পুনরায় গৌর হাসিয়া বলিলেন, "যাহার দর্শনে মুখে হরিনাম আইসে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জান।" এ বড় সহজ লক্ষণ নয়। এইরূপে চারি বৎসর কাল গৌরচন্দ্র এখানে রহিলেন, তীর্থ ভ্রমণে দুই বৎসর গত হয়। তদনন্তর বৃন্দাবন গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বৃন্দাবনযাত্রা এবং গৌড় দর্শন।

গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন মনে করিয়া পুরীধাম পরিত্যাগ করত চৈতন্য প্রভু প্রথমে কটকে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় রাজা প্রতাপরুদ্র মহিষীগণ সহ তাঁহার চরণ বন্দনা করেন এবং বিশেষরূপে তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। রামানন্দ রায় রাজার এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন; রাজা বহু সমাদরে তাঁহাকে এবং অন্য লোক জন সঙ্গে দিয়া গোসাঞীকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন, আমরা কয়েক জন সঙ্গে চলিয়া আসিলাম, কেহ কেহ পুরীতেও রহিলেন। প্রভু কিছু দূর গিয়া রাজার লোক জন সমস্ত বিদায় দিলেন, কেবল রাজকর্ম্মচারী একজন মহাপাত্র সঙ্গে রহিল। পথের মধ্যে একস্থানে এক দুষ্ট যবনের অধিকার ছিল। তাহার সীমায় পৌঁছিয়া উক্ত মহাপাত্র তাহাকে আহ্বান করিলেন। সে ব্যক্তি গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য্য বীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হওত নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক নিজের লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিল। আপনিও কতক দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। প্রথমে মহাপ্রভু পাণিহাটী গ্রামে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। মনে ইচ্ছা ছিল এইখানে কয়েক দিন নির্জ্জনে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিবেন, কিন্তু লোক পরম্পরায় তাঁহার স্বদেশে পুনরাগমনবার্ত্তা অল্প কাল মধ্যে চারিদিকে এমনি বিস্তার হইয়া পড়িল যে, নির্জ্জনতা আর রহিল না। নবদ্বীপ শান্তিপুর সকল স্থানেই সংবাদ গেল। গৌরদর্শনের জন্য আপামর সাধারণ স্ত্রী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল, মহা হরিধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল, লোকের ব্যাকুলতা আর্ত্তি দেখিয়া বাচস্পতি কি করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না, পাণিহাটী গ্রাম লোকে লোকারণ্য হইল। লোকদিগের জনতা দেখিয়া দীনের বন্ধু গৌরচন্দ্র আর ঘরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না।

তথাপি যাত্রিগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া ঘরে যাইতে চাহে না, বিষম সমারোহ হইয়া উঠিল ইহা দেখিয়া তিনি তথা হইতে রাত্রিযোগে প্রস্থান করিলেন এবং কুমারহট্টে (হালিসহর) আসিলেন। লোকের আর বিশ্রাম নাই, এক দল যাইতেছে আবার দলে দলে আসিতেছে। চৈতন্য সেই গোলযোগের মধ্যে প্রস্থান করিয়াছেন, বাচস্পতি তাঁহাকে না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, লোকেরা নিরাশ হইয়া পড়িল। তাহারা বাচস্পতিকে বলে, "ঐ ব্রাহ্মণ প্রভুকে কোথায লুকাইয়া রাখিয়া ভান করিতেছে। উনি আপনি উদ্ধার হইবেন কেবল এই চেষ্টা!" সে ব্রাহ্মণ একে নিজের দুঃখে কাঁদিতেছে, তাহার উপর আবার ঐ সকল বাক্যযন্ত্রণা। এমন সময় এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে ঠাকুর কুলিয়া গ্রামে গিয়াছেন। শুনিবামাত্র সকলে তথায় দৌড়িল। এদিকে চৈতন্য কুমারহট্ট হইতে কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এবং বাসুদেব দত্তের বাড়ী হইয়া কুলিয়াগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় মাধব দাসের গৃহে সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন। এই স্থানে এখনও একটি বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে। গৌরকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ অঞ্চলের অনেক লোক কুলিয়াগ্রামে আসিয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্রের টীকাকার বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে চৈতন্য ভক্তিপথে আনিয়াছেন ইহা শুনিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপক, ছাত্র, পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং কুলিয়াগ্রামে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। যত দিন নবদ্বীপে তিনি ছিলেন তত দিন তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, এক্ষণে বড় লোকের নামে চৈতন্যোদয় হইল। যেখানে গৌরচন্দ্র সেইখানে মহাজনকোলাহল। কুলিয়াগ্রামে বহুলোক সমবেত হইয়া চারিদিকে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; তাহারা মাধবদাসের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রত্যেক দলের সঙ্গে গৌর একবার করিয়া নাচিলেন। নানা স্থানে হাট বাজার বসিল, অদ্বৈত নিতাই প্রভৃতি শান্তিপুর ও নবদ্বীপের ভক্তগণ তথায় আসিলেন; লোকের সমারোহ, হরিনামের কোলাহল, ধর্ম্মের আন্দোলন দেখিয়া শুনিয়া চৈতন্যের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এক ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া বলিল ঠাকুর! আমি বৈষ্ণবের অনেক

নিন্দা করিয়াছি ইহার প্রায়শ্চিত্তবিধান কি হইবে? ঠাকুর বলিলেন সেই পাপ ছাড়িয়া বিষ্ণুপূজা এবং ভক্তদিগের গুণ গান কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ বিধি। পরে নবদ্বীপস্থ সেই ভাগবত পাঠক দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে ভাগবত পাঠ করিতে হয় তাহা আমাকে বলিয়া দিউন। প্রভু বলিলেন ভক্তি সর্ব্বোপরি ইহাই কেবল ব্যাখ্যা করিও। তদনন্তর তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে সচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষৎ করিয়া রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হন।

গঙ্গার দুই ধারের লোক স্রোতের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন সময় যে তিনি নির্জ্জনে বসিয়া একাকী আপনার হৃদয়স্থ দেবতার সহবাসসুখসম্ভোগ করিবেন এমন অবসর ছিল না। যেখানে যান সেই খানেই সহস্র সহস্র লোক একত্রিত হয়। তাহা দর্শনে অবশ্য গৌরের মনে উল্লাস জন্মিত, কিন্তু সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত উৎসাহাগ্নির মধ্যে বাস করিতে হইত, বিশ্রামের সময় পাইতেন না। এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিধানস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশ যেন তৎকালে ভাসিতেছিল; তাহার উপর নিতাই, অদ্বৈত হরিনাম প্রচার দ্বারা ঐ সকল স্থানকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং চৈতন্যের পুনরাগমনে লোকের আনন্দোৎসাহ আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। এই সময় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হয়। ইয়োরোপে মার্টিন লুথার খ্রীষ্টধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন, এবং পঞ্জাবে গুরু নানক হরিভক্তির স্রোত খুলিয়া দেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম চৈতন্যের ধর্ম্মের অনুরূপ। বাবা নানকের ভক্তিপ্রভাব অদ্যাপি সমরকুশল পরাক্রমশালী শিখ জাতির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় শিখধর্ম্মের ইতিহাস অতি বিস্তীর্ণ, বিবিধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত এবং অতিশয় মনোহর। নানক এই পবিত্র হরিসঙ্কীর্ত্তনকেই সার বলিয়া প্রচার করিয়া যান। তথায় সেই মহাবলশালী বীরধর্ম্মাক্রান্ত শিখদিগের মধ্যে এখনও বিনয় ভক্তি নম্রতা এবং সাধুভক্তি দেখিয়া হৃদয় গলিয়া যায়। "সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হরিকীর্ত্তন জায়াধার" শিখধর্ম্মীরা অদ্যাবধি এই ভজন গান করে।

অতঃপর চৈতন্যদেব ভাগীরথীর স্রোতের প্রতিকূলে তরণীযোগে বহুদূরব্যাপী জনস্রোতকে পশ্চাতে এবং পার্শ্বে লইয়া রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান পুরাতন রাজধানী গৌড় নগরের নামান্তর মাত্র। এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে বৈষ্ণবদিগের একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। তৎকালে রামকেলী অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সৈয়দ্ হুসেন্ সহা যাঁহার কথা ইতঃপূর্ব্বে কয়েক বার উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি এখানকার সিংহাসনে তখন রাজত্ব করেন। হুসেন্ সাহা এক জন উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত ন্যায়বান্ রাজা ছিলেন; প্রায় চব্বিশ বৎসর মহাগৌরবের সহিত স্বাধীনভাবে তিনি বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা আসাম দেশকে আপনার অধীনে রাখেন। মিশর দেশীয় ঘোর অত্যাচারী কাফ্রিদিগকে তিনিই ডেকান্ অঞ্চলে বিদায় করিয়া দেন, তথায় তাহারা সিদ্ধি নামে খ্যাত হয়। পুরাতন দুষ্ট পাইকদিগকেও কর্ম্মচ্যুত করিয়া তিনি রাজকার্য্যের উন্নতিবিধান করেন। গৌরাঙ্গের সমাগমে নগরমধ্যে ভয়ানক আন্দোলন সমুপস্থিত হইল; এবং নগররক্ষক প্রমুখাৎ সন্ন্যাসীর অলৌকিক মহিমার কথা শুনিয়া হুসেনের চিত্ত একবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি শুনিলেন যে সন্ন্যাসী কাহারো নিকট কিছু গ্রহণ করেন না, হরিনাম ভিন্ন আর তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই; এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য নগর মধ্যে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। ফলতঃ এ যাত্রা গৌরচন্দ্র যে কয় দিন বঙ্গদেশে ছিলেন ধর্ম্মপ্রচার ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কার্য্য কিছুই ছিল না। অবিশ্রান্ত লোকের জনতা এবং তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া কেমন করিয়াই বা নিশ্চিন্ত মনে তিনি বিশ্রাম করিবেন? দূত মুখে সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় গৌরপ্রেমে মজিয়া গেল। তিনি কেশব বসু নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি ভয়ে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল "মহারাজ! কে বলে এ ব্যক্তি বৃক্ষতলবাসী গরিব সন্ন্যাসী"? চৈতন্য যে এক জন দেববলধারী মহাপুরুষ হুসেনের তাঁহাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসী আপনার রাজ্যে থাকিয়াও আমার আজ্ঞা পালন করেন,

তাঁহার আদেশ সকল রাজ্যের শিরোধার্য্য। দেখ, আমার এই নিজ-রাজ্যের মধ্যেই কত লোক এমন আছে যাহারা আমার মন্দ কামনা করে; বিনা বেতনে আমি এত লোক এক জায়গায় কখনই করিতে পারি না; আমি যদি বেতন দিতে বিলম্ব করি, তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভৃত্যগণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। আর দেখ, ইহাঁর কথা সর্ব্বদেশের লোক কেমন কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করে, আপনার ঘরের খাইয়া ইহাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহাও ভালরূপে করিতে পায় না বলিয়া তাহাদের কত আক্ষেপ! অতএব তাঁহাকে আর গরিব বলিও না। এখানে তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, তদ্বিষয়ে কেহ প্রতিরোধ করিলে আমি তাহার মস্তক লইব। এই হুসেন্ সাহা ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে উড়িষ্যা রাজার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সে দেশের অনেক হিন্দুকীর্ত্তি দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন, এখন দেখ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! লোকের অত্যন্ত সমারোহ দর্শনে তত্রত্য গৌরভক্তগণ যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন, রাজারত মতিস্থিরতা নাই, কাহার কুমন্ত্রণার বশীভূত হইয়া কোন্ সময় আবার বিপদ ঘটাইবে, অতএব ঠাকুরকে রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বলা যাউক। এক ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহারা এই বিষয় চৈতন্যকে বলিয়া পাঠাইলেন। সে বিপ্র বলিবে কি, ভাবে মত্ত গৌর-চন্দ্রের নিকট অগ্রসর হইতেই পারিল না। লোকের ভয়ানক জনতা দর্শনে ব্রাহ্মণ নিকটে যাইতে অসমর্থ হইয়া শেষে তাঁহার সঙ্গিগণকে সংবাদ দিয়া আসিল। তাঁহারা ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। গোসাঞীজীও আভাসে বুঝিতে পারিলেন যে ইহাদের ভয় হই-য়াছে; তিনি সে দিকে আর কর্ণপাত না করিয়া প্রভূত উদ্যমের সহিত নির্ভয়ে নাচিতে গাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ প্রেমরস পান করাইয়া সকলকে এমনি প্রমত্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিত তিনি, অন্য সাধারণ লোকেরও লজ্জা ভয় চিন্তা বিনষ্ট হইয়াছিল। মহাপ্রভু বৈষ্ণব-দিগকে বলিলেন "কেন তোমরা ভয় পাও! রাজা যদি ডাকে আমি আগে যাইব। এ যুগে স্ত্রী শূদ্র যবন চণ্ডাল রাখাল সকলেই হরি-ভক্তিতে কাঁদিবে, কেবল জাতি কুল বিদ্যা ধন তপস্যাভিমানী

ভক্তদ্বেষীরাই বঞ্চিত থাকিবে। রাজা আমাকে ডাকিবে, আমিওত তাহাই চাই”! তাঁহার জীবন্ত আশাবাক্য শ্রবণে সকলে নির্ভয়চিত্ত হইলেন।

রূপ সনাতনের সঙ্গে এই স্থানে প্রথম গৌরাঙ্গের মিলন হয়। এই বিখ্যাত প্রেমিক বৈরাগী ভ্রাতৃদ্বয়কে তৎকালে চৈতন্য এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, তোমরা যেমন উত্তম হইয়া আপনাদিগকে হীন করিয়া মানিতেছ, তেমনি অচিরে হরি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; বিষয় ত্যজিয়া নিশ্চিন্তমানস হও, পশ্চাতে আমি সমুদায় বিশেষ করিয়া বলিব। ভ্রাতৃদ্বয় গৌরকে নানামতে স্তব স্তুতি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা পরম বৈষ্ণব দুই ভাই ধন্য, কিন্তু আমাকে এরূপে স্তব করিও না, আমি জীব, তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার বৃন্দাবনদর্শন হয়, যেন আমার অন্তরে কৃষ্ণভক্তি স্ফূর্ত্তি পায়। তদনন্তর বহুলোকসমারোহ দেখিয়া সনাতন বলিলেন, এত লোক যাঁহার সঙ্গে তাঁহার কি কখন বৃন্দাবনযাত্রা সম্ভব? তথাপি চৈতন্য কানাইয়ের নাট্যশালা পর্য্যন্ত গমন করিলেন, কিন্তু লোক আর কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। শেষ সনাতনের কথানুসারে তাঁহাকে পুনরায় শান্তিপুর হইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

শান্তিপুর নগরে প্রভুর পুনরাগমন হইলে তৎক্ষণাৎ সচীদেবীকে আনিবার জন্য অদ্বৈত গোস্বামী লোক পাঠাইলেন। কতিপয় ভক্তসঙ্গে সচীমাতা যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলে চৈতন্য তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার মাতৃভক্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। বহু দিনান্তে আবার সচীদেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া বিবিধ ব্যঞ্জনের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইলেন। জননীর পবিত্র হস্তের অন্ন ব্যঞ্জন দর্শনে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। অন্ন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আহারে বসিয়া শাকের গুণ ও মহিমা বর্ণনা করিলেন। বেতোর শাক তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁহার মুখে শ্রীশাকের মহিমা শুনিলে কঠোর চিত্তও ভাবুকতায় পূর্ণ হয়। সামান্য উদ্ভিদ ভোজনে তাঁহার এত অনুরাগ হইত। গুরুদেবের প্রসাদ পাইবার জন্য

ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে মহাগণ্ডগোল আমোদ পরিহাস করিতেন। পত্রাবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া প্রেমের বিবাদ উপস্থিত হইত।

ভক্তদলের মধ্যে সে সময় প্রাচীন মহাপুরুষদিগের পূজা মহোৎসবের জন্য এক একটি দিন নির্দ্ধারিত ছিল। "আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তি তৎস্বরূপতাং" ইত্যাদি শ্লোক হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। মহাপুরুষদিগকে ভক্তির সহিত ভাবনা ও অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য তৎস্বরূপ লাভ করে। নবদ্বীপে শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজার কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। চৈতন্য শান্তিপুরে থাকিতে থাকিতে প্রাচীন ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর উৎসবতিথি উপস্থিত হয়। মাধবেন্দ্র অদ্বৈতের গুরু ছিলেন। অদ্বৈতেরও পূর্ব্ব বাস শ্রীহট্টের নিকট নবগ্রামে ছিল। ইহাঁর পিতার নাম কুবের, তিনি শান্তিপুরে বাস করেন। যখন এ দেশে ভক্তির কিছুমাত্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইত না তখন মাধবপুরী একা ভক্তিরসে মাতিয়া বেড়াইতেন। তিনি অদ্বৈতকে দীক্ষিত করেন। এই মহোৎসব উপলক্ষে মহা ধুম ধামের সহিত আহারাদি ও নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন হয়। এইরূপ এক একটি ক্রিয়া কর্ম্মে মহোৎসবে যথেষ্ট আমোদ হইত। এক জন অপরকে সেবা করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কেহ বা সমাগত বৈষ্ণবগণের চরণধৌত কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতেন। দ্রব্যাদি আহরণ, রন্ধন, পরিবেশন ইত্যাদি গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্যে সকলেরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। চাপাল গোপাল নামক নবদ্বীপের সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ কিছু দিন পরে কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সে এই স্থানে আসিয়া অনেক আর্ত্তনাদ করায় চৈতন্য তাহাকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলেন।

এই শান্তিপুর নগরে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে চৈতন্যের পূর্ব্বে একবার পরিচয় হইয়াছিল। রঘুনাথ সপ্তগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্য গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র। গোবর্দ্ধন বার লক্ষ মুদ্রার অধিস্বামী ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ভূমি এবং অর্থ দ্বারা নবদ্বীপস্থ অনেক ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। চৈতন্যের মাতামহ এবং পিতাকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন, সেই কারণে প্রভু ইহাঁদিগকে ভালরূপে জানিতেন। রঘুনাথ

বালককাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। গৌর যখন সন্ন্যাসী হইয়া শান্তিপুরে আসেন তখন অদ্বৈতভবনে বহুলোক সমাগত হয়, রঘুনাথও তন্মধ্যে ছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধ আচার্য্যের সহায়তায় তিনি চৈতন্যের প্রসাদ লাভ করেন। তাহার পর রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রেমে উন্মাদপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করিতেন। বার বার নীলাচলে যাইবার জন্য পলায়ন করিতেন এবং বার বার তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতেন। দশ বার জন লোক নিয়ত তাঁহার নিকট প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। কত ধন রত্ন ভোগ বিলাসের সামগ্রী দেখাইয়া গোবর্দ্ধন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সন্তানের মন ফিরাইতে পারেন নাই। পরে এই যাত্রায় গৌরচন্দ্র শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ তাঁহার পিতাকে বলিলেন, আমি গৌরচরণ দর্শনে যাইব বিদায় দাও, অন্যথা আমি প্রাণত্যাগ করিব। গোবর্দ্ধন স্নেহপরবশ হইয়া বহু লোক জন সামগ্রী পত্র সঙ্গে দিয়া সন্তানকে পাঠাইয়া দেন। রঘুনাথ কিরূপে বন্ধনমুক্ত হইয়া উদাসীন বেশে গৌরাঙ্গের সঙ্গে নীলাচলে চির দিন বাস করিবেন এই কেবল সর্ব্বদা ভাবিতেন। প্রভু তাঁহার আন্তরিক ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি স্থির হইয়া গৃহে অবস্থিতি কর, বাতুল হইও না, ক্রমে ক্রমে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়। লোক দেখাইবার জন্য মর্কট বৈরাগ্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়ভোগ কর, বাহিরে লৌকিক ব্যবহার রক্ষা করিয়া অন্তরে নিষ্ঠাযুক্ত হও, অচিরে সেই ভগবান্ হরি তোমাকে উদ্ধার করিবেন। আমি বৃন্দাবন হইতে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে তুমি তথায় যাইবে। কোন্ সময় কি ভাবে যাইবে, হরি তাহা তোমাকে বলিয়া দিবেন। তাঁহার কৃপা যাহার উপর হইয়াছে তাহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? তখন রঘুনাথ এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতার মন সন্তুষ্ট হইল।

শান্তিপুর হইতে চৈতন্য গোসাঞী কুমারহট্টে আসেন, তথায় শিবানন্দ বাসুদেব দত্ত, শ্রীনিবাসাদি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীনিবাস নামক

এক জন ভক্ত ভাতৃগণ সহ তখন এই স্থানে থাকিতেন। ঠাকুর এক দিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীনিবাস! তুমি কোথাও যাও না, ভিক্ষাও কর না, এত পরিবার তোমার, কিরূপে দিন চলে? তিনি বলিলেন কোথাও যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, কোন রূপে দিন চলিয়া যাইবে। তবে তুমি সন্ন্যাস কর না কেন? না, তাহা আমি পারিব না। সন্ন্যাসীও হইবে না ভিক্ষাও করিবে না, তবে কিরূপে পরিবার পালন করিবে? তোমার কথার ভাবত আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একালে কোথাও না গেলে এক কপর্দ্দক পাওয়া যায় না। যদি আপনা হইতে দ্বারে কিছু উপস্থিত না হয়, তবে সে দিন তুমি কি করিবে? শ্রীনিবাস এক, দুই, তিন বার হাততালি দিয়া বলিলেন এই আমার প্রতিজ্ঞা তিন উপবাসের পর যদি আহার না মিলে তবে গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব। তখন গৌরচন্দ্র যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।" যে সকল নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি অনন্য ভাবে চিন্তা করত আমার উপাসনা করে, তাহাদিগের অভাবের বস্তু আমি বহন করিয়া আনি এবং তাহা নিজেই রক্ষণাবেক্ষণ করি।

অনন্তর গৌরচন্দ্র কুমারহট্ট হইতে পাণীহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থিতির পর এক দিন রাঘবকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, এই যে নিত্যানন্দকে দেখিতেছ ইহার দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইবে, ইহাঁকে আমা হইতে অভেদ জ্ঞান করিও। পরে নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান স্থান এইটিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি বরাহনগরে উপস্থিত হন। এখানে এক ব্রাহ্মণ অতি মিষ্ট স্বরে ভাগবত পড়িতেন; তাঁহার পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চৈতন্য প্রভু ভাগবত আচার্য্য এই নাম তাঁহাকে প্রদান করেন। এইরূপে গঙ্গার উভয়কূলবর্ত্তী গ্রাম সমস্ত প্রেম ভক্তিতে প্লাবিত করিয়া তিনি পুনর্ব্বার নীলাদ্রি চলিলেন। শান্তিপুর পরিত্যাগ কালে মাতাকে প্রণাম করিয়া আর

সকলকে বলিয়া আসেন যে এ বৎসর তোমরা কেহ শ্রীক্ষেত্রে যাইবে না, আমি বৃন্দাবন গমন করিব, তোমরা অনুমতি দাও যেন তথা হইতে নীলাচলে পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে আমি ফিরিয়া আসিতে পারি। বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক স্থানে ভক্তসম্মিলন ও বিচ্ছেদের সময় হর্ষ বিষাদ প্রীতি অনুরাগ ইত্যাদি ভাবের ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইত। পুনরুক্তির ভয়ে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমি লিখিলাম না। আমার লেখা কেবল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা মাত্র, কিন্তু কোন ঘটনায় তাঁহাদের ভাবের বিরাম ছিল না, ভাদ্রমাসের গঙ্গানদীর ন্যায় ভক্তবৃন্দের প্রেমের প্রবাহ অবিশ্রান্ত প্রধাবিত হইত। ভাবময় জীবন, নিরন্তর সেই স্রোতেই সকলে ভাসিতেন। হ্রাস না হইয়া বরং উত্তোরোত্তর আরও ঘনীভূত এবং প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। এক বিষয় বারংবার শুনিতে শুনিতে হয়ত অনেকের নিকট ইহা পুরাতন হইয়া আসিল, কিন্তু তাঁহাদের ভাবভক্তি প্রেম স্থান কাল অবস্থা বিশেষে বিচিত্র এবং নবীনরূপে প্রকাশিত হইত। সকল রসেরই জোয়ার ভাটা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু গৌরভক্তবৃন্দের প্রেমোন্মত্ততা এক মাত্র জীবিকা ছিল, শুষ্কতা নির্জ্জীবতা রসহীনতা তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যু বলিয়া বোধ হইত। গৌরের আবার ষোল আনার উপর আঠার আনা না হইলে কুলাইত না। প্রবল বন্যাহত পদ্মানদীর ন্যায় তাঁহার জীবনপ্রবাহ ভাবভরে সর্ব্বদাই টল্‌মল্ করিত। তাঁহার জীবন আর ভক্তি প্রমত্ততা এক অখণ্ড জিনিষ, একটি হইতে অপরটিকে নিমেষের জন্যও পৃথক্ করা যায় না। হয় ভাবের বিষম উত্তেজনা, আনন্দোল্লাসের প্রবল উচ্ছ্বাস, না হয় পাষাণভেদী ক্রন্দন ব্যাকুলতা, বিরহ যন্ত্রণা, দুঃসহ ক্লেশানুভূতি, পর্য্যায়ক্রমে প্রধানতঃ এই দুইটি ভাব গতায়াত করিত। আমাদের মত লোকের এক দিন একটু উৎসাহ প্রমত্ততা হইলে, দশ দিন উপবাস শুষ্কতা নির্জ্জীবতায় গত হয়। প্রেম-সাগর গৌরচন্দ্র যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ছিলেন এক দিনের জন্য, এক ঘণ্টার জন্যও তাঁহার মত্ততার বিরাম দেখা যায় নাই। যাহার চক্ষের সম্মুখে তাঁহার ভাবময়ী শ্রীমূর্ত্তি একবার আবির্ভূত হইয়াছে, যে দেশ যে গ্রাম দিয়া তিনি একবার চলিয়া গিয়াছেন, সে সকল স্থান এবং মনু-

ষ্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। জীবন্ত মনু-
ষ্যের কোন ক্রিয়া উদ্যমশূন্য নীরস হয় না।

নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচার।

চৈতন্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিতাই পাণিহাটী গ্রামে প্রথমে প্রচার-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌরের ভক্তিভাব তাঁহাতে বিশেষরূপে সংক্রামিত হইয়াছিল। ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে লইয়া মহা উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য্যে ব্রতী হওত তিনি নানা জাতীয় লোকদিগকে ভক্তি-পথে আনিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণও এক এক জন গুরুতুল্য উন্নত চরিত্রের লোক, অনেক বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। তিন মাস কাল প্রভূত উৎসাহ সহকারে হরিনাম প্রচার করিয়া গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রামসকলকে ইহাঁরা প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। অবধূত এ সময় প্রেমাবিষ্ট হইয়া আর এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। পূর্ব্বের যোগিবেশ পরিত্যাগ করিয়া পট্টবস্ত্র এবং স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি খচিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত হন। অল্পকালমধ্যে বঙ্গদেশে তাঁহার এক প্রকাণ্ড ভক্ত এবং প্রচারক দল প্রস্তুত হইল। গঙ্গার উভয় কূলে যত যত গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামে তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পাণিহাটিতে ক্রমাগত কিছু দিন ধরিয়া নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়া-ছিল এবং বহু শত লোক বৈষ্ণবপথ আশ্রয় করিয়াছিল। কয়েক মাস পরে শচীমাতাকে দেখিবার জন্য নিতাই ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। কয়েক দিন খড়দহে থাকিয়া সপ্তগ্রামে উপনীত হইলেন। সপ্তগ্রাম তৎকালে এ দেশের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান এবং অতিশয় বিখ্যাত নগর ছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া ঐ নগরে উদ্ধরণ দত্ত নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ধনবান্ সুবর্ণবণিগ্‌গৃহে তিনি উপস্থিত হন। এই উদ্ধরণ দত্ত হইতে সুবর্ণবণিক্‌সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষরূপে বিস্তা-রিত হইয়াছে। ঐ স্থানে এখনও উদ্ধরণ দত্তের স্থাপিত এক আখড়া আছে। ত্রিষবিঘা নামক ষ্টেসনের নিকট এই সপ্তগ্রাম। এখানে

প্রাচীন কালের গৃহাদির ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্ন অদ্যাপি কিছু কিছু নয়নগোচর হয়। চৈতন্যের অবস্থান কালে নবদ্বীপের মধ্যে যেমন হরিনাম পরিঘোষিত হয়, তেমনি সপ্তগ্রামের প্রত্যেক বণিকের ঘরে নিতাই সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন। সে সময় স্বর্ণবণিগ্‌গণ ব্রাহ্মণদিগের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের উন্নতিসম্বন্ধে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিত যে, নিত্যানন্দের কৃপায় ইহারা তরিয়া গেল। ফলে নিতাই সপ্তগ্রামে হরিনাম প্রচার করিয়া বহু লোককে স্বদলভুক্ত করেন। তদনন্তর তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নবদ্বীপধামে চলিয়া যান। শচীদেবী ইহাঁকে পাইয়া অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইদানীন্তন কেবল ধর্ম্মকর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকিতেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে অপরাপর ভক্তগণ মিলিত হইয়া নবদ্বীপকে পুনরায় হরিনামরসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন। ইহার নিকটবর্ত্তী বড়গাছি, দোগাছিয়া প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম সকলেও সে সময় হরিভক্তি প্রচারিত হয়। নিতাইয়ের নূতনবিধ বেশ ভূষা আচার ব্যবহার দর্শনে সন্দিহান হইয়া এক ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্রে গিয়া চৈতন্যকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তিনি তাহাতে এই রূপ উত্তর দেন যে, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাঁহার চরিত্র নির্লিপ্ত, তাঁহাতে হরি সর্ব্বদা বিরাজ করেন, নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে যাহা পাপ তাহা নিত্যানন্দে সম্ভবে না। রুদ্র হলাহল পান করিতে পারেন, অন্যে করিতে গেলে প্রাণে বিনষ্ট হয়। তাঁহার জীবন বিধিনিষেধের অতীত জানিবে। তাঁহাকে আদর করিলে পরিত্রাণ হয়।

নিত্যানন্দ প্রথম বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং তদবস্থায় বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ডারপুর নামক তীর্থ স্থানে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়াশ্রিত লক্ষ্মীপতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্মীপতি মাধবেন্দ্র পুরীরও মন্ত্রদাতা গুরু। অবধূত নিতাই বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কিছু কাল বৃন্দাবনে থাকিয়া পরে নবদ্বীপে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। গৌর সন্ন্যাসী হইলে ইনি পূর্ব্ব আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করত নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান করিতেন। সুবর্ণবণিক্‌সমাজ ইহাঁর

শিষ্য। গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তির ইচ্ছায় নিত্যানন্দ গোসাঞী নববিধ বেশ ভূষা ধারণ করিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। এই অবস্থায় তিনি বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া শত শত নর নারীকে দলভুক্ত করিলেন। নবদ্বীপে তখন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ অনেকে ছিলেন, অদ্বৈত গোসাঞী আসিয়া তথায় মিলিলেন, সকলের সহিত একত্রিত হইয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে অবধূত নবদ্বীপ ধামে কিছু দিন অবস্থিতি করেন, এবং এই সময় তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয়। বিবাহের ইচ্ছা শুনিয়া অদ্বৈত শ্রীবাস সকলেই মহা আহ্লাদিত হইলেন এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে নিতাই মৃদু মৃদু হাস্য করিতেন। তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাব দর্শনে ভক্তগোষ্ঠী সকলে মুগ্ধ হইলেন। একে তিনি চৈতন্যের বিশেষ আদরের পাত্র তাহাতে প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক, যাহা করেন তাহাতেই লোকের উল্লাস হয়। এক দিন সকলে শ্রীবাসের ভবনে সভা করিয়া বসিয়া আছেন এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতকে ইঙ্গিতে জানাইল বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পরে উভয়ে নিভৃতে কথা বার্ত্তা কহিয়া দিন স্থির করিলেন। নবদ্বীপের উত্তর বড়গাছি গ্রাম, তাহার নিকট সালিগ্রামে পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরখেল নামে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আছেন তাঁহার বসু ও জাহ্নবা নাম্নী দুই পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, সূর্য্যদাস উক্ত কন্যাদ্বয় নিতাইকে অর্পণ করিতে চাহে। শ্রীবাস এই প্রস্তাব শুনিয়া মহা আহ্লাদ প্রকাশ করত সভামধ্যে তাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহা শ্রবণে সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইল, নিতাইও হাস্য করিলেন। পর দিন প্রাতে সকলে দলবদ্ধ হইয়া সালিগ্রামে যাত্রা করেন এবং যথাসময়ে উক্ত কন্যাদ্বয়ের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ প্রদান করিয়া পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। শচীদেবী নব বধূদ্বয়কে পাইয়া যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ঠাকুরের বীরভদ্র নামে এক পুত্র এবং গঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মে।

নীলাদ্রি হইয়া চৈতন্যের বৃন্দাবনগমন।

কতিপয় দিবসান্তে পুনরায় গৌরচন্দ্র নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সমাগমে উৎকলবাসিগণের মধ্যে মহোৎসব আরম্ভ হইল, রাজা গজপতি আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। এ যাত্রায় চারি মাস কালমাত্র তাঁহার এখানে অবস্থিতি হয়। তত্রত্য ভক্তদলে প্রবেশ করিয়া গৌড়-দেশের অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত তিনি বলিলেন। রূপ সনাতনের পরিচয় দিলেন, তাঁহারা এত লোক জন সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাইতে নিষেধ করেন তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কোথায় আমি ভাবিলাম মাতার সঙ্গে দেখা করিয়া গৌরভক্তগণসঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব, দেখি যে লোকের জনতায় পথে চলিতে পারি না। নির্জ্জনে বৃন্দাবন সম্ভোগ করিব, তাহা না হইয়া বহু সহস্র সৈন্যসঙ্গে যেন ঢাক বাজাইয়া চলিলাম। ইহাতে মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল, তাই আবার এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। মাধবপুরী যেমন একাকী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, আমি তেমনি করিয়া যাইব, নিতান্ত পক্ষে এক জনমাত্র লোক না হয় সঙ্গে যাইবে। দামোদর এবং রামানন্দ রায়ের সমীপে এই কথা বলিয়া প্রভু বিদায় চাহিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, কেহ যদি আমার সঙ্গে যায় তাহাকে তোমরা নিষেধ করিও। তোমরা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দাও, তোমাদের সুখেই আমার সুখ। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্য গোসাঞী বনপথে গোপনভাবে বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। বিহঙ্গকূজিত, শ্বাপদবন্য-জন্তু-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ অরণ্যানী নদী নির্ঝর পর্ব্বতরাজি অতিক্রম করিয়া হরিগুণ গাইতে গাইতে তিনি চলিতে লাগিলেন। প্রেমের আবেশে কত পথই পরিভ্রমণ করিতেন। ভয়ও নাই, শ্রান্তিও নাই, মধুর স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। যেখানে নির্ম্মল জলপ্রবাহ, গিরি-

ড়া, এবং সুরম্য কাননকুঞ্জ অবলোকন করেন সেই স্থানকেই বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয়। এমনি তাঁহার গাঢ় প্রেমানুরাগ, বোধ হইতেছিল যেন মৃগ পক্ষী বৃক্ষলতা শৈলকন্দর তটিনী নির্ঝর, হিংস্র জন্তুনিচয় সকলেই তদীয় মুখারবিন্দ-বিগলিত হরিনামামৃত পানে প্রমত্ত হইয়া সেই নাম প্রতিধ্বনিত করিতেছে। বৃক্ষশাখায় বিচিত্রদৃশ্য ময়ূরগণ বসিয়া কেকারব করিতেছে, মৃগকুল ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, জলস্রোতঃ বহিতেছে; এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার মন নিরতিশয় সুখানুভব করিল। এক দিন আহ্লাদিত হইয়া সঙ্গী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন আনন্দ কোথাও পাই নাই। দয়াময় কৃষ্ণ আমাকে বনপথে আনিয়া বড় সুখ দিলেন। সনাতন দ্বারা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়া গৌড়ের পথ হইতে ফিরাইয়া এই পথে আনিলেন, তিনি কৃপাসাগর দীনবন্ধু, তাঁহার দয়া ব্যতীত কোন সুখ হয় না; এই বলিয়া কৃতজ্ঞতাভরে ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। যদিও গৌর এক্ষণে নির্জ্জনবাসী সন্ন্যাসী, কিন্তু তাহার ভ্রমণ দ্বারা আপনাপনি ধর্ম্ম-প্রচার হইতে লাগিল। মহাপুরুষদিগের অস্তিত্বই প্রচারের কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি যে ভাবে যে দেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই ভাব দেখিয়া সে দেশের লোক ভক্তি শিক্ষা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনঘোষণাও নাই, বক্তৃতা করাও নাই, সহজে বিচার তর্ক করাও নাই, তথাপি তাঁহার দর্শনমাত্র লোকের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইত। পথে ঝারিখণ্ড নামক স্থানে অসভ্য ভিল্‌দিগের উপরেও তাঁহার কৃপাবারি বর্ষিত হইয়াছিল। এই রূপে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি কাশীধামে আসিয়া উপনীত হন।

কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া প্রভু বসিয়া আছেন এমন সময় সেই পূর্ব্বপরিচিত তপন মিশ্র আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেল। চন্দ্রশেখর আচার্য্য তখন এখানে পুঁথিলেখার কাজ করিয়া দিন নির্ব্বাহ করিতেন। সহসা ইঁহারা প্রভুর দর্শন পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কাশীধামে মায়াবাদী সন্ন্যাসী পণ্ডিতদিগের বিষম প্রাদুর্ভাব, নির্গুণ ব্রহ্ম, মায়া, অবিদ্যা ভিন্ন আর অন্য কথা নাই। পুরাতন ধর্ম্মবন্ধুদ্বয়ের আগ্রহে তাঁহাকে দিন দশেক কাল

তথায় থাকিতে হইয়াছিল। এক দিন মহারাষ্ট্রীয় কোন ব্রাহ্মণ ইহাঁর তেজোময় দিব্য রূপলাবণ্য ও ভক্তির অলৌকিক ভাব সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দকে এই সংবাদ জানাইলেন। পণ্ডিত ইহা শুনিয়া গর্ব্বিতভাবে হাস্য করিলেন এবং উপহাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হাঁ। শুনিয়াছি, কেশব ভারতীর শিষ্য গৌড়দেশীয় চৈতন্য নামক এক ভাবুক সন্ন্যাসী দেশে দেশে লোক নাচাইয়া বেড়ায়. তাহার ঐন্দ্রজালিক মোহে পতিত হইয়া তাহাকে সকলে ঈশ্বর বলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার সঙ্গে পাগল হইয়াছে, সে সন্ন্যাসী কেবল নামমাত্র, এখানে তাহার ভাবুকালী বিক্রয় হইবে না, তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর, এরূপ উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র লোকের সঙ্গে মিশিলে ইহ পরকাল বিনষ্ট হয়। পণ্ডিতের কঠোর শ্লেষ বচনে সে ব্রাহ্মণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সে কথা চৈতন্যকে বিদিত করিল এবং বলিল, প্রকাশানন্দ একবারও কৃষ্ণনাম না লইয়া তিন বার চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিল। ঠাকুর বলিলেন, মায়াবাদীর মুখে ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য ব্যতীত কৃষ্ণনাম আসে না। কৃষ্ণের নাম ও স্বরূপ দুই অভেদ্য। নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিনই একই বিষয়, তিনিই অভেদ্য চিদানন্দময়। জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ সকল ভিন্ন ভিন্ন। কৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা সমস্তই চিদানন্দময়, স্বপ্রকাশ, তিনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। আমি ভাবুকালী বিক্রয় করিতে আসিয়াছি বটে! বড় ভারি বোঝা! অল্প স্বল্প যাহা পাই এই খানে বিক্রয় করিয়া যাইব।

তদনন্তর ভক্তনিধি গৌরাঙ্গ প্রয়াগে তিন দিবস থাকিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। পথে যেখানে যমুনা দেখিতেন সেই খানেই জলে গিয়া পড়িতেন। যাইবার সময় স্থানে স্থানে অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বৃন্দাবনে গিয়া তিনি সকলই কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ভক্তি প্রমত্ততা দেখিয়া লোকসকল মুগ্ধ হইয়া গেল। এখানে মাধবপুরীর শিষ্য এক সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রভুর প্রথমে আলাপ হয়, তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনধাম চৌরাশি ক্রোশ বিস্তৃত। এখন যে

স্থান বৃন্দাবনতীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শুনা যায়, চৈতন্যের সময় হইতে ইহার আরম্ভ, তৎপূর্ব্বে লোকে নানা স্থান ভ্রমণ করিত। যথায় গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে সে স্থান তাঁহারই আবিষ্কৃত বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির ধর্ম্মকে চৈতন্যই বিশেষরূপে পুনর্জ্জীবন দান করিয়া তাহা প্রচার করেন, এই জন্য তাঁহার আগমনের সময় হইতে বৃন্দাবন একটি বিখ্যাত তীর্থ হইয়াছে। অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এই স্থানকে এখন পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সমভিব্যাহারী বলভদ্রের মুখে শুনিয়াছি, চৈতন্য প্রভুর বৃন্দাবনভ্রমণকালে তথাকার গাভীগণ আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক হম্বারবে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়, মৃগীগণ তাঁহার অঙ্গলেহন করে, বিহঙ্গগণ বিচিত্র মধুরস্বরে গান করিতে থাকে, শিখীকুল তাঁহার অগ্রে অগ্রে নাচিতে নাচিতে যায়, এবং বৃক্ষলতা ফল ফুল বর্ষণ করে, কিন্তু এ কথা আমরা গৌরের নিজ-মুখে কখন শুনি নাই; তবে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে, বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের অন্তঃকরণে কৃষ্ণলীলার ভাব পুনরুদিত হয়। কোন কোন ব্যক্তি চৈতন্যকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রশংসা করাতে তিনি বিষ্ণুঃ! বিষ্ণুঃ! বলিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করেন এবং তাহাদিগকে বলেন, এমন কথা তোমরা কহিও না, জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কখন করিও না, ঈশ্বরের সহিত জীবের তুলনা, জ্বলদগ্নিরাশির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিসদৃশ। এখানে কৃষ্ণদাস নামক এক জন রাজপুত গৌরপ্রেমে মজিয়া তাঁহার সঙ্গে বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করে এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকে। বৃন্দাবনে ক্রমশঃ এত জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতেও সকলে অবসর পাইল না। লোকের কোলাহল, নিমন্ত্রণের আতিশয্য, গুরুদেবের নিরন্তর ভাবা-বেশ উন্মাদ লক্ষণ দেখিয়া, কৃষ্ণদাস এবং বলভদ্র তাঁহাকে প্রয়াগে যাইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে বলিলেন তোমার অনুগ্রহে আমি বৃন্দাবন দেখিলাম, তুমি যেখানে লইয়া যাইতে চাও যাইব। পরে তিন জনে প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে গৌরচন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া অচেতনপ্রায় পড়িয়া আছেন, মুখে ফেন উদ্গীরিত হইতেছে, ইত্যবসরে দশ জন পাঠান জাতীয় অশ্বারোহী সৈন্য বিশ্রামার্থ তথায় অবতরণ করিল। গৌরের অদ্ভুত প্রেমবিকারদর্শনে তাহারা মনে করিল, সঙ্গের এই দুই ব্যক্তি সন্ন্যাসীর ধন রত্ন হরণ করিয়া কোন মাদকসেবন দ্বারা ইহাঁকে অজ্ঞান করিয়াছে। এই সন্দেহে তাহারা উহাদিগকে বাঁধিয়া মারিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণদাস রাজপুত, তাহার সাহস ছিল, স্বরূপ কথা সে প্রকাশ করিয়া বলিল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বচসা চলিতেছে, বঙ্গবাসী বিপ্র বলভদ্র ভয়ে কাঁপিতেছেন, এমন সময় গৌরসিংহ হরি হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার প্রেমময় রূপ দেখিয়া পাঠানদল মোহিত হইয়া গেল। তন্মধ্যে এক জন যে সর্ব্বপ্রধান, সে বৈষ্ণব হইল, চৈতন্য তাহার নাম রামদাস রাখিলেন। বিজুলি খাঁ তাহাদের যে মনিব, সেও মহাপ্রভুর শরণাগত হয়, ইহাদিগকে পাঠান বৈরাগী বলিয়া সকলে জানিত। চৈতন্য প্রয়াগে উপস্থিত হইলে কিছু দিন পর শ্রীরূপ গোস্বামী তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন।

রূপসনাতনের বৈরাগ্য।

শ্রীজীব গোস্বামিকৃত লঘুতোষিণী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যজুর্ব্বেদীয় বিপ্র ধর্ম্মাত্মা কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র ছিল। রূপেশ্বর রাজ্যচ্যুত হইলে তাঁহার তনয় পদ্মনাভ নবহট্ট (নৈহাটী) নামক গ্রামে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, তাঁহার পুত্র কুমার, তাঁহারই পুত্র সনাতন, রূপ, বল্লভ (চৈতন্য ইহাঁকে অনুপম বলিয়া ডাকিতেন) এই তিন ভাই। সনাতন এবং রূপ বৈষ্ণব হওয়ার পূর্ব্বে গৌড়রাজধানীতে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই অবস্থায় "হংসদূত" এবং "পদ্যাবলী" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁরা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিতেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভট্ট উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ইহাঁরা আনয়ন করেন এবং রামকেলী গ্রামের নিকট স্থাপন করেন; সে স্থানের নাম ভট্টগ্রাম। রূপ সনাতন উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণতনয়, যবন রাজার গৃহে বিষয় কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষে দোষী মনে করিতেন। পূর্ব্ব হইতেই ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। রূপের দবিরখাস, এবং সনাতনের সাকরমল্লিক এই দুই যাবনিক উপাধি ছিল। চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে ইহাঁরা ধন সম্ভ্রম উজিরি পদ ত্যাগ করিয়া এমন বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে তাহা শুনিলে ঘোর বিষয়ী লোকেরও চিত্ত চমকিত হয়। এই দুই জন কানাইনাটশাল হইতে প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত কিছু দিবসের পর তাঁহার অনুসন্ধানার্থ নীলাচলে লোক পাঠাইয়া দেন। যখন শুনিলেন গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তখন শ্রীরূপ সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব

কুটুম্বগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া অনুপমের সমভিব্যাহারে প্রয়াগে চলিয়া আসিলেন, এবং সনাতনকে তদ্বৃত্তান্ত লিখিলেন। সনাতনের বিষয়বন্ধন তখনও বিমুক্ত হয় নাই। তিনি ভাবিলেন রাজা যদি আমার প্রতি বিরক্ত হন তাহা হইলেই এ যাত্রায় আমি অব্যাহতি পাই। এই মনে করিয়া আপন ভবনে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাগবত আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিলেন। রাজার লোক আসিলে বলেন শরীর অসুস্থ হইয়াছে। রাজবৈদ্য পরীক্ষা করিয়া জানিলেন সর্ব্বৈব মিথ্যা। ও দিকে মন্ত্রী অভাবে রাজকর্ম্ম অচল হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ তখন উড়িষ্যাদেশে যুদ্ধ উপস্থিত, রাজাকে তথায় যাইতে হইবে। এক দিন গৌড়েশ্বর নিজেই সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাকে লইয়াই আমার সমস্ত কার্য্য, এক ভাইত তোমার ফকীর হইয়া গেল, তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলে আমার সর্ব্বনাশ হয়, অতএব চল আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। সনাতন বলিলেন, অন্য লোক দ্বারা তুমি কার্য্য সমাধা কর; আমার দ্বারা আর চলিবে না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন।

প্রয়াগতীর্থে কোন দেবালয়ে গৌরসুন্দর ভাবকরসে মত্ত হইয়া দক্ষিণ-দেশীয় কোন ব্রাহ্মণের গৃহে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, বহু সংখ্যক লোক অবাক্ হইয়া তাঁহার রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় রূপ এবং অনুপম তৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। চৈতন্য তাঁহাদিগকে আদর পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন বন্দীর অবস্থায় আছেন শুনিয়া প্রভু বলিলেন, আমার সঙ্গে তাঁহার অচিরে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। তদনন্তর ধর্ম্মপ্রসঙ্গে উভয়ের চিত্ত প্রেমরসে পরিপ্লাবিত হইল। নিকটে আয়ুলী নামক গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক জনৈক জ্ঞানী ভক্ত চৈতন্য এবং রূপকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তথায় অনেকে আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল দেখিয়া বল্লভ ভট্ট শীঘ্র তাঁহাকে বিদায় করিলেন। যমুনার তীরে তাঁহার আশ্রম, কোন্ সময় গৌরচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন এই তাঁহার ভয় হইয়াছিল।

রামানন্দের নিকট প্রভু যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করেন, প্রয়াগে বসিয়া সেই সমুদায় তিনি রূপকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহাতে ভক্তি সঞ্চার করেন।

গৌর রূপকে বলিলেন, ভক্তিরসসিন্ধু অসীম এবং গভীর। কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে পুনঃ শত ভাগ করিলে যাহা হয়, জীবের স্বরূপ তত সূক্ষ্ম। এই জল স্থল স্থাবর জঙ্গমময় ভূমণ্ডলে মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প; তন্মধ্যে ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, বৌদ্ধ অনেক। বেদনিষ্ঠদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক কেবল মৌখিক। ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে এক জন জ্ঞানী। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে এক জন মুক্ত। কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে এক জন হরিভক্ত সুদুর্ল্লভ। ভক্তিতেই শান্তি; মুক্ত, সিদ্ধ, ফলকামী ইহারা অশান্ত। ভাগবতে এই জন্য লিখিত হইয়াছে "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে"। ভক্তিবীজকে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলসেচন দ্বারা অঙ্কুরিত করিলে তাহা হইতে যে এক লতা উৎপন্ন হয় সেই লতা বৃন্দাবনধামে হরিচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করত প্রেমফল প্রসব করে। বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তী যদি মস্তক উত্তোলন করে তবে তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবে। লোভ, পূজা, স্বর্গকামনা, মুক্তি-বাঞ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগণকে ছেদন না করিলে মূলশাখা বৃদ্ধি হয় না! মালী হইয়া এই লতা অবলম্বনপূর্ব্বক জীব প্রেমফল আস্বাদন করে। ইক্ষুরস ঘনীভূত হইলে যেমন তাহা হইতে ক্রমে মৎসণ্ডি (মিছরি) উৎপন্ন হয়, তেমনি সাধনভক্তি হইতে রতি, রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক মাধুর্য্যরসে সকল রস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উপদেশ দিয়া মহাপ্রভু রূপকে বৃন্দাবন যাইতে অনুমতি করিলেন এবং আপনি কাশীধামে চলিয়া আসিলেন!

চৈতন্য যে সময় কাশীতে চন্দ্রশেখরের ভবনে থাকেন, সেই কালে রূপের পত্র সনাতনের হস্তগত হয়। তিনি বন্দীর অবস্থায় তাহা পাইয়া কারারক্ষককে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, "দেখ মিঞা

সাহেব! আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, ইহাতে তোমার পুণ্যও হইবে, আর পাঁচ সহস্র টাকাও তুমি পাইবে। রাজা যদি তোমাকে ধরেন, তুমি বলিও যে সে বহির্দ্দেশে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দরবেশ হইয়া চলিয়া যাইব, দেশে আসিব না, সুতরাং তোমার ভয়ের বিষয় কিছু থাকিল না।” এইরূপে তাহাকে সম্মত করিয়া সাত সহস্র মুদ্রা দিয়া ভৃত্য ঈশানের সঙ্গে রজনীযোগে তিনি প্রস্থান করিলেন। ঈশানের সঙ্গে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, পথিমধ্যে পাতড় পর্ব্বতে পৌঁছিলে এক দস্যু তাহা লইবার চেষ্টায় থাকে। সনাতন ভাব গতি বুঝিয়া মুদ্রা গুলি তাহাকে দিয়া ঈশানকে বিদায় করিয়া একাকী উদাসীনবেশে বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। এক দিন রাত্রিকালে পাটনার নিকট হাজিপুরের এক উদ্যানমধ্যে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হঠাৎ তাহা শুনিতে পাইলেন। শ্রীকান্ত এক জন রাজকর্ম্মচারী, গৌড়েশ্বরের জন্য তিন লক্ষ টাকার অশ্ব ক্রয় করিবার নিমিত্ত তিনি ঐ স্থানে বাসা করিয়াছিলেন। সনাতনকে তাদৃশ হীনবেশে দর্শন করিয়া তাঁহার মন অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে মলিন বস্ত্র পরিত্যাগের জন্য বৈরাগীকে তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; সনাতন কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় শেষ তিনি এক ভোটকম্বল তাঁহাকে দিলেন। সেই কম্বল গায়ে দিয়া সনাতন বৈরাগী ক্রমে কাশীধামে গিয়া উপনীত হন। তৎকালে গৌরচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। সনাতন বহির্দ্বারে বসিয়া দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ এবং দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছেন, আর নয়নজলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্তপ্রিয় গৌরাঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া সমীপাগত হইলেন এবং প্রগাঢ় আলিঙ্গনদানে সুস্থ করত সনাতনের অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা বিলাপ, অনুশোচনা দেখিয়া চৈতন্যের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। শিষ্যবৎসল প্রেমাদ্রচিত্ত মহাপুরুষেরা আশ্রিত দুঃখীদিগের প্রতি যে প্রকার স্নেহ মমতা প্রদর্শন

করেন তাহা মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও সুমিষ্ট। মহাপ্রভুর অকৃত্রিম ভালবাসা পাইয়া সে সময় অনেক সন্তপ্তহৃদয় ব্যক্তি শোক তাপ ভবযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছিল। তদনন্তর সনাতনের কারামুক্তি ও পথভ্রমণের বিবরণ সমস্ত তিনি শুনিলেন। গৌরচন্দ্র আপনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া এইরূপে অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ধনী পণ্ডিত এবং ভদ্রসন্তানকে পথের ভিখারী করত কন্থাধারী তরুতলবাসী করেন। কিন্তু এই সকল পবিত্রচিত্ত ভাগবতগণ অবশেষে বিপুলবিভবশালী ধনী ও নরপতিগণের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করিয়া সকলের পুজিত হইয়া গিয়াছেন। শচীতনয় সনাতনকে কহিলেন, পতিতপাবন কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তিনি অপার করুণার সিন্ধু, তাঁহার অনুগ্রহেতেই তুমি পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে। সনাতন গদ্গদ্ স্বরে বলিলেন, আমি কৃষ্ণকে জানি না, তোমার কৃপাই আমার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিল। রূপ এবং অনুপম বৃন্দাবন গিয়াছেন সে সংবাদ সনাতন এই খানে প্রাপ্ত হন। অতঃপর গৌরের আদেশানুসারে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ক্ষৌরী এবং স্নান করাইয়া নূতন বসন পরিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহা না শুনিয়া এক পুরাতন ছিন্ন বসন চাহিয়া লইলেন। ভোটকম্বল খানি তখনও তাঁহার গায়ে ছিল। প্রভু বার বার সে দিকে দৃষ্টিপাত করাতে সনাতন তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিয়া এক জন বঙ্গবাসীর কাঁথার সঙ্গে তাহার বিনিময় করিলেন। এই সমস্ত ঐকান্তিক অকপট বৈরাগ্যচিহ্ন সন্দর্শনে চৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি বলিলেন, উত্তম বৈদ্য কি কখন রোগের শেষ রাখে? তিন মুদ্রার ভোট গায়ে দিয়া মধুকরী ভিক্ষা করিলে ধর্ম্মহানি হয়, লোকে উপহাস করে। যাঁহার ইচ্ছায় তোমার বিষয়ভোগ খণ্ডন হইয়াছে তিনিই ইহা দূর করিলেন। অনন্তর উভয়ের বিবিধ তত্ত্বালাপ হইতে লাগিল।

কৃষ্ণই এক মাত্র সর্ব্বোপরি আদি কারণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিস্বামী, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার এক একটী শক্তি। যোগধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড পরিহারপূর্ব্বক তাঁহাতে ভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই কৃষ্ণের সত হসত্র অবতার—কেহ অংশাবতার, কেহ ভাবাবতার, কেহ শক্ত্য-

বতার, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ শেষ অবতার। জ্ঞানের সঙ্গে যাহার ভক্তি হয় সেই সর্ব্বোত্তম ; শাস্ত্র যুক্তি অবগত নহে, অথচ ভক্তি আছে তাহাকে মধ্যম বলা যায় ; যাহার শ্রদ্ধা অতি কোমল সে কনিষ্ঠ, কিন্তু শেষোক্ত দুই জন ক্রমে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ভক্তির তারতম্যানুসারে রতির তারতম্য হয়। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ইত্যাদি বিবিধ গুণ ভক্তেতে অবস্থিতি করে। সনাতনকে প্রভু ভক্তি ও প্রেমতত্ত্বের সাধন এবং লক্ষণ আদ্যোপান্ত সমস্ত এইরূপে শিক্ষা দিয়া বলিলেন তুমি বিবিধ গ্রন্থ রচনা দ্বারা জগতে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার কর এবং বিলুপ্তপ্রায় মথুরা তীর্থকে পুনরুদ্ধার করিয়া লও। শুষ্ক বৈরাগ্যবিষয়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। সনাতন বলিলেন আমি নীচ জাতি, চিরদিন বিষয়ভোগে কাল ক্ষয় করিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করুন যে, যাহা শিক্ষা করিলাম তাহা যেন ভুলিয়া না যাই, এবং এ সকল যেন আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়। তদনন্তর আরও নিবেদন করিলেন, সার্ব্বভৌমের নিকট আপনি যে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমি শুনিতে অভিলাষ করি। গৌর বলিলেন, তখন কি প্রলাপ বলিয়াছি, আমি বাতুল মানুষ, সার্ব্বভৌম আবার তাহা সত্য মনে করিয়াছেন, সে কথা কি এখন আর মনে আছে? তবে তোমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্গগুণে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, নতুবা সহজে আমার অর্থ বোধগম্য হয় না। এই বলিয়া শেষে এমনি তাঁহার উৎসাহ বাড়িয়া গেল যে, উক্ত শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। কিরূপে বৈষ্ণবস্মৃতি লিখিতে হইবে তাহাও সনাতনকে বলিয়া দিলেন। দুই মাস কাল তিনি ক্রমাগত তাঁহাকে ভক্তি শিক্ষা দেন। পরে কাশীর দণ্ডীদিগকে বিচারে এবং ভক্তিপ্রভাবে পরাস্ত করিয়া নীলাদ্রি প্রস্থান করেন। গমনকালে সনাতনকে বলিয়া গেলেন, তুমি বৃন্দাবনে যাও সেখানে তোমার ভ্রাতৃদ্বয় আছেন তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া দেখা কর। কন্থা গেরুয়াধারী আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ

তথায় গেলে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও। কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তোমাকে শুভবুদ্ধি প্রদান করিবেন।

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন রূপ অন্য পথ দিয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ কাশীযাত্রা করিয়াছেন। সুবুদ্ধি রায় নামক এক ব্যক্তি এখানে থাকিতেন, তিনি সনাতনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, এই সুবুদ্ধি রায় এক সময় গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, সৈয়দ্ হুসেন খাঁ ইহাঁর কর্ম্মচারী ছিল। এক দীর্ঘিখননকার্য্যে ব্রতী হইয়া কিছু দোষ করাতে হুসেন সুবুদ্ধিকর্ত্তৃক কশাঘাত প্রাপ্ত হন। পরে সৈয়দ্ হুসেন স্বয়ং রাজা হইল এবং রাজা হইয়াও কিছু দিন পর্য্যন্ত পুরাতন প্রভুর প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হয় নাই। সেই কশাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া এক দিন সে বলিল, তুমি সুবুদ্ধির প্রাণদণ্ড কর। হুসেন কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে সে নারী বলিল তবে উহার জাতি মারিয়া দাও, অন্যথা আমি প্রাণত্যাগ করিব। শেষ স্ত্রীর অনুরোধে হুসেন সুবুদ্ধির মুখে জল ছিটাইয়া দিলেন। সুতরাং জাতিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুবুদ্ধিকে বারাণসী আসিতে হইল। তথায় পণ্ডিত-দিগের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন, তোমাকে তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, অতি গুরুতর পাপ তোমার ঘটিয়াছে। সুবুদ্ধি স্বীয় নামের গুণে তাহা না করিয়া চৈতন্যের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন কর; এক নামে পাপ ক্ষয় হইবে, দ্বিতীয় নামে কৃষ্ণপদ লাভ করিবে, তৃতীয় নামে তাঁহার সহবাসে স্থান পাইবে, ইহাই মহা-পাপের প্রায়চিত্তবিধি। অনন্তর সুবুদ্ধি অযোধ্যা নৈমিষারণ্য পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া প্রতি দিন ছয় পয়সার কাষ্ঠ বিক্রয় করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ শুষ্ক চণক চর্ব্বণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, বাকি মুদির দোকানে গচ্ছিত রাখিয়া তদ্দ্বারা দুঃখী বৈষ্ণবগণের সেবা করিতেন, এবং বাঙ্গালী পাইলে তাহাকে দধি ভাত খাওয়াইয়া তৈল মাখাইতেন। কিছু দিবস পরে ইহাঁর সঙ্গে

শ্রীরূপের মিলন হয়। তার পরে তিনি সনাতনকে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। সনাতন পরম বৈরাগী, সুবুদ্ধির স্নেহ মমতা ছিন্ন করিয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন; প্রতি দিন এক এক বৃক্ষতলে এবং নব নব কুঞ্জে অবস্থান করিতেন। "মথুরা মাহাত্ম্যগ্রন্থ" সংগ্রহ করিয়া প্রথমে সেই লুপ্ত তীর্থ তিনিই প্রকাশিত করেন।

এ দিকে শ্রীরূপ অনুপম দুই ভাই বারাণসীতে সনাতনকে না পাইয়া দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৃন্দাবনলীলা নাটক লিখিতে লাগিলেন। শেষাবস্থায় উভয়ে একত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন। বনে বনে ভ্রমণ, নিত্য নূতন বৃক্ষমূলে শয়ন, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, আর গ্রন্থপ্রণয়ন এই মাত্র ইহাঁদের কার্য্য ছিল। শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য জীবগোস্বামী এই সঙ্গে থাকিয়া ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভাদি বহু বিধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁরা ভক্তির সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সকল যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া তদ্বিষয়ে বিজ্ঞান শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তিন জনেরই বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রূপ, সনাতন, ও জীব গোস্বামীকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদব্যাস স্বরূপ বলা যাইতে পারে। গৌর প্রচারিত ভক্তিবিধানের উচ্চগৃহের যে কয়েকটি প্রধান স্তম্ভ ছিল তন্মধ্যে ইহাঁরা তিন জনই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণের মধ্যে ইহাঁরা ভক্তিতত্ত্বের বিদ্যাতে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী রঘুনাথ ভট্ট পরে এই সঙ্গে মিলিত হন। এই রূপ শুনা গিয়াছে যে, বৃন্দাবনে অবস্থান কালে সনাতন একটি মূল্যবান্ রত্ন প্রাপ্ত হন এবং মানকরবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাহা দান করেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্যভাব দর্শনে শেষে আপনিও বৈরাগী হইয়া যায়। একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ ও সনাতনকে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন, তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হইয়া পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। তৎপরে দিগ্বিজয়ী সেই পত্র জীবকে স্বাক্ষর করিতে বলায় তিনি গুরুর অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, আমি বিচার করিব। বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাভূত হইলেন। এ কথা রূপ শুনিয়া জীবকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছি-

লেন, তুমি জয় পরাজয়, মান অপমান ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছ, জয়াভিলাষী সেই পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া, আপনি অমানী হইয়া কেন তাহাকে দীনতার সহিত মান দান করিলে না? জীব নিরভিমানী, কেবল গুরুনিন্দা সহিতে না পারিয়া পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করিয়াছেন, ইহা জানিয়াও রূপ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য বলিলেন, অদ্য হইতে আমি তোমার মুখাবলোকন করিব না। তাহা শুনিয়া জীবের অঙ্গ কম্পিত হইল, অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিছু-তেই কিছু হইল না, শেষ যমুনাতটে এক গোফার মধ্যে তিনি বহুকষ্ট-সাধ্য তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। গুরুবিরহশোকে এবং কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া গেল। সনাতন জীবের এ প্রকার কষ্ট আর দেখিতে না পারিয়া এক দিন রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদাচা-রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? রূপ বলিলেন, জীবে দয়া। সনাতন বলিলেন তবে তাহা হয় না কেন? তখন রূপ তাঁহার কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়া জীবকে স্নেহ সহকারে পুনর্গ্রহণ করেন। সে সময় আকবর পাতসা আগরায় থাকিতেন, তিনি রূপ সনাতনের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তাঁহা-দিগকে দেখিতে আসেন। সাধুদিগের কিছু উপকার করিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যখন সেই তেজস্বী নিঃসঙ্গ প্রেমিক বৈরাগীদিগের অসাধারণ মহত্ত্ব তিনি বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহার সকল অভিমান দূর হইয়া গেল। বিদ্যা, পদ ও ধনেতে গৌরবান্বিত হইয়া কিরূপে নিরভিমানী, নির্লোভী, প্রেমিক এবং বৈরাগী হইতে হয়, রূপ সনা-তন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই সকল দেবতুল্য মহাত্মাগণই শ্রীকৃ-ষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য রস আস্বাদন ও বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, কি পবিত্রতম মধুর ভাবেই তাঁহারা এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইহার গভীরার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুখী হইতেন।

বৃন্দাবন হইতে কোন যাত্রী আসিলে গৌর অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার রূপ সনাতন কেমন আছেন, কিরূপে তাঁহাদের দিন গত হয়? তাহারা বলিত, নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারা দুই জন তরু-তলে শয়ন করেন, ভিক্ষালব্ধ শুষ্ক রুটী ও চণক ভক্ষণ করেন, ছিন্ন

বহির্ব্বাস, কন্থা এবং করোয়া মাত্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, অষ্ট প্রহরের মধ্যে চারি দণ্ড কাল নিদ্রা যান, অবশিষ্ট সময় নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তি-শাস্ত্রপ্রণয়ন, আর তোমার বিষয়ে চিন্তা এবং আলাপ ইহাই তাঁহা-দের কার্য্য। এ সকল কথা শুনিয়া চৈতন্যর হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিত। পশ্চিমাঞ্চলে রূপসনাতনই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন।

কাশীধামে দণ্ডীদিগের সঙ্গে বিচার।

কাশীতীর্থ কালেতে যেমন পুরাতন, পাপ অধর্ম্মেতেও তেমনি পরিপূর্ণ। ধর্ম্মের নামে এত আড়ম্বরও আর কোথাও দেখা যায় না, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এত ভ্রষ্টাচার দুর্ব্যবহারও আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। সেখানে দলে দলে দণ্ডী সন্ন্যাসী পরমহংস সকল ভ্রমণ করে, মায়াবাদ মতানুসারে তাহারা পার্থিব পদার্থ সমস্তকে মিথ্যা বলে, অথচ কার্য্যে তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করে। ফলতঃ কাশী অতি নীরস স্থান, তথায় ভক্তির নাম গন্ধ নাই, কেবল জ্ঞানকাণ্ড আর অসার কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরে মত্ত হইয়া লোকসকল ধর্ম্মাভিমান প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ সকল লোকের রীতি প্রকৃতি চৈতন্য পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, এই জন্য তিনি কোন স্থানে নিমন্ত্রণ লইতেন না, অল্প যে কয়েক জন বৈষ্ণবকে পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে লইয়া গোপনে অবস্থিতি করিতেন, আর সনাতনকে ভক্তি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটি তাঁহার প্রতি বড় অনুরক্ত ছিল। দণ্ডী সন্ন্যাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে একবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহারা চৈতন্যের মহত্ত্ব কিছু বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এবং কাশীর সমস্ত দণ্ডীকে নিজালয়ে এক দিন নিমন্ত্রণ করিল। বিপ্রের আগ্রহ দেখিয়া নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করত গৌরাঙ্গ যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক অতি দীনভাবে সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। প্রকাশানন্দ স্বামীও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গৌরের তপ্তকাঞ্চনতুল্য তেজোময় রূপ-লাবণ্য অবলোকন করত সচকিত ভাবে সসম্ভ্রমে সকলের সহিত তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বলিলেন শ্রীপাদ! অপবিত্র স্থানে কেন, এই দিকে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করুন। চৈতন্য কহিলেন, আমি

হীন সম্প্রদায়ের লোক, সকলের মধ্যে উপবেশন করা আমার ভাল দেখায় না। তাঁহার সেই উজ্জ্বল মুখ কান্তি দর্শন এবং বিনীত মধুর বচন শ্রবণ করিয়া দণ্ডিগণের চিত্ত অলৌকিক ভাবরসে বিগলিত হইয়া গেল। প্রকাশানন্দ স্বামী হাত ধরিয়া তাঁহাকে সভার মধ্যস্থলে বসাইলেন এবং সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেশব ভারতীর শিষ্য হইয়া কেন আমাদের সঙ্গে দেখা কর না? সন্ন্যাসী হইয়া ভাবুকদিগের সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন কর, কিন্তু বেদান্ত পাঠ এবং ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া ভাবুকের মত তুমি কেন থাক? সাক্ষাৎ নারায়ণের ন্যায় তোমার প্রভা দেখিতেছি, এরূপ হীনাচার উচিত হয় না।

চৈতন্য বলিলেন, শ্রীপাদ! আমার গুরু আমাকে মূর্খ জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি কেবল কৃষ্ণনাম জপ কর, কলিতে নামই সার ধন। অতঃপর তিনি আমাকে বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই শ্লোক শিক্ষা দেন ;—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" ॥ এই নামে আমার মন পাগল হইয়া গেল, বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তদনন্তর আমি গুরুকে এই কথা জানাইলাম যে হরিনামে আমাকে হাসায় কাঁদায় নাচায় এ কি হইল? গুরুদেব বলিলেন, হরিনামের এইরূপই স্বভাব, তোমাতে প্রেমোদয় হইয়াছে ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, আমিও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে তুমি ভক্তসঙ্গে এই নাম কীর্ত্তন করিয়া জীব উদ্ধার কর। এই বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক তিনি শিক্ষা দিলেনঃ—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ, হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।" "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।" (ভাগবত একাদশ স্কন্ধ)।

গৌরসুন্দরের শ্রীমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনাবলী শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার কোমল ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া সন্ন্যাসিগণ বলিয়া উঠিল,

যাহা কিছু তুমি ব্যক্ত করিলে সকলই সত্য, তোমার বচনে আমাদের প্রাণ শীতল হইল, অদ্য আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম, কৃষ্ণভক্তি সকলেরই আদরের ধন, কিন্তু বেদান্তশ্রবণে দোষ কি? চৈতন্য বলিলেন, তোমরা দুঃখিত হইও না, বেদসূত্রের মুখ্যার্থ ভাষ্যকারদিগের গৌণার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তাঁহার বিভূতি সমস্তই চিদাকার। তাঁহার দেহ, স্থান, পরিবার সকলই চিন্ময়; এই চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার বলা অথবা তাঁহার রূপকে প্রাকৃত কলেবররূপে ব্যাখ্যা করা, ইহার তুল্য বিষ্ণুনিন্দা আর কি হইতে পারে? "বেদের সূত্রার্থ সম্প্রদায়ের অনুরোধে কল্পিত অর্থ দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে ইহা সত্য, এক্ষণে মুখ্যার্থ কি তাহা শুনিতে অভিলাষ করি" সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে চৈতন্য পুনরায় বলিলেন, ব্রহ্ম অর্থে বৃহদ্বস্তু তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তাঁহাকে সত্তামাত্র নির্ব্বিশেষ বলিলে চিচ্ছক্তি স্বীকার করা হয় না। সেই বেদপ্রতিপাদিত কৃষ্ণকে ভক্তি ও নামসাধনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার চরণে ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম মহাধন তাহার মাধুর্য্য রস আস্বাদন করা যাইতে পারে। তখন পণ্ডিতমণ্ডলী চৈতন্য প্রভুর এই সমুদায় সুধাময় বচন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনি সাক্ষাৎ বেদময়মূর্ত্তি, আমরা যে আপনাকে নিন্দা করিয়াছি আমাদের সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অনন্তর তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক বসাইয়া সকলে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করাইলেন।

কাশীর দণ্ডী ও শাস্ত্রীদিগের মধ্যে কয়েক দিন এই বিষয়ে মহা আন্দোলন চলিয়াছিল। চৈতন্যের ব্যাখ্যা সার এবং তাহাই হৃদয়গ্রাহী, অনেকে এই কথা বলিয়া কেহ কেহ ভক্তিরসের আস্বাদন পাইল। অন্য এক দিন গৌরচন্দ্র প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া সনাতন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সঙ্গে নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া কাশীবাসী লোকদিগের চিত্ত একবারে দ্রবীভূত হইয়া যায়। প্রকাশানন্দ বলিলেন, ভাষ্যকার অদ্বৈত মত সংস্থাপনের জন্য অন্যরূপে অর্থ করিয়াছেন এই

জন্য তিনি ভগবত্তা স্বীকার করেন নাই। নানা জনের নানা মত,—মীমাংসক বলেন ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ, সাঙ্খ্যের মতে প্রকৃতি কারণ, নৈয়ায়িক বলেন পরমাণু হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, মায়াবাদীর ব্রহ্ম নির্গুণ, পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরই স্বয়ং গুরু; পরম কারণ ঈশ্বরকে না মানিয়া সকলে অন্যের মত খণ্ডন করত আপনাদের মত স্থাপন করে, অতএব "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" প্রেমরসে মগ্ন গৌরকে দেখিয়া শেষে প্রকাশানন্দ স্বামীও শিষ্যগণের সহিত হরি হরি বলিতে লাগিলেন। শচীনন্দন তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন, তিনিও গৌরের চরণ ধরিলেন, এবং ক্ষমা চাহিলেন। এইরূপে মরুভূমি তুল্য কাশীধাম ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইল। স্বামীজী বিষ্ণুর সঙ্গে সমান করিয়া চৈতন্যকে প্রশংসা করাতে তিনি কুণ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক বলিলেন, আমি হীন জীব, আপনাকে যে জীব বিষ্ণু করিয়া মানে সে পাষণ্ড সদৃশ। প্রকাশানন্দ বলিলেন, মায়াবাদের দোষ ও ব্যাসসূত্রের কল্পিত ব্যাখ্যার কথা তুমি যাহা ঘোষণা করিলে তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ হইল, এক্ষণে সূত্রের যথার্থ অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দাও। স্বামী অনুরোধ করাতে গৌরচন্দ্র বলিলেন, "ব্যাস নিজে বুঝাইলেও তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। বেদোপনিষদের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, ইহা দ্বারা সূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে। সূর্য্যকে যেমন সূর্য্য ভিন্ন অন্যালোক দ্বারা দেখা যায় না, তেমনি ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না। কৃষ্ণই বেদসূত্র এবং তিনিই ভাষ্য ভাগবত, সূত্র ভাষ্য উভয়ই স্বয়ং ভগবান্"। দেবাদিদেব ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার প্রদত্ত দিব্যজ্ঞানালোক ব্যতীত কোন গুরু বা গ্রন্থ দ্বারা তাহা কেহ বুঝিতে সক্ষম হয় না, ঈশ্বরের শাস্ত্র ঈশ্বর স্বয়ং বুঝাইয়া না দিলে কোন সত্য কেহ কাহাকে বুঝাইতে পারে না, এই জন্যই দৈববাণী এবং মহাজনবাক্য ধর্ম্ম ও উচ্চনীতির শেষ মীমাংসার স্থল হইয়া আছে। দৈববাণী অল্প লোকেই শুনিতে পায়, অবশিষ্ট মুমুক্ষু জীবগণ নিঃসন্দেহচিত্তে সাধু ভক্ত সিদ্ধ পুরুষদিগের প্রচারিত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া চলে এবং সেই ঐকান্তিক নির্ভর হইতে তাহারা ক্রমে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ জ্ঞানিগণ দৈববাণীশ্রবণেও

বধির, অহঙ্কার বশতঃ ভক্তের কথাও তাহারা গ্রাহ্য করে না, সুতরাং তাহাদিগকে দুই কূল হারাইয়া তর্কপরায়ণ অধিকাংশের মতসমষ্টির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পরিণামে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। শাস্ত্রব্যাখ্যাসম্বন্ধে প্রভু যে বলিয়াছেন, "সূর্য্যালোক ভিন্ন অন্যালোকে সূর্য্য নয়ন গোচর হয় না" ইহা অতি সারবান্ কথা। ভগবদ্দর্শনের পন্থাও এইরূপ। তাঁহার কথা হয় তিনি স্বয়ং বলিলেন, না হয় বিশ্বাসী পবিত্রাত্মা ভক্ত দ্বারা তিনি বলাইবেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যাহারা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মাভিমানী। অনন্তর ভাগবত গ্রন্থের বহুল জ্ঞানগর্ভ এবং ভক্তিরসাত্মক বচন প্রমাণ দ্বারা হরিভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি সকলের হৃদয় অধিকার করিলেন। শেষে এমনি হইল যে তাঁহাকে দেখিলেই যেখানে সেখানে লোকে হরিধ্বনি করিত। বিশ্বেশ্বর দর্শনে কিম্বা গঙ্গাস্নানে যেখানে তিনি গমন করেন, সর্ব্বত্রই লোকের ভয়ানক জনতা হইতে লাগিল। এইরূপে মায়াবাদাচ্ছন্ন কাশীধামে হরিভক্তির জয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়া চৈতন্য গোসাঞী পুনরায় নীলাদ্রি প্রস্থান করেন। রজনীযোগে বহির্গত হইয়া চলিলেন, তপন মিশ্র প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। প্রভু বলিলেন, আমি ঝারিখণ্ডপথে একাকী যাইব, যদি কাহারো ইচ্ছা হয় পরে আসিতে পার। তদনন্তর বিদায় হইয়া সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া তিনি সেই অরণ্যময় পথে নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন।

নীলাচলে প্রভুর শেষাবস্থান।

তীর্থপর্য্যটনোপলক্ষে ভারতের নানা স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনানন্তর হরিনামবিতরণ ও প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া ভক্তবর শ্রীচৈতন্য পুনরায় নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার পরে ছয় বৎসর কাল তাঁহার পর্য্যটনে অতিবাহিত হয়, পরিশেষে আঠার বৎসর কাল একাদিক্রমে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেন। সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ বৎসর তিনি ইহলোকে জীবিত ছিলেন। এই আঠার বৎসরের মধ্যে যে সকল মনোহর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তদ্বিবরণবর্ণনে এক্ষণে আমি প্রবৃত্ত হইলাম।

পুরীক্ষেত্রে গৌরের পুনরাগমন প্রত্যাশায় ভক্তবৃন্দ নিরন্তর আশাপথ চাহিয়া আছেন এমন সময় তিনি বৃন্দাবন, বারাণসী, প্রয়াগ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য সাধুমণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত হইলেন। ভক্তসমাজে আনন্দকোলাহল উঠিল, পুনরায় প্রেমভক্তির হিল্লোলে সকলের হৃদয়সিন্ধু উদ্বেলিত হইল। কাশীশ্বর মিশ্রের ভবনে তাঁহার চিরবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। অবশিষ্ট জীবন সেই খানেই তিনি কাটাইয়া গিয়াছেন। তীর্থের বৃত্তান্ত গৌরচন্দ্র নিজমুখে বর্ণন করিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিলেন। প্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এ সংবাদ গৌড়দেশেও প্রেরিত হইল। তথাকার ভক্তবৃন্দ ইহা শ্রবণে উৎসাহী হইয়া পথের সজ্জা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে প্রতি বৎসর দলে দলে এ দেশের বৈষ্ণবগণ শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেন। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্র প্রায় দশ বার দিবসের পথ, এই সুদীর্ঘ দুর্গম পথে প্রতি বৎসর ইহাঁরা গতায়াত করিতেন। ইহাদ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন কেমন তাঁহাদের অটল উৎসাহ ছিল। এমন শুভ দিন শুভ সংযোগ পৃথিবীতে কদাচিৎ হয়। দেবাত্মা মহাপুরুষের সহিত সাধু

ভক্তের সম্মিলন যে কি গুরুতর ব্যাপার তৎকালকার ভগবদ্ভক্তজনেরা তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাদের মনে আমোদ উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত। গৌরের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া বর্ষে বর্ষে তথায় যাইতেন, কেবল প্রচারকার্য্যে বিব্রত থাকায় নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত সকল বৎসর যাইতে পারিতেন না। আমি যে সেই প্রভুর সঙ্গে পুরীতে গিয়াছিলাম আর দেশে আসি নাই, বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ দেশেই ছিলাম। কাঁচড়াপাড়াবাসী শিবানন্দ সেন গৌরভক্তগণের পথদর্শক ছিলেন, সকলকে যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে তথায় লইয়া যাওয়া তাঁহার একটি আনন্দজনক কার্য্য ছিল। রথোৎসবের সময়ে গিয়া চারি মাস কাল তাঁহারা পুরীতে গুরুসহবাসে থাকিতেন, বহুবিধ লীলা করিতেন, এই হেতু বন্ধুবিচ্ছেদের জন্য কাহাকেও আর অসুখ অনুভব করিতে হইত না। এই চারি মাস কাল ক্রমাগত আমোদে আহ্লাদে আনন্দ উৎসবে কাটিয়া যাইত। কতকগুলি উন্নতচিত্ত সাধু এবং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী গৌরের সঙ্গে এই খানে প্রায় বার মাস থাকিতেন। ব্রহ্মচারী দণ্ডী হইয়াও মায়াবাদ জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শেষে তাঁহারা ভক্তিরস পানে প্রমত্ত হন।

রূপের শ্রীক্ষেত্র দর্শন।

রূপ গোস্বামী কাশীধামে সনাতনের দেখা না পাইয়া বিষয় সম্পত্তি যথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য স্বদেশে গিয়া কিছু দিন ছিলেন, তদনন্তর কনিষ্ঠ অনুপমের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনানন্তর তিনিও নীলাদ্রি গমন করেন। হরিদাস যথায় থাকিতেন রূপ তথায় আসিয়া রহিলেন। তাঁহার মন ইদানীং বৃন্দাবনলীলা ইত্যাদি বিষয়ে নাটক রচনার জন্য সর্ব্বদা মগ্ন থাকিত। এখানে তিনি পৌঁছিলে গৌর আহ্লাদের সহিত আর আর সকলের সঙ্গে রূপগোস্বামীর পরিচয় করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ তথায় উপস্থিত হন। রূপ তাঁহাদের সঙ্গে একত্র চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। এক দিন মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরপ্রাঙ্গণে বসিয়া তাঁহার রচিত নূতন নাটক শ্রবণ

করেন। অতি দীনহীন মলিন বেশ, বিনয়ে সর্ব্বদা অবনত, লজ্জায় আর তিনি পড়িতে পারেন না, তথাপি গুরুর আদেশে নিজের রচনা সকল কিছু কিছু ভক্তদিগকে শুনাইলেন। বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের এই শ্লোকটি প্রথমে পাঠ করা হইল। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং। চেতঃ-প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং, নোজানে জনিতা কিয়-দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী"। "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় কত পরিমাণ অমৃতে যে রচিত হইয়াছে তাহা জানি না। ইহা যখন রসনায় নৃত্য করে তখন আরো বহু রসনা লাভের জন্য রতি উৎপাদন করে, এবং যখন কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় তখন অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা জন্মে, আবার চিত্তপ্রাঙ্গণে মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বলাধান করে। কৃষ্ণনামের সুম-ধুর মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং এই শ্লোকের কবিত্বরস আস্বাদন করিয়া রামা-নন্দ, সার্ব্বভৌম, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরে রামানন্দ তাঁহাকে ভক্তিরসের বিবিধ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। জ্ঞান, ভক্তি বৈরাগ্য, কবিত্ব এই চারিটি রূপেতে একত্র সন্নিবেশিত ছিল, তজ্জন্য গৌর বড় সুখ ও গৌরব অনুভব করিতেন। প্রধান ভক্তদিগের নিকট রূপের এই সকল গুণের কথা বলিতে তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ হইত। তদনন্তর রূপ গোস্বামী অল্প দিনের মধ্যে তত্রত্য সাধুগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠেন। কোন্ রসের কিরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, সমস্ত তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। চৈতন্যের অনুরোধে সর্ব্ব ভক্তগণ আরো অধিকতর প্রসন্ন হইয়া রূপকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রূপ সনাতনের চমৎকার বিবরণ পূর্ব্বেই শুনা গিয়াছিল, এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া অতীব আন-ন্দিত হইলাম। চারি মাস পরে গৌরের ভক্তগণ স্বদেশে প্রস্থান করিলে, রূপ গোস্বামী তাহার পর আর কিছু দিন থাকিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। বিদায়কালে চৈতন্য বলিয়া দিলেন, ব্রজপুরবাসী হইয়া রসশাস্ত্র প্রচার কর, সনাতনকে একবার পাঠাইয়া দিও, আমিও সেখানে আর একবার যাইব।

ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন।

ভগবান্ আচার্য্য নামক একজন সাধু চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি এক দিন গুরুদেবকে নিজ আশ্রমে ভোজন করাইবার জন্য গায়ক ছোট হরিদাসকে বলেন, শিখি মাহিতির ভগ্নী মাধবীদেবীর নিকট উৎকৃষ্ট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আন। মাধবী তপস্বিনী প্রাচীনা বৈষ্ণবী, তথাপি এই কথা শুনিয়া চৈতন্য আর হরিদাসের মুখ দেখিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভৃত্য গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন, ছোট হরিদাসকে পুনরায় আমার আশ্রমে আসিতে দিবে না। দামোদর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, বৈরাগী হইয়া সে প্রকৃতি (স্ত্রীলোক) সম্ভাষণ করে। দুর্দ্দার ইন্দ্রিয়বিষয়ের নিকট গমন করিলে মুনিদিগেরও চিত্ত বিচলিত হয়। ক্ষুদ্র জীবসকল মর্কটবৈরাগ্য করিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থে রত থাকে। এই সকল হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণে পারিষদ্‌গণ নির্ব্বাক্ হইলেন। পুনরায় আর এক দিন সকলে মিলিয়া হরিদাসের জন্য অনেক অনুরোধ করত তাহার এই সামান্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। চৈতন্য কহিলেন, আমারই মন আমার বশীভূত নহে, বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি স্পর্শ এবং সম্ভাষণ কি উচিত? যাও তোমরা আপনার কার্য্যে চলিয়া যাও? পুনরায় এরূপ যদি বল তবে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। তখন কর্ণে হস্ত দিয়া ভয়ে সকলে দূরে প্রস্থান করিলেন। পরমানন্দপুরী এ জন্য আর একবার অনুরোধ করেন, তাহাতে গৌর মহা বিরক্ত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, চল আমার সঙ্গে, এখানে আর আমার থাকা হইল না, আলালনাথে গিয়া আমি একাকী বাস করিব। মহা বিভ্রাট্ দেখিয়া তখন সকলে মিলে অনেক অনুনয় বিনয় করেন, তবে প্রভুর চিত্ত স্থির হয়। সে গৌরাঙ্গ এখন থাকিলে বর্ত্তমান নিকৃষ্ট বৈরাগীদল তাঁহাকে হয়ত প্রহার করিত। কি উচ্চ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার তাঁহার সময়ে ছিল, আর এক্ষণে কি হইয়াছে। হরিদাসকে যে তিনি সামান্য লঘু পাপে এরূপ গুরু দণ্ড দিলেন তাহা আমি মনে করিতে পারি নাই, অন্তর্দ্দৃষ্টিতে তাহার ভিতরে অবশ্য

তিনি আরও কিছু দেখিয়া থাকিবেন। পবিত্রাত্মা ভক্তদিগের স্বভাবে লোকচরিত্র পরীক্ষা করিবার এক প্রকার কষ্টি পাথর থাকে, অপবিত্র দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির জীবন তদ্দ্বারা সহজে পরীক্ষিত হয়। তাঁহারা পুণ্যসংস্কারগুণে পাপের দুর্গন্ধ বুঝিতে পারেন, গূঢ় কলঙ্কের দাগ তাঁহাদের বিবেক দর্পণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, যোগবলে তাঁহারা পাপ পুণ্যের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। গৌরাঙ্গ স্ত্রীলোকসম্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষার এই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন। পরে সেই হরিদাস অনুতাপে দগ্ধ হইয়া প্রয়াগের ত্রিবেণীর জলে প্রাণত্যাগ করে। নবদ্বীপের কোন বৈরাগী তথা হইতে গিয়া শ্রীবাসকে প্রথমে এই সংবাদ দেয়, পরে তাঁহার মুখে চৈতন্য সে কথা শ্রবণ করেন। শ্রীবাস পুরীতে আসিয়া হরিদাসের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বলিয়াছিলেন, " স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্ "।

প্রভুর প্রতি দামোদরের ভর্ৎসনা।

একটি পিতৃহীন উড়িয়া ব্রাহ্মণবালক চৈতন্যের নিকট সদা সর্ব্বদা আসিয়া প্রণাম করিত এবং কথা বার্ত্তা কহিত। সুকুমারমতি সুন্দর বালকের মৃদু ব্যবহার দেখিয়া তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরক্ত সন্ন্যাসী স্পষ্টবাদী দামোদরের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িল। নিষেধ করেন তত্রাপি সে মানে না; বালক-স্বভাব যেখানে প্রীতি পায় সেইখানে যায়, তাঁহার নিষেধ কার্য্যকর হইল না। শেষে দামোদর আর থাকিতে না পারিয়া এক দিন বলিয়া ফেলিলেন, " এইবার তুমি কেমন গোঁসাঞী তাহা পুরুষোত্তমের সকলে জানিবে গোস্বামীর গুণ এবার বাহির হইবে! " চৈতন্য বলিলেন দামোদর তুমি কি বলিতেছ? তিনি বলিলেন, কি আর বলিব? তুমি আপনার ইচ্ছামত চলিবে, কাহারো কথাত শুনিবে না। অন্যের মুখ বন্ধ করিতে পার, কিন্তু পণ্ডিত হইয়া ইহা বিচার কর না যে বিধবার সন্তানের প্রতি এত দূর স্নেহপ্রদর্শন উচিত কি না? যদিও সে বিধবা সতী এবং তপস্বিনী, কিন্তু তথাপি তাহার সৌন্দর্য্য এবং যৌবন দোষের কারণ হইয়াছে, এবং তুমিও এক জন পরম সুন্দর যুবা পুরুষ বট। লোক-

কাণাকাণির অবসর তুমি কেন দিতেছ ?" এই বলিয়া দামোদর মৌনাবলম্বন করিলেন। গৌরসুন্দর হাসিয়া কহিলেন, তুমি নবদ্বীপে যাও, তথায় গিয়া জননীর রক্ষক হইয়া থাক। তুমি নিরপেক্ষ হইয়া আমাকেও সাবধান করিয়া দিলে, এরূপ না হইলে ধর্ম্ম থাকে না, যাহা আমার দ্বারা হয় না, তাহা তোমা হইতে হয়, অতএব তুমি মাতৃ সন্নিধানে গমন কর। অনন্তর স্বরূপ দামোদর কিছু দিনের জন্য চৈতন্যের গৃহের অভিভাবক হইয়া নবদ্বীপে বাস করেন।

নাম মাহাত্ম্য কথন।

হরিদাসের নির্জ্জন কুটীরে গৌর প্রায়ই গতায়াত করিতেন। নামমাহাত্ম্যসম্বন্ধে এই যবন ভক্তের কথা বড় প্রামাণ্য ছিল। তাঁহার সমস্ত জীবনটি যেন নামময়। এক দিন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, কলিকালে এই যে সকল অসংখ্য যবন, যাহারা গো ব্রাহ্মণ বধ করে, ইহাদের কিরূপে নিস্তার হইবে তাই ভাবিয়া আমি বড় দুঃখিত হইতেছি। তিনি বলিলেন, সে জন্য তুমি চিন্তা করিও না, তাহারা "হারাম" "হারাম" বলিয়া মুক্ত হইবে। অজামিল নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিয়া তরিয়া গিয়াছে, নামের এমনি গুণ। আচ্ছা তবে পৃথিবীতে যে বহুল স্থাবর জঙ্গম আছে ইহাদের দশা কি হইবে ? তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ তাহার ধ্বনিতে তাহারা উদ্ধার হইয়া যাইবে। স্থাবরে যে হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়াছ, তাহা প্রতিধ্বনি নহে, তাহারাও কীর্ত্তন করিয়াছে। পুনরায় গৌর বলিলেন, সমস্ত জীব যদি মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহা হইলেত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই রহিল না, সব শূন্য হইয়া গেল ? হরিদাস বলিলেন, আবার সূক্ষ্ম জীব উৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমের সহিত জগৎকে পরিপূর্ণ করিবে। হরিদাসের কথায় গৌরাঙ্গ প্রীত হইয়া ভক্তমণ্ডলীমধ্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেমন সরল বিশ্বাস ! জীবসাধারণের মুক্তির জন্য কি চমৎকার আগ্রহ ! গৌরের এই সকল প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার কি সুকোমল ভাব, কি মধুর অমায়িকতাই প্রকাশ পাইতেছে।

সনাতনের নীলাদ্রি দর্শন।

সনাতন গোস্বামী কিছু কাল বৃন্দাবনে অবস্থানানন্তর ঝারিখণ্ডের বনপথ ধরিয়া নীলাচলে উপস্থিত হন। একে কঠোর বৈরাগ্যের পেষণে তাঁহার শরীর নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার অনাহার অনিদ্রা, পথভ্রমণ এবং ঝারিখণ্ডের অস্বাস্থ্যকর জলপান, নানা কারণে সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে শোণিত ও রস নিঃস্থত হইতে লাগিল; তখন তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ভগ্নদেহ হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাধির জন্য বৈরাগীর মনে অত্যন্ত গ্লানি ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, একে আমি নীচ জাতি, তাহাতে জগন্নাথের মন্দিরের নিকট প্রভুর বাসা, সেখানে জগন্নাথের পরিচারকগণের অঙ্গস্পর্শ করিলে আরও আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবে, অতএব রথের অগ্রে গৌর যখন নৃত্য করিবেন সেই সময় তাঁহার সম্মুখে রথচক্রে আমি প্রাণত্যাগ করিব। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সনাতন হরিদাসের আশ্রমে গিয়া অতিথি হইয়া রহিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপে পরমানন্দলাভ হইল, কতক্ষণে গৌরকে দেখিবেন কেবল এই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে মহাপ্রভু তথায় আসিয়া দর্শন দিলেন। সনাতনকে দেখিবা মাত্র তিনি মহা হরষিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। গৌর কোল দিবার জন্য যত অগ্রসর হন, সনাতন তত পাছে হাঁটেন, শেষ নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, দোহাই প্রভু! আমাকে স্পর্শ করিবেন না! স্পর্শ করিবেন না! একে আমি নীচ তাহাতে সর্ব্ব গাত্র কণ্ডুরসে অপবিত্র, অতএব রক্ষা করুন! যে গৌরপ্রেম গলিতকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে তাহা কি আপনার প্রাণতুল্য শিষ্যের গাত্রকণ্ডু দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইবে? অনন্তর বল পূর্ব্বক তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন দান করিলেন। এই স্থানে আসিয়া সনাতন আপনার কনিষ্ঠ অনুপমের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা আলোচনা করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ শোক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

চৈতন্য গোসাঞী দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে সনাতনের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তবে কোটি দেহ নিমেষের মধ্যে ত্যাগ করিতেই বা ক্ষতি কি? তাহাতে কিছু হয় না, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় ভক্তি আর ভজন। দেহনাশ তমোগুণের লক্ষণ, ইহাতে পাপ হয়। সাধক প্রেমভক্তির বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে চায় বটে, গাঢ় অনুরাগের অভাব হইলে মৃত্যুবাঞ্ছা হয় সত্য, কিন্তু সেই বিরহজ্বালাই আবার প্রাণনাথকে নিকটে আনিয়া দেয়, সুতরাং তাহাকে আর মরিতে হয় না। তুমি এ কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন কর, অচিরাৎ কৃষ্ণ প্রেমধন পাইবে। তাঁহার ভজনে নীচ জাতি অযোগ্য নহে, আবার সৎকুলোদ্ভব বিপ্র হইলেও তাহাতে যোগ্য হওয়া যায় না। এ বিষয়ে জাতি কুলের বিচার নাই, যে ভজনা করে সেই শ্রেষ্ঠ; সে ব্যক্তি হীন অভক্ত হইয়াও উচ্চ হইতে পারে। দীনের প্রতি ভগবানের অধিক দয়া; কুলীন ধনী পণ্ডিত ইহারা বড় অভিমানী; হরিপদারবিন্দ-বিমুখ ষড়্গুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা হরিগত-প্রাণ চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইহা ভাগবতে কথিত আছে। ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন আত্মনিবেদনাদি ভক্তির এই নববিধ কার্য্য উৎকৃষ্ট বিষয়; হরিপ্রেমেই হরিকে আনিয়া দিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নিরপরাধে নামসঙ্কীর্ত্তন করা ইহাই সর্ব্বোপরি সার জানিবে। সনাতন অকস্মাৎ এ সকল কথা শুনিয়া একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। অতঃপর প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন ঠাকুর, আমাকে জীবিত রাখিলে তোমার কি লাভ হইবে? আমি অতি হীন পামর, তুমি সকলি জান, যাহা করাও তাহাই করি। গৌর বলিলেন, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া এক্ষণে আবার পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে পার না? তোমার শরীর দ্বারা আমি বহু প্রয়োজন সাধন করিব। ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব, বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্ম, এবং আচার ব্যবহার তোমা হইতে নির্দ্ধারিত ও প্রচারিত হইবে। মাতৃ আজ্ঞায় আমি নীলাচলে আছি, নিজবলে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারি না, যাহা আমি

করিতে অক্ষম সে সকল আমি তোমা দ্বারা করাইব। তুমি দেহপাত করিবে ইহা কি আমি সহিতে পারি? তোমা হইতে লোকে বৈরাগ্য শিখিবে, ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব প্রচারিত হইবে, আমার প্রিয় স্থান লুপ্ততীর্থ মথুরা বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধার হইবে। হরিদাস, তুমি নিষেধ করিও যেন সনাতন অন্যায় আচরণ না করে, এ ব্যক্তি পরের দ্রব্য বিনষ্ট করিতে চায়। হরিদাস বলিলেন তোমার গম্ভীর হৃদয়ের কথা কে বুঝিবে? কাহার দ্বারা তুমি কি করাও তাহা তুমি না জানাইলে জানিতে পারি না। সনাতন তখন কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থির হইলেন এবং বলিলেন ঠাকুর, আমি কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ, আপনাকে আপনি চিনি না, তুমি যেমনে নাচাও তেমনি নাচি। বস্তুতঃ সনাতন যাহা বলিয়াছেন ইহা বড় ঠিক কথা। মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কিরূপ, সে কোন্ কার্য্যের উপযুক্ত কি প্রণালীতে তাহার হৃদয়তন্ত্রীর স্বর মিলাইয়া তাহাকে বাজাইতে হয়, কোন্ স্থানে আঘাত করিলে তাহার ভিতর হইতে অমৃতের স্রোত বাহির হইতে পারে, এই জগদ্রূপ নাট্যশালায় কোন্ ব্যক্তি কোন্ অংশ সুন্দররূপে অভিনয় করিতে সক্ষম, অন্তরদর্শী মহাপুরুষেরাই কেবল তাহা জানেন। যখন মানব হৃদয়ের লুক্কায়িত সম্পত্তি তাঁহারা বাহির করিয়া দেন, তখন মানুষ আপনাকে আপনি চিনিয়া আহ্লাদে পুলকিত হয়। আমাদের গুণের গৌর এই মহামন্ত্র জানিতেন। মহাপুরুষেরা যে কেবল জীবতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারেন তাহা নহে, ভগবানের গুপ্ত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া তাঁহারা সাধারণ জনসমাজকে অবাক্ করিয়া দেন। প্রেরিত মহাজনদের কার্য্যই এই যে, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, ইহারই জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব। অনন্তর প্রভুর আজ্ঞায় হরিদাসও সনাতন বৈরাগীকে বুঝাইয়া বলিলেন দেখ সনাতন, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? প্রভুর নিজদেহের কার্য্য তোমার দ্বারা তিনি করাইবেন, ভক্তির সিদ্ধান্তশাস্ত্র আচারনির্ণয় তুমি প্রচার করিবে, ইহা অপেক্ষা তোমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? আমি বৃথা জীবন ধারণ করি, আমার এ দেহ প্রভুর কোন কার্য্যে

আসিল না। সনাতন বলিলেন, তুমি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, নামের মহিমা জগতে প্রচার করিয়া গেলে, এমন আর কে পারিবে? ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তোমার তুল্য ভাগ্যবান্ আর আমি কাহাকেও দেখি না। কেহ আপনি আচরণ করে প্রচার করে না, কেহ প্রচার করে আচরণ করে না, তুমি আচার প্রচার দুই কার্য্যই করিয়া থাক।

কিয়দ্দিবসান্তে রথযাত্রার কালে গৌরের সমস্ত ভক্তবৃন্দ এখানে আসিলেন, সনাতনের সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হইল। এই রূপে তিনি থাকেন, এক দিন গৌরাঙ্গ যমেশ্বর টোটা নামক স্থানে গিয়া তাঁহাকে তথায় আহ্বান করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রের বালুকারাশি অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে আগুনের হল্কা ছুটিতেছে, সহজ পথ ছাড়িয়া সেই তপ্তবালুরাশির উপর দিয়া সনাতন চলিলেন, পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িল তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। প্রভু তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি অস্পৃশ্য পামর, সিংহদ্বারের পথে জগন্নাথ দেবের সেবকগণ যাতায়াত করে, সে পথে চলিবার আমার অধিকার নাই। চৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যদিও তুমি দেব ও মুনিগণের বন্দনীয় পবিত্রস্বভাব, তথাপি মর্য্যাদাপালন করা বিধেয়, অনাথা লোকে উপহাস করে, নিজমর্য্যাদা রক্ষা করিলে আমার মন সন্তুষ্ট হয়, তুমি না করিলে তাহা আর কে করিবে? তদনন্তর কণ্ডুরসসিক্ত সনাতনকে তিনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন দান করিলেন।

একে নিজের নিকৃষ্টতা স্মরণে গ্লানি বোধ তাহার উপর গৌরপ্রেমের উৎপীড়ন, এই সকল কারণে সনাতন আপনাকে নিতান্ত অপরাধী বোধ করত ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, বৃন্দাবনই তোমার পক্ষে উপযুক্ত স্থান, রথযাত্রার পর তুমি সেই থানেই চলিয়া যাও। এ কথা সনাতন গৌরকে জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিলেন, কি! কালিকার জগা, সে নাবালক হইয়া কি না তোমাকে আবার উপদেশ দেয়? তুমি হইলে আমার

উপদেষ্টা এবং গুরুতুল্য ব্যক্তি, সে তোমাকে শিক্ষা দিতে যায়? তুমি বিজ্ঞ জ্ঞানী, আমাকে তুমি ভক্তির কত ব্যবহার বুঝাইয়া দিয়াছ, বালক জগা তোমাকে উপদেশ দিবে? মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমার দেহ আমার পক্ষে অমৃত সমান, ইহাকে তুমি প্রাকৃত মনে করিয়া ঘৃণা কর, কিন্তু আমি প্রাকৃত দেহ বলি না। আমি সন্ন্যাসী, তোমাকে ত্যাগ করা আমার অনুচিত কার্য্য, ঘৃণা করিলে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তাহা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন ঠাকুর! এ তোমার প্রবঞ্চনার কথা আমি মানি না, আমাদিগকে যে তুমি গ্রহণ করিয়াছ ইহাতে তোমার দীনের প্রতি দয়া ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ করে না। গৌর ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, "শুন হরিদাস, সনাতন, মনের কথা তবে বলি শ্রবণ কর। তোমাদিগকে বালক বোধে আমি স্নেহ করিয়া থাকি। মাতার পক্ষে বিষ্ঠামূত্রক্লেদদূষিত সন্তানের শরীর যেমন আদৃত সনাতনের দেহ আমার পক্ষে তদ্রূপ, ইহা আলিঙ্গনে ঘৃণার উদয় হয় না। বৈষ্ণবের দেহ কখন প্রাকৃত নহে। ভক্ত যখন দীক্ষিত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখন তিনি তাহার দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় করিয়া লন, ভক্ত সেই অপ্রাকৃত দেহে হরিচরণ ভজনা করে। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে যে আত্মসমর্পণ করে সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সঙ্গে একাত্মা হইয়া যায়। সনাতনের দেহে ভগবান্ কণ্ডু উৎপাদন করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিলেন। আমি যদি ইহাতে ঘৃণা করিতাম তাঁহার নিকট অপরাধী হইতাম। আপনার পারিষদের দেহে কণ্ডুরস ইহা দুর্গন্ধ নহে। অতএব সনাতন তুমি দুঃখিত হইও না, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি বড় সুখ পাই। আর এক বৎসর তুমি এখানে থাক, তাহার পর আমি তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইব।" প্রভু সনাতনকে যে পুত্রবাৎসল্যের কথা বলিলেন ইহা বড় মিষ্ট কথা। ভক্ত মহাপুরুষেরা অনুগত শিষ্যদিগকে যেরূপ ভাল বাসেন তাহা মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও মধুরতর, এ কথা

গৌরভক্তজনেরা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। জননী স্তনদুগ্ধদানে সন্তানের পার্থিব দেহকে প্রতিপালন করেন কিন্তু সাধুগুরু ঈশ্বরপ্রেরিত ধাত্রী হইয়া শিষ্যের শৈশব অমরাত্মাকে প্রেম ও পুণ্যদুগ্ধ দানে পরিপোষণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরাবিষ্ট সাধু দিব্যজ্ঞানামৃত পান করাইয়া আপনার সন্তান তুল্য শিষ্যদিগকে যে ভাবে প্রতিপালন করেন তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সন্তান পোষণের জন্য যেমন মাতার প্রয়োজন, আত্মার ধর্ম্মোন্নতির জন্য তেমনি দেবভাবাবিষ্ট ধর্ম্মগুরুর প্রয়োজন। তদনন্তর দোলযাত্রার উৎসব সাঙ্গ হইলে কি কি কার্য্য করিতে হইবে তৎসমুদয় উপদেশ দিয়া সনাতন বৈরাগীকে প্রভু বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। তথায় রূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় একত্রিত হইয়া বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। সনাতন ভাগবতামৃত গ্রন্থে ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব, সিদ্ধান্তসার পুস্তকে বৃন্দাবনলীলারস, হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবগণের নিত্যকর্ম্ম, তদ্ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ অনেক প্রচার করিলেন। রূপ গোস্বামী রসামৃতসিন্ধুসার গ্রন্থে ভক্তিরসের ব্যাখ্যান বিবৃত করেন, উজ্জ্বলনীল-মণিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করেন; তদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। অনুপমের পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এই সময় জ্যেষ্ঠতাতদিগের সঙ্গে মিলিত হন, এবং ষট্‌সন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, গোপাল চম্পূপ্রভৃতি বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ভক্তি শিক্ষা।

এক দিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া চৈতন্যের নিকট গমন করাতে তিনি বলিলেন আমি কিছু জানি না, তুমি রামানন্দ রায়ের নিকট যাও, তাঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইবে। প্রদ্যুম্ন রায় ভবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, রামানন্দ নির্জ্জন স্থানে উদ্যান-মধ্যে দুইটী কিশোর বয়স্কা সুন্দরী নর্ত্তকীকে নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতে-ছেন। নির্ব্বিকারচিত্ত রামানন্দ আপনাকে সেবক জ্ঞানে সেই দুই জনের অঙ্গ মার্জ্জনা, বেশ বিন্যাসাদি কার্য্য স্বহস্তে করিতেন এবং তাহাদিগকে গীতাভিনয় শিক্ষা দিতেন। প্রথম দিবসে মিশ্রের সঙ্গে

তাঁহার ধর্ম্মালাপ হইল না, পর দিন তিনি তাঁহাকে আসিতে অনুমতি করিলেন। মিশ্রের মুখে গৌর এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, দর্শন দূরের কথা, প্রকৃতির নাম শুনিলে আমার বিকার উপস্থিত হয়, কিন্তু রামানন্দ এ বিষয়ে কেমন নির্ব্বিকার! তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত, কে তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে? ভাগবত শাস্ত্রে কেবল শুনা গিয়াছে যে, বিশ্বাসী হইয়া রাসবিলাসের কথা শ্রবণ করিলে হৃদ্রোগ কাম বিনষ্ট হয়, মনুষ্য মহাধীর হইয়া প্রেমভক্তির উজ্জ্বল মধুর রসের আস্বাদন পায় এবং কৃষ্ণের মাধুর্য্য রসে আনন্দে বিহার করে। পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ, শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্বা। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ"। ইহা যে পাঠ করে এবং শুনে সে নিত্য সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। রায়ের ভজন প্রণালী রাগানুগা, তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। মিশ্র, তুমি পুনরায় তাঁহার নিকট যাও, তিনি কি শিক্ষা দেন আমাকে আসিয়া বলিও। অপর দিনে প্রদ্যুম্ন রামানন্দের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রেমরসতত্ত্ব শুনিতে আরম্ভ করেন। সৎপ্রসঙ্গের এমনি গুণ, তৃতীয় প্রহর বেলা হইয়া গেল তথাপি কাহারো ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ নাই, পরিশেষে রায়ের এতদূর উৎসাহ বৃদ্ধি হইল যে তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মিশ্র তাঁহার উপদেশে বিগলিতচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার চৈতন্যকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিলেন, রামানন্দের বিনয় ও মত্ততার কথা কহিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, রামানন্দ আপনার গুণ আমার উপর আরোপ করে, গৃহস্থ বিষয়ী হইয়াও ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করত সে সন্ন্যাসীদিগকে উপদেশ দেয়। প্রধান বৈষ্ণব দলের মধ্যে রায় রামানন্দ যদিচ উচ্চ পদস্থ এক জন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সকলে বিজিতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকারচিত্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন।

কোন কবির মনঃপীড়া।

স্বরূপ দামোদর কিরূপ তেজীয়ান্ লোক ছিলেন তাহার পরিচয় আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। তিনি বিদ্যা, সরলতা এবং নিষ্ঠাতে গৌরের

অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। কিন্তু বড় মুখর ছিলেন। একবার কোন এক জন গৌড়দেশবাসী ব্রাহ্মণ চৈতন্যলীলার এক খানি নাটক লিখিয়া আনে, তাহাকে তিনি যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন তাহা মনে হইলে আমার লেখনী অচল হয়। স্বরূপ জীবিত থাকিলে হয়ত এই "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা" গ্রন্থ আমাকে আর লিখিতে হইত না। ভয়ানক তেজস্বী সারগ্রাহী সুপণ্ডিত নবীন গ্রন্থকারদিগের রসানভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের অল্পতা তাঁহার নিকট অমার্জ্জনীয় ছিল। গৌরের শিষ্যদলের মধ্যে অনেকগুলি কৃতবিদ্য প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, আমি তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরও উপযুক্ত নহি। কেবল ভক্তির ধর্ম্ম বলিয়া আমার ন্যায় ব্যক্তি তন্মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। ভক্তির তরঙ্গ যখন এ দেশে প্রবাহিত হইল, তখন অনেক নূতন কবি ও গ্রন্থকার বৈষ্ণবদলের মধ্যে উদিত হইলেন, ব্যাপারটি বাস্তবিক আদ্যোপান্ত কবিত্বরসেরই প্রতিকৃতি। বঙ্গদেশীয় উপরোক্ত বিপ্রটি গৌরচরিত্রের এক নাটক লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহান্বিত হন। এ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তি কিছু রচনা করিবে অগ্রে স্বরূপকে তাহা শুনাইবে, তিনি অনুমোদন করিলে তবে গৌরাঙ্গ তাহা শুনিবেন। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কোন রসাভাস তিনি শ্রবণ করিতেন না! ব্যাকরণ ও অলঙ্কারদোষযুক্ত ভক্তিরসবিরহিত অসার কাব্য নাটক শুনিতে দামোদরও বড় বিরক্ত হইতেন। ভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধে এই নাটক শুনিতে বসিয়া শেষে তিনি সেই নবীন গ্রন্থকারকে এমন ভৎর্সনা করিলেন যে তাহাকে এককালে মাটি করিয়া দিলেন। সভার মধ্যে তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদের বড় দুঃখ হইয়াছিল। পরে তাহাকে কোনরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দেশে পাঠান হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইয়া দামোদর তাহাকে মিষ্ট বচনে বলিলেন, বৈষ্ণবের নিকট গিয়া তুমি ভাগবত পাঠ কর, গৌরপদে শরণ লও, তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গ কর, তাহার পর এ সব তত্ত্ব লিখিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ তখন অতিশয় লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া গৌরচন্দ্রের সঙ্গে বৈরাগী হইয়া রহিল।

এই সময় হইতে চৈতন্যের হৃদয়ে অন্য এক উচ্চ ভাবের বিরহ ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। প্রেমময়ের প্রেমে যত তাঁহার অনুরাগ আসক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে সময়ে সময়ে প্রেমবিকার ও বিচ্ছেদানলও অন্তরে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। দিবসে নানাবিধ সদালোচন, দেবদর্শন, সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তসঙ্গ ইত্যাদি কার্য্যে ভুলিয়া থাকিতেন, রাত্রি হইলে বিরহবিকারে প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইত। হৃদয়নাথকে সর্ব্বক্ষণ নয়নে নয়নে রাখিতে না পারিলে তাঁহার পিপাসার নিবৃত্তি হইত না। এই অবস্থায় স্বরূপ দামোদর নিকটে থাকিয়া প্রেমলীলার সঙ্গীত করিতেন, এবং রামানন্দ রায় বিবিধ প্রেমতত্ত্ব ও মাধুর্য্যরসের কবিতা শুনাইতেন, তাহাতে তাঁহার কথঞ্চিৎ তৃপ্ত্যনুভব হইত। গৌড়দেশস্থ ভক্তগণ যে চারি মাস নীলাচলে বাস করিতেন, তাঁহাদের সহবাসে সে সময় মহাপ্রভুর মন অপেক্ষাকৃত সুস্থির থাকিত।

রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য।

রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্যবৃত্তান্ত পূর্ব্বেই কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে, যেরূপে পরে তিনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া গৌরের সঙ্গী হইলেন তদ্বিবরণও অতীব আশ্চর্য্যজনক। রঘুনাথ মর্কটবৈরাগ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লিপ্তভাবে কিছু দিন সংসারে ছিলেন। তদনন্তর বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পিতৃব্য হিরণ্য দত্ত সপ্তগ্রাম অঞ্চলের জমিদারি মকরা করিয়া লইলেন। তিনি বিশ লক্ষ মুদ্রা কর সংগ্রহ করিয়া বার লক্ষ মাত্র নবাবকে দিতেন। উক্ত জমিদারির পূর্ব্ব শাসন কর্ত্তা এক জন মুসলমান এই কথা নবাবকে জানাইয়া বাদ সাধিল। উজির তদন্ত করিতে আসিলেন, হিরণ্য এবং আর আর সকলে পলাইল, রঘুনাথ বন্দীভূত হইলেন। তিনি শান্তভাবে মিষ্ট বাক্য ঐ মুসলমানকে অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে কিছু অংশ দিতে স্বীকৃত হইয়া সমস্ত গণ্ডগোল মিটাইয়া এক বৎসর কাল পরে পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ রজনীযোগে গোপনে প্রস্থান করেন আর বারংবার তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন।

রঘুনাথের মাতা গোবর্দ্ধন দাসকে বলিলেন, পুত্র উন্মাদ হইয়াছে, উহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখ। পিতা তাহাতে এই উত্তর করিলেন যে, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, অপ্সরতুল্যা স্ত্রী যাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সামান্য রজ্জু দ্বারা কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায়? ইহার উপর চৈতন্যের কৃপা হইয়াছে, তাঁহার পাগলকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? অতঃপর রঘুনাথ পাণিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দের নিকট চলিয়া গেলেন। অবধূত নিতাই তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, ওরে চোর! এত দিনে তুই এলি? এস! এস! আজ আমার বন্ধুগণকে তুমি দধি চিড়ার ফলার খাওয়াও। রঘুনাথ মহা আনন্দিত হইয়া সেইখানে এক চিড়ামহোৎসব করিলেন। যত লোক সেখানে ছিল, এবং যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল প্রত্যেককে এক মাল্সা দুগ্ধচিড়া এবং এক মাল্সা দধিচিড়া দেওয়া হয়। শত শত বৈষ্ণব প্রেমের ঝাঁকি দিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলার খাইলেন, তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের যৎপরোনাস্তি সুখবোধ হইল। তিনি নিজেও দুই মাল্সা চিড়ার ফলার খাইলেন। যে দেখিতে আসে সেই খায়, মহা মহোৎসব লাগিয়া গেল। দ্রব্যবিক্রেতাগণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মূল্য লইল এবং তাহা নিজেরাই ভক্ষণ করিল। আহারের পর মহা উদ্যমের সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। মহোৎসব শেষ হইলে রঘুনাথ সভক্ত নিত্যানন্দের নিকট চৈতন্যসঙ্গলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া বিদায় হইলেন। ভোজনের পর বৈষ্ণবগণকে যে যেমন পাত্র দশ বিশ শত মুদ্রা এবং নিত্যানন্দের সেবার জন্য তাঁহার ভৃত্যহস্তে গোপনে এক শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া দাসরঘুনাথ গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে গিয়া তদবধি অন্তঃপুরে আর প্রবেশ করেন নাই, যে কয় দিন বাড়ীতে ছিলেন প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বহির্ব্বাটীতেই থাকিতেন। এক দিন সুযোগ পাইয়া বনে বনে নীলাচলাভিমুখে একাকী পলায়ন করিলেন। রথযাত্রিগণও এই সময় শ্রীক্ষেত্রের পথে বাহির হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনদাস পুত্রকে ফিরাইবার জন্য শিবানন্দের নিকট পত্র লিখিয়া লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু রঘুনাথ যে পথ ধরিয়াছিলেন সে পথে লোক জনের গতি বিধি ছিল না। নদী পর্ব্বত

বন প্রান্তর পার হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি দ্বাদশ দিবসে একবারে চৈতন্যসমীপে উপনীত হইলেন। রঘুনাথকে পাইয়া মহাপ্রভু অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কোল দিয়া তিনি সভাস্থ সকলকে বলিতে লাগিলেন, ইহার পিতা এবং পিতৃব্য বিষয়ের কীট, কিন্তু ভগবানের কৃপায় রঘুনাথ তাহা হইতে উদ্ধার হইল। তাঁহাকে পথশ্রমে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও মলিন দেখিয়া দামোদরকে প্রভু বলিয়া দিলেন, তুমি ইহাকে পুত্র সমান দেখিয়া পালন করিবে, আমি তোমার হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ করিলাম। নিজভৃত্য গোবিন্দকেও বলিলেন, রঘুনাথ পথে বড় ক্লেশ পাইয়া আসিয়াছে ইহাকে ভালরূপে শুশ্রূষা কর। শেষে এই রঘুনাথ এমন বৈরাগী হইলেন যে, কিছু দিন পর্য্যন্ত সিংহদ্বারে কাঙ্গাল ভক্তদিগের সঙ্গে অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। পরে তাহাও গেল, গাভীদিগের মুখভ্রষ্ট পরিত্যক্ত পর্য্যুষিত অন্ন সংগ্রহপূর্ব্বক ধৌত করিয়া তাহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যাচরণের কথা শুনিয়া যদিও গৌর সকল বিষয়ে অনুমোদন করিতেন না, কিন্তু বীত-স্পৃহা ত্যাগস্বীকার দেখিয়া তাঁহার মনে মনে বড় আহ্লাদ হইত। এক দিন তিনি বলিলেন, রঘুনাথ উত্তম কার্য্য করিতেছে; বৈরাগী হইয়া যাহারা ভোগ বাসনা জিহ্বার লালসা রাখে, নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তাহাদের পরমার্থ বিনষ্ট হয়, ভগবান্‌কে তাহারা লাভ করিতে পারে না। বৈরাগী সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া শাক পত্র ফল মূলে আত্মরক্ষা করিবে। রঘুনাথের আহার্য্য সেই পর্য্যুষিত ধৌত অন্ন প্রভু এক দিন খাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি এমন সামগ্রী নিত্য খাও, আমাকে দাও না! অনন্তর রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি আমার কর্ত্তব্য তাহা আমাকে সবিশেষ বুঝাইয়া দিন্। গৌর তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি স্বরূপের নিকট সাধ্য সাধনতত্ত্ব শিক্ষা কর, তিনি তোমার উপদেষ্টা হইলেন, আমি যাহা জানি না, তাহা তিনি জানেন। তথাপি আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধা হয় তবে এই বলিতেছি, গ্রাম্যকথা

শুনিবে না এবং বলিবে না, ভাল খাইবে না, এবং ভাল পরিবে না, অমানীকে মান দিবে, সর্ব্বদা হরিনাম লইবে, মানসে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে এই সংক্ষেপে তোমাকে যথাকর্ত্তব্য বলিলাম। "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

রঘুনাথের ক্লেশ মোচনের জন্য তাঁহার পিতা একবার চারি শত মুদ্রা এবং কয়জন ভৃত্য ও পরিচারক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই। সেই অর্থে মাসে দুই দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন, পরে তাহাও আর প্রীতিকর বোধ হইল না। ভাবিলেন, বিষয়ীর দ্রব্যে প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হয় না, ইহাতে আমারও কেবল প্রতিষ্ঠা মাত্র লাভ। এ কথা চৈতন্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, বিষয়ীর অন্নে মন মলিন হয়, ইহা রাজসিক নিমন্ত্রণ, দাতা ভোক্তা উভয়েরই মনকে ইহা কলুষিত করে, পরমার্থতত্ত্ব ভুলাইয়া দেয়, রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া বড় উত্তম কার্য্যই করিয়াছে। রঘুনাথ জপ ধ্যান সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত দিন রাত্রি মগ্ন থাকিতেন, চারি দণ্ড মাত্র সময় আহার নিদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; ভেকধারী হওয়ার পর ভাল দ্রব্য রসনায় আর কখন স্পর্শ করিলেন না, মলিন ছিন্ন বসন পরিতেন, এইরূপে তিনি গৌরপ্রিয় হরিভক্ত পরম বৈরাগী হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া যান। গৌরাঙ্গদেব রঘুনাথকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কাহাকেই বা না ভাল বাসিতেন? প্রত্যেকেই মনে করিত প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অধিক প্রীতি করেন। আমি এক জন অজ্ঞ, অভক্ত আমাকেও তিনি ভাল বাসিতেন, সন্মান করিতেন। মনুষ্যের অভ্যন্তরে কি বস্তু আছে তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন তেমন আর কে বুঝিবে? এই জন্য আপনি ভক্তচূড়ামণি হইয়াও ছোট বড় সমস্ত সাধু বৈষ্ণবকে উপযুক্ত সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার ন্যায় নরোত্তমেরাই নরগণের প্রকৃত মর্য্যাদার পক্ষপাতী।

বল্লভ ভট্টের গর্ব্ববিনাশ।

প্রয়াগের নিকট বাসী সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট, যিনি একবার চৈত-

ন্যকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তিনিও নীলাচলে আসিলেন। ভট্টের কিছু জ্ঞানাভিমান ছিল, প্রভুর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক জ্ঞানালোচনা করেন এই ইচ্ছা, অন্য ভক্তগণের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না, একটু বিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্য দেখান যেন উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার বচনচাতুর্য্য শুনিয়া চৈতন্য বলিলেন, আমি নিতাই অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি সমস্ত ভক্তদিগের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়াই আমার ভক্তিলাভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভট্টের মনে মনে অভিমান ছিল যে সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই ভাগবতে পণ্ডিত, বৈষ্ণবতত্ত্ব তাঁহার মত আর কেহ জানে না, পরে গৌরাঙ্গের মুখে অপর ভক্তগণের প্রশংসা শুনিয়া এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গর্ব্ব কিছু খর্ব্ব হইল। তথাপি বিদ্যার অভিমান কি শীঘ্র যায়? আমি বিদ্যাবাগীশ বহুশাস্ত্রদর্শী জ্ঞানী, অমুক অমুক অনভিজ্ঞ অল্পজ্ঞ আধুনিক, অন্ধোৎসাহী ভাবুকেরা তত্ত্ববিষয় কি জানে, এই অভিমানের বিষ জ্ঞানাভিমানীর অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকে, সে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেও উহা ধর্ম্মাভিমানরূপে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে। কোন কল্পিত আদর্শের সঙ্গে তুলনা করিয়া সে আপনার গ্রীবাদেশ সর্ব্বদা উন্নত এবং বক্র করিয়া রাখে, তদূর্দ্ধে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। ভট্ট মহাশয় এক দিন প্রভুকে অনুরোধ করিলেন, আমি ভাগবতের টীকা করিয়াছি, তোমাকে তাহা একবার শুনিতে হইবে। তিনি তাঁহার ব্যবহারে তমোগুণের আঘ্রাণ পাইয়া এবং ভাবগতি বুঝিয়া পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তথাপি ভট্ট কিছুতেই ছাড়িবেন না, একবার নিজের বিদ্যা দেখাইবেন। গুরুদেবের উদাসীন ভাব দর্শনে অপর ভক্তগণও কেহই আর তাঁহার কথা শুনিলেন না। শেষ ব্রাহ্মণ নিতান্ত লজ্জিত এবং অপদস্থ হইতে লাগিল। তাঁহার কথা কেহ শুনিতে চাহেন না, অথচ তাঁহাকে শুনাইতেই হইবে, এ এক প্রকার অত্যাচার বিশেষ, এবং ইহা জ্ঞানাভিমানের প্রত্যক্ষ দণ্ডও বটে। অন্য এক দিন চৈতন্যের সভায় তিনি এই কথা উত্থাপন করিলেন যে জীব যদি প্রকৃতি এবং কৃষ্ণ যদি

পতি হইলেন, তবে পতির নাম উচ্চারণ তোমরা কেন কর? প্রভু সে দিন স্পষ্টই তাঁহাকে বলিলেন, তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই; স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন পতিব্রতার ধর্ম্ম, সেই আজ্ঞানুসারে জীব কৃষ্ণনাম লয়, তাহাতে কৃষ্ণপদে প্রেম হয়, ইহাই নামের ফল। ভট্ট তখন অধোবদন হইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ কিছু-তেই আর প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে না, মহা বিপদ হইল। বিদ্যার অভিমান মনুষ্যকে মূর্খের ন্যায় কি অসার করিয়াই ফেলে! ভট্ট জয়ী হইবেন, দশ জনের উপর পাণ্ডিত্য করিবেন, এই ইচ্ছাটি ভিতরে বিলক্ষণ প্রবল। আর এক দিন গৌরাঙ্গের সভায় উপস্থিত হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, স্বামীকৃত ভাগবতের ব্যাখ্যা আমি খণ্ডন করিয়াছি, তাঁহার ব্যাখ্যানে একতা নাই, যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে উহার অর্থ করে, অতএব স্বামীকে আমি মানিতে পারি না। চৈতন্য গোসাঞী হাসিয়া বলিলেন, যে স্বামীকে মানে না তাহাকে আমি বেশ্যার মধ্যে গণ্য করি। এ কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক হাস্য করিয়া উঠিল, ভট্ট চক্ষে আর কিছু দেখিতে পান না, মুখ শুকাইয়া গেল, লজ্জিত হইয়া গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এবার প্রভু আমার প্রতি কেন এত নির্দ্দয় হইলেন? শেষ আপনিই বুঝিতে পারিলেন যে আমার অভিমান বিনাশের জন্যই প্রভু এমন করিয়াছেন। তখন নতশিরা হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গৌর প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্বারা ভাগবতের মর্ম্ম জানা যায়, তাঁহার উপর কোন কথা বলিও না, তাঁহার অনুগত হইয়া টীকা রচনা কর, ভক্তিপূর্ব্বক নাম গান কর, ভগবানের পাদপদ্ম পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

প্রভুর ভোজন সঙ্কোচ।

পুরাতন ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর রামচন্দ্রপুরীনামে এক জন অকাল কুষ্মাণ্ড বচনবিলাস সন্ন্যাসী শিষ্য ছিল। মাধব এক দিন প্রেমবিরহে খেদ করি-তেছেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে উপদেষ্টার ন্যায় বলিতে লাগিল, তুমি পূর্ণ ব্রহ্মকে স্মরণ কর, ব্রহ্মবিদ্ হইয়া কেন রোদন করিতেছ? সে ব্রাহ্মণ

আপনার মনের দুঃখে জ্বলিতেছে, রামচন্দ্র শিষ্য হইয়া গুরুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। মাধব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর হও তুমি! আমাকে আর মুখ দেখাইও না, যেখানে ইচ্ছা সেইখানে চলিয়া যাও, তোর সম্মুখে মরিলে আমার অসদ্গতি হইবে। রামচন্দ্র গুরুকর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়া নানা স্থানে কেবল লোকের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইত। সে এক জন কঠোরহৃদয় বিশ্বনিন্দুক সন্ন্যাসী ছিল, ভক্তির ধার কিছুই ধারিত না। ঈশ্বরপুরী এই সময় মাধবের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হন। মাধবের ভক্তি প্রেম ঈশ্বরপুরীতে সংক্রামিত হইয়া তাহা গৌরপ্রেমোন্মাদের প্রথম উপলক্ষ হয়। রামচন্দ্র নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যের আশ্রমে এক দিন নিমন্ত্রণ খাইল। তাহাকে জগদানন্দ প্রভৃতি সকলেই চিনিতেন। ভয়ে ভয়ে যত্নপূর্ব্বক অনেক সামগ্রী তাহাকে ভোজন করান হইল। রামচন্দ্র আপনি আহার করিয়া জগদানন্দকে খাইতে অনুরোধ করিল, এবং খাও খাও বলিয়া আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অধিক ভোজন করাইয়া শেষে বলিতে লাগিল, "আমি শুনিয়াছিলাম চৈতন্যের লোকেরা অনেক বেশী খায়, তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। সন্ন্যাসীকে ইহারা এত আহার করায়, ইহাতেত বৈরাগ্য রক্ষা পাইবে না।" এইরূপ তাহার নিন্দা করিবার রীতি ছিল। সে বিনা নিমন্ত্রণে অপরের প্রস্তুত ভিক্ষান্নের ভাগ লইত।

চৈতন্যের প্রতিদিনের আহারের ব্যয় চারি পণ কড়ি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে কাশীশ্বর এবং ভৃত্য গোবিন্দ প্রসাদ পাইতেন। প্রভু কি প্রণালীতে পান ভোজন শয়ন উপবেশন করেন, রামচন্দ্র তাহার অনুসন্ধানে রহিল। অন্য কোন দোষ না পাইয়া এক দিন বলিতেছে, "সন্ন্যাসী হইয়া এত মিষ্টান্ন খাইলে ইন্দ্রিয় দমন কি রূপে হইবে?" নানা কথা বলিয়া, সত্যকে মিথ্যারূপে ব্যাখ্যা করিয়া যেখানে সেখানে লোকের নিকট এইরূপে সে প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইত, আবার প্রত্যহ তাঁহার আশ্রমেও আসিত। পুরীর বিদ্যা তিনি টের পাইয়াও গুরুকুল জ্ঞানে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক দিন চৈতন্যের

বাসগৃহে কতকগুলি পিপীলিকা দেখিয়া নিন্দুক রামচন্দ্র বলিতে লাগিল, "রাত্রাবত্র ঐক্ষবরসমাসীৎ তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ।" ইহার নিন্দার জ্বালায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, অদ্য হইতে পিণ্ডাভোগের এক চতুর্থাংশ অন্ন এবং পাঁচ গণ্ডা কড়ির ব্যঞ্জন আনিবে, ইহার অধিক আমাকে কিছু দিবে না, যদি দাও তবে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। এ কথায় সকলের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল। রামচন্দ্রকে তাঁহারা বহু তিরস্কার ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই পাপিষ্ঠ হতভাগ্য সকলের প্রাণ নষ্ট করিবে। তদবধি কিছু দিন পর্য্যন্ত গৌর অর্দ্ধভোজন করিতে বাধ্য হন। সুতরাং শিষ্যদিগকেও তদনুসারে চলিতে হইল। অন্নের উপর হস্তারক হওয়াতে, কি কষ্টে আমাদিগকে পড়িতে হইয়াছিল সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন। ইহাতে রামচন্দ্রের উপর ভক্তগণের জঠরাগ্নিপ্রসূত অজস্র কোপাগ্নি বর্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে কিছু দিন যায়, আর এক দিন সেই হতভাগ্য পরনিন্দুক দুষ্ট আসিয়া ঠাকুরকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, তোমাকে যে বড় ক্ষীণ দেখিতেছি? তুমি নাকি অর্দ্ধভোজন করিয়া থাক? এরূপ শুষ্ক বৈরাগ্যত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে? যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিলে তবে যোগ সিদ্ধ হয়। এই জন্য গীতায় কথিত হইয়াছে, "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা"! নিরীহ কোমলহৃদয় গৌরচন্দ্র দুষ্টাশয় রামচন্দ্রের নিকট অবশেষে পরাস্ত হইয়া বলিলেন, আমি অজ্ঞ বালক, তোমার শিষ্যস্থানীয়, যাহা কিছু শিক্ষা দাও তাহাই সৌভাগ্য জ্ঞান করি। কয়েক দিন পরে সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ও ব্যক্তি বিশ্বনিন্দুক, উহার কথায় শরীর ক্ষয় করিলে কি হইবে? প্রভু তখন অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুই পণ কড়িতে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিনান্তে রামচন্দ্রপুরী অন্যত্র প্রস্থান করিলে ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্ববৎ আহারাদি করিতে লাগিলেন। আপদ দূর হইয়া গেল দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন।

চৈতন্যের বৈষয়িক নিরপেক্ষতা।

রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক কোন এক জমিদারির করসংগ্রাহক ছিলেন। অনেক টাকা বাকি পড়াতে তাঁহার উপর রাজপুরুষেরা শাসন আরম্ভ করেন। অধিকন্তু রাজপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া গোপীনাথ আরও বিপদাপন্ন হন। নীচে খাঁড়া পাতিয়া মাচার উপর হইতে গোপীনাথকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে নগর মধ্যে এই জনরব উঠিল। ইহা শুনিয়া কোন লোক গৌরাঙ্গকে আসিয়া বলিল, এক্ষণে আপনি যদি রক্ষা করেন তবেইত গোপীনাথের প্রাণ বাঁচে, নতুবা রাজদণ্ডে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। ভবানন্দ রায় সবংশে তোমার সেবক, তাহার পুত্রের এই বিপদ, এ বিষয়ে তোমার সাহায্য কর কর্ত্তব্য। তিনি সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজার ইহাতে দোষ কি? রাজস্ব ভাঙ্গিয়া গোপীনাথ বাবুগিরি করিয়াছে, দণ্ডভয় করে নাই, চতুর লোকেরা রাজকার্য্য করুক, আমি উহার কিছু জানি না। রাজস্ব শোধ দিয়া যাহা থাকে তাহাই ব্যয় করা তাহার উচিত ছিল। ক্ষণকাল পরে আর এক জন আসিয়া সংবাদ দিল, রাজানুচরগণ বাণীনাথ প্রভৃতিকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণ নিতান্ত ভীত হইয়া প্রভুকে অনুরোধ করিলেন যে, রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার দাস, তাহাদের এই বিপদ দেখিয়া তোমার উদাসীন থাকা কি এখন ভাল দেখায়? চৈতন্য বলিলেন, রাজা আপনার পাওনা গণ্ডা লইবে, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী হইয়া তাহার কি করিতে পারি? তবে তোমরা আজ্ঞা দাও আমি রাজদ্বারে যাই, আঁচল পাতিয়া কড়ি ভিক্ষা করি। দুই লক্ষ কাহন কড়ি তাহার বাকি, ভিক্ষা করিলেই বা আমাকে তাহা কে দিবে? আমিত সন্ন্যাসী, পাঁচ গণ্ডার পাত্র। আবার এক জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, গোপীনাথকে খাঁড়ার উপর ফেলিয়া দিতেছে। তখন সকলে নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন যে তোমাকে ইহার কিছু করিতেই হইবে। তিনি শেষ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে বাধ্য হইলেন, আমি ভিক্ষুক, আমা দ্বারা কিছু

হইবে না, তোমরা জগন্নাথের চরণে ধর, তিনি ঈশ্বর এবং সকল কার্য্যের কর্ত্তা! অনন্তর হরিচন্দন পাত্র রাজাকে অনেক বলিয়া গোপীনাথকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করেন। রাজা এ সকল সংবাদ জানিতেন না। শেষসংবাদদাতাকে গৌর এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, রাজার লোক যখন বাণীনাথকে বাঁধিয়া লইয়া গেল, তিনি তখন কি করিলেন? সে বলিল ঠাকুর, বাণীনাথ অবিশ্রান্ত কেবল হরিনাম জপে মগ্ন ছিলেন এবং জপ করিয়া সহস্র সংখ্যা পূরণ হইলে স্বীয় অঙ্গে রেখা কাটিতে ছিলেন। ইহা শুনিয়া প্রভুর মন অতিমাত্র পরিতুষ্ট হইল। কিয়ৎকাল পরে কাশীশ্বর মিশ্র আসিলে তিনি খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ মিশ্র, আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না, আলালনাথে গিয়া থাকিব, এখানে বিষয়কার্য্যের বড় কোলাহল। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নির্জ্জনবাসী, আমার নিকট ভবানন্দ রায়ের লোক চারি বার আসিল। তাহারা নানা প্রকারে অর্থ ব্যয় করিয়া রাজার কর দিতে পারে না, শেষে আমাকে আসিয়া জানায়, তাহাতে আমার মনে দুঃখ হয় জগন্নাথ এবার তাহাকে রক্ষা করিলেন, পুনরায় যদি সে রাজস্ব পরিশোধ না করে তখন কে রাখিবে? বিষয়ীর কথা শুনিয়া আমার মনে ক্ষোভ হয়, অতএব আমার এখানে আর থাকা পোষাইল না। কাশীমিশ্র বুঝাইয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে বিষয়ের কি সম্বন্ধ? বিষয়ের জন্য যে তোমার নিকট আসে সে অন্ধ এবং মূর্খ। তুমি স্বয়ংই ভক্তদিগের পুরস্কার। তোমার জন্য রামানন্দ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। আপনার সুখ দুঃখের ভাগী আপনি হইয়া তোমার অনুগ্রহ যাহারা প্রার্থনা করে তাহারাই শুদ্ধ লোক। তুমি এইখানে থাক, কেহ আর তোমাকে এজন্য বিরক্ত করিবে না। কোন শিষ্যকে বিষয়-সুখে সুখী করিতে চৈতন্য কখনই অভিলাষী হন নাই, বরং সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইতে অনেককে পরামর্শ দিয়াছেন। গুরু শিষ্যের মধ্যে বিষয়ঘটিত স্বার্থের কোন সংস্রব থাকা উচ্চ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ। এই জন্য সামান্য পার্থিব কারণ উপলক্ষে চিরদিনের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। পরিত্রাণের জন্যই গুরুর আবশ্যকতা, অর্থ সুখ মান সম্পদ

লাভের স্থান পৃথিবীতে অনেক আছে। প্রাচীন কালের মুমুক্ষু শিষ্যগণ এ বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পরে কাশীশ্বরের মুখে রাজা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হন, এবং গোপীনাথকে ঋণমুক্ত করিয়া তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। কাশীমিশ্রের নিকট এই সংবাদ পাইয়া প্রথমে গৌর বলিলেন, কি! তুমি আমাকে রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে? শেষে যখন শুনিলেন রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তখন প্রভু তাঁহার বিনয় সদ্‌গুণের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কোন রাজা কি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট বিষয়সংক্রান্ত বাধ্যতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অর্থ ধন সম্পদ্ আপনা হইতে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইত না। বৈরাগীর স্বাধীনতা কেমন উচ্চ ইহাতে বুঝা যায়। কয়েক দিবসান্তে গোপীনাথ বাণীনাথ প্রভৃতি পঞ্চপুত্র সহ ভবানন্দ রায় চৈতন্যের চরণে শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিলেন, এবার প্রভু আমাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত কর। তিনি কহিলেন, পঞ্চজনে সন্ন্যাসী হইলে তোমাদের বহু কুটুম্ব কে পোষণ করিবে? উদাসীন হও বা বিষয়কর্ম্ম কর, এই মাত্র আমার অনুরোধ, যেন রাজার মূলধন কেহ আত্মসাৎ না করেন। মূলধন রক্ষা করিয়া লাভ করিবে এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্মে সদ্ব্যয় করিবে, অসদ্ব্যয়ে দুই লোক বিনষ্ট হয়। সাংসারিক বিষয়ব্যাপারসম্বন্ধে চৈতন্য বড় নিরপেক্ষ ন্যায়বান্ ছিলেন। একবার অদ্বৈতের এক কর্ম্মচারী কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রকে মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছিল যে অদ্বৈত গোসাঞী ঈশ্বর, এবং তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে, অতএব তিন শত টাকা পাঠাইবে। সেই পত্র প্রভুর হাতে পড়ে তিনি তাহা পড়িয়া বড় দুঃখিত হন এবং কমলাকান্তকে শাসন করেন।

সেবকদত্ত উপহার গ্রহণ।

প্রতি বর্ষে বর্ষে গৌড়বাসী প্রধান প্রধান ভক্তগণ যখন রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যসহবাসে চারি মাস কাল থাকিতেন তখন প্রত্যেকে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, এবং তজ্জন্য

আসিবার কালে প্রভুর প্রিয় বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে আনিতেন। এ বিষয়ে পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার পত্নী দময়ন্তী অতি পরিপাটি করিয়া ভক্তির সহিত নানাবিধ আচার বড়ি মিষ্টান্ন মসলা শুক্তপাতা, পেটারা সাজাইয়া দিতেন। রাঘবের ঝালি প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক বিধ সামগ্রী তিনি লইয়া আসিতেন। প্রত্যেকেই এক একটি উপাদেয় বস্তু ভৃত্য গোবিন্দের হাতে দিয়া অনুরোধ করিতেন যেন তাহা প্রভুর সেবায় ব্যবহৃত হয়। এইরূপে ক্রমে রাশীকৃত দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া যাইত। সে সকল জিনিষ গৌরের খাইবার অবসর হয় না। আমাদেরও সাহস হইত না যে তাহা খাইয়া ফেলি। গোবিন্দ এক দিন বলিল, সকলেই আমাকে এ জন্য ব্যস্ত করে, ভক্তগণের প্রেমের উপহার গ্রহণ না করিলে তাহাদের মনে বড় দুঃখ হইবে! এক দিন উৎসাহের সহিত গৌরচন্দ্র সমুদয় হইতে কিছু কিছু আহার করিলেন, তন্মধ্যে বাসি পুরাতন বিস্বাদু সকল প্রকারই ছিল।

গোবিন্দের প্রভুভক্তি।

ভৃত্য গোবিন্দ এক জন পরম ভক্ত। সে প্রতি দিন প্রভুর পদসেবা করিয়া তিনি ঘুমাইলে তবে আপনি আহার করিতে যাইত। এক দিন চৈতন্য নাম সঙ্কীর্ত্তনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া দরজায় আড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন, কিছুতেই পথ ছাড়িয়া দেন না, ভৃত্যের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ আর কিছুতেই ভিতরে যাইবার পথ পায় না, শেষ বহির্বাস খানি তাঁহার বুকের উপর রাখিয়া দিয়া ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক পদসেবা আরম্ভ করিল, কিন্তু আহারের জন্য প্রভুর দেহ লঙ্ঘন করিয়া আর আসিতে পারিল না। নিদ্রাভঙ্গের পর গৌর তাহাকে বলিলেন, এখনও তুমি বসিয়া কেন? আহার করিলে না? গোবিন্দ বলিল যাই কিরূপে? তুমি যে পথরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ভিতরে আসিলে কিরূপে? সেবা করা আমার ব্রত, তাহাতে নরক হউক, আর যাহা হউক, তোমার উপর দিয়া আসিলাম, কিন্তু নিজপ্রয়োজন সাধনের জন্য সেরূপত পারি না, গোবিন্দ এই প্রকার উত্তর দিয়া আহার করিতে

গেল। নীলাচলে গোবিন্দ এবং স্বরূপ এই দুই জন তাঁহার সর্ব্বকালের সঙ্গী ছিলেন। ভৃত্য গোবিন্দ এক জন ভক্তের মধ্যে গণ্য। সাধু মহাজনদিগের সকল দিকই মিষ্ট রসে পূর্ণ। তাঁহাদের সংযোগে লৌহ স্বর্ণের রূপ ধারণ করে। প্রতি পাদবিক্ষেপ, প্রতি নিশ্বাস, মুখের প্রত্যেক কথাটি, স্নানাহার নিদ্রা সমস্ত যেন সুধারসে পরিপূর্ণ।

হরিদাসের লীলাসংবরণ।

গোবিন্দ এক দিন প্রসাদ দিবার জন্য হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, আমি কিরূপে প্রসাদ ভক্ষণ করিব, নামের সংখ্যা পূরণ হয় নাই; এই বলিয়া কণিকামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করত উপবাসী রহিলেন। অপর দিবসে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাস, সুস্থ আছত? তিনি প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, শরীর সুস্থ বটে, কিন্তু মন বড় অসুখী, নামজপের সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না। তাহা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, তুমি এখন প্রাচীন হইয়াছ, সংখ্যা হ্রাস কর। সিদ্ধদেহ পাইয়া এখন সাধনের জন্য এত আগ্রহই বা কি জন্য? নামের মহিমাত প্রচার করিলে, আর কেন? সংখ্যা কমাইয়া লও। হরিদাস মিনতি করিয়া বলিলেন, আমি হীনজাতি অস্পৃশ্য, তুমি আমার প্রতি অনেক দয়া করিয়াছ; ম্লেচ্ছ হইয়া বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র পর্য্যন্ত আমি খাইলাম; এক্ষণে আমার এই বাঞ্ছা যে, তোমার লীলা সংবরণের পূর্ব্বে যেন আমি দেহত্যাগ করিতে পারি। তোমার ঐ চন্দ্রবদন দেখিয়া এবং পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি বুঝিতেছি তোমার লীলা শীঘ্র শেষ হইবে। তাহার পূর্ব্বে আমাকে বিদায় দাও। ফলতঃ হরিদাস এ সময় অতিশয় স্থবির হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌর বলিলেন, কৃপাময় হরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, কিন্তু তোমাকেই লইয়া আমার সুখ, আমাকে ছাড়িয়া তুমি আগেই যাইবে? হরিদাস কাতর হইয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার মস্তকের মণি স্বরূপ কত কত মহাত্মা তোমার লীলার সহায় থাকিলেন। একটি পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর আর কি ক্ষতি হইবে? ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে পর দিন প্রাতে চৈতন্যদেব ভক্তগণ

সঙ্গে হরিদাসের কুটীরে উপনীত হইয়া তাঁহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। প্রথমে মৃত্যুশয্যার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে হরিদাসের গুণ বর্ণনা করত প্রভু নাচিতে লাগিলেন, এবং আর সকলে সেই মুমূর্ষুপ্রায় প্রাচীন সাধুর চরণধূলি লইতে লাগিলেন। এইরূপে হরিসঙ্কীর্ত্তনের সুবিমল পবিত্র হিল্লোলের মধ্যে গৌরচন্দ্রের সম্মুখে হরিনাম করিতে করিতে হরিদাসের প্রাণ বিয়োগ হইল। এমন সুখের মৃত্যু প্রায় কাহারো ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার মৃতদেহ কোলে লইয়া মহাপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তে ভক্তে কেমন স্বজাতীয়ত্ব এবং কুটুম্বিতার সম্বন্ধ তাহা চৈতন্য হরিদাসের মৃত্যুতে দেখাইয়াছেন। অতঃপর সেই দেহ সংস্কারপূর্ব্বক বালুকা খনন করত তন্মধ্যে প্রোথিত করা হয়। হরিনাম সাধক হরিদাসের জীবন, মৃত্যু ও সাধন ভজন সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে এক হরিমামেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইয়াছে। সমাধিকার্য্য সমাপনান্তে সাগরজলে স্নান করিয়া ভক্তপ্রাণ গৌরচন্দ্র নিজে দোকানে দোকানে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের মহোৎসব করিলেন। এইমহোৎসবের জন্য তিনি আপনি ভিক্ষা করিয়া তাহা দ্বারা স্বহস্তে বৈষ্ণব দিগকে ভোজন করান। হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের দয়া স্নেহ প্রেম, শ্রদ্ধা, আত্মীয়তা একটি অতীব প্রীতি কর সদৃষ্টান্ত।

স্বদেশস্থ বন্ধুগণের প্রতি গৌরের কৃতজ্ঞতা।

নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ যে তিনি বঙ্গদেশে থাকিয়া দ্বারে দ্বারে কেবল নাম প্রচার করিবেন। কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার গৌরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, রথযাত্রীদিগের সঙ্গে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এখানে উভয়ে নিভৃতে বসিয়া অনেক গূঢ় কথাবার্ত্তা হইত। শিবানন্দ সেন পথের মধ্যে যাত্রী সকলের নিমিত্ত বাসা এবং আহারাদির আয়োজন করিয়া দিতেন। এক দিন এ বিষয়ের যোগাযোগ হইয়া উঠে নাই, তজ্জন্য নিতাই মহা উত্তেজিত হইয়া শিবানন্দকে গালি দিতে দিতে বলিলেন, তোর ছেলে মরুক! তাহা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল। অবশেষে নিতাই শিবা-

নন্দকে এক লাথি মারিলেন। লাথি খাইয়া তাঁহার আহ্লাদ বৃদ্ধি হইল, আপনাকে তিনি কৃতার্থ বোধ করিলেম। এ বৎসর অন্য যাত্রীদিগের মধ্যে পরমেশ্বর মদক ছিল। মদকের নিকট গৌর বালককালে অনেক মিষ্টান্ন খাইয়াছেন। তাহার প্রতি প্রভু যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইলেন। মুকুন্দের মাতা আসিয়াছে তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠেন। স্ত্রীলোকসম্বন্ধে এমনি শাসন ছিল যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরিবার সকল দূরে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। প্রতি বৎসর সকলে কষ্ট পাইয়া যাওয়া আসা করেন, এজন্য চৈতন্যপ্রভু এক দিন মিনতি করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের পথকষ্ট দেখিয়া বার বার আসিতে নিষেধ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমি বড় সুখ পাই। নিতাই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও এখানে আসেন। আচার্য্য গোস্বামীর আমার প্রতি বড় কৃপা। এইখানে বসিয়াই আমি তোমাদের দেখা পাই, একটু পরিশ্রম করিতে হয় না, আমি দীন দরিদ্র সন্ন্যাসী, কিরূপে তোমাদের এ ঋণ পরিশোধ করিব জানি না। দেহমাত্র ধন আছে তাহাই সমর্পণ করিলাম, যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইহা তোমরা বিক্রয় কর, এই বলিয়া ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে কম্পিত কলেবরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহারাও সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। প্রতি বর্ষে বর্ষে মিলন ও বিচ্ছেদের সময় প্রায় এইরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিত। গৌড়েয় ভক্তগণ বিদায় লইলে পুনরায় তাঁহার প্রেমবিরহানল আবার প্রবল হইল।

জগদানন্দের অভিমানভঞ্জন।

একবার চৈতন্য প্রভু প্রিয়শিষ্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে শচীর নিকট প্রেরণ করেন। ইনি গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় এক কলসী চন্দনাদি তৈল অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া আনেন। গৌর সময়ে সময়ে প্রিয়বিরহোত্তাপে অতিশয় ক্লেশ পাইতেন। তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই স্নিগ্ধ তৈল গোবিন্দের হস্তে দিয়া ইহা ব্যবহারের জন্য পণ্ডিত তাহাকে অনুরোধ করিলেন। গোবিন্দ

এ কথা প্রভুকে জানাইল। তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসীর তৈলে কোন অধিকার নাই, বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈল, ইহা জগন্নাথের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য দিতে বল, তাহার পরিশ্রম সফল হইবে। জগদানন্দের মন সে কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল। পুনরায় তিনি গোবিন্দ দ্বারা এ জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। তখন গৌরসুন্দর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তবে তৈল মর্দ্দনের জন্য এক জন ভৃত্য নিযুক্ত কর। এই জন্য আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি কি না! তোমাদের পরিহাস আমার সর্ব্বনাশ। তৈলের গন্ধ পাইয়া পথের লোকেরা বলুক যে, এই সন্ন্যাসী বিবাহিত, বিলাসপরায়ণ! গোবিন্দ নিস্তব্ধ হইল। পর দিন প্রাতে জগদানন্দকে দেখিয়া প্রভু বলিলেন, তুমি সেই তৈল কলসটি জগন্নাথের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য দাও, শ্রম সফল হইবে। পণ্ডিত অভিমানভরে কহিলেন, কে তোমাকে এ কথা বলিয়াছে যে আমি তৈল আনিয়াছি? এই বলিয়া কলসীটি ঘর হইতে বাহির করিল এবং তাঁহার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিন ঘরে দুয়ার দিয়া তিনি উপবাসী রহিলেন। জগদানন্দের এরূপ অভিমান নূতন নহে। অনন্তর তাঁহার সন্তোষের জন্য চৈতন্য নিজে গিয়া তাঁহার অভিমান ভঞ্জন করেন এবং আপনা হইতে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ লয়েন। পণ্ডিত তখন আহ্লাদিত হইয়া স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করত বহু সমাদরে গুরুদেবকে অন্ন পরিবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন তোমাকেও একসঙ্গে আজ বসিতে হইবে। জগদানন্দ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার হস্তের পবিত্র অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া গৌর বলিতে লাগিলেন, ক্রোধাবেশের রন্ধন বড় উত্তম হয়। তদনন্তর তিনি সে দিন নিজে সেখানে বসিয়া থাকিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া পণ্ডিতকে ভোজন করাইয়া আসেন। চৈতন্যের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই নিরামিষ ব্যঞ্জন ভাল রাঁধিতে পারিতেন। সামান্য সুলভ সামগ্রী অথচ পরিষ্কার শুদ্ধ, এরূপ আহার্য্য বস্তু গৌরের অতিশয় প্রিয় ছিল। আহার বিলাস ভোগের জন্য ইহা তিনি মনে করিতেন না, ভক্তি প্রেম বৈরাগ্যের সঙ্গে ইহার বিলক্ষণ যোগ ছিল। আহার কালীন

অন্নের সুঘ্রাণ পাইয়া তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস হইত। সুখত্যাগী বৈরাগী শিষ্যগণ সামান্য বস্তু রন্ধনপূর্ব্বক আহার করিতেন, তাহা দেখিয়া প্রভু আপনা হইতে তাঁহাদিগের বাসায় নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেন। একবার গদাধরের হাতে কচি তেঁতুলপাতার অম্ল খাইয়া অতিশয়। আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈরাগ্য উদ্দীপনের আহার্য্য তাঁহার লোভের বিষয় ছিল। যে সকল সামগ্রী পাতের কাছে থাকিলে তোমার আমার ক্রোধ বিরক্তি উত্তেজিত হয়, তাঁহার তাহাতে মহা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উদয় হইত। শেষাবস্থায় প্রেমের উত্তেজনায় প্রভুর শরীর কিছু কৃষ হয়। কদলীবৃক্ষশাখার শয্যায় তিনি শয়ন করিতেন, এজন্য অস্থিতে বেদনা লাগিত, কিন্তু সে বেদনা অনুভব হইত জগদানন্দের হৃদয়ে। পণ্ডিত ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিন সূক্ষ্ম গেরুয়া বসনে তুলা পূরিয়া তদ্দ্বারা বালিশ তোষক প্রস্তুত করিয়া গৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রথমে ইহা দেখিবা মাত্র প্রভু বিরক্ত হইলেন, এবং পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, তবে একখান খাট আন? পরে যখন শুনিলেন ইহা জগদানন্দের কার্য্য, তখন চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু সে শয্যা স্পর্শও করিলেন না। পরিশেষে অনেকের উপরোধে বহির্ব্বাসাবৃত ছিন্ন কদলিপত্রের শয্যায় শয়ন করিতেন।

কোন নারীর সঙ্গীতে প্রভুর মুগ্ধ হওন।

এক দিন মহাপ্রভু যমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন, পথের মধ্যে এক স্থানে হঠাৎ বামাকণ্ঠের মধুর ধ্বনি কর্ণকে আঘাত করিল। রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত জগন্নাথের গুণসঙ্গীত শুনিয়া তিনি বাতুলের ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। সঙ্গে কেবল প্রিয়ভৃত্য গোবিন্দ মাত্র ছিল। সঙ্গীতের স্বর লক্ষ্য করিয়া তিনি অন্ধের মত বিপথে চলিতে লাগিলেন, কোথায় কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই বোধ নাই, একেবারে যেন পাগল হইয়া পড়িলেন। পদতলে মনসা সিজুর সুতীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটিতে লাগিল তাহাও জ্ঞান নাই; এমন সময় "স্ত্রীলোকের গান" এই বলিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে কোলে চাপিয়া ধরিল। স্ত্রীলোক, এই শব্দ শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ গৌরের প্রেমসুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেল,

অমনি জাগ্রৎ হইয়া গোবিন্দকে আশীর্ব্বাদ করত তিনি বলিলেন, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, নতুবা স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার প্রাণ বিয়োগ হইত। তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়, তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিয়া সাবধান করিয়া দিও। স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ দূরে থাকুক, তাহার দর্শনসম্বন্ধে চৈতন্যের অতিশয় কঠোর নিয়ম ছিল। যদিও প্রেমোন্মত্ততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল, ভাবরসের অদ্বিতীয় আদর্শ, কিন্তু নীতি পবিত্রতা বৈরাগ্য বিরতি বিষয়ে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় তাঁহার অতি কঠোর ব্রত ছিল। তাদৃশ প্রেমাবেশ, তথাপি "স্ত্রীলোকের গান" এই শব্দ শুনিবামাত্র নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা কি সহজ সতর্কতা ?

ভট্ট রঘুনাথ।

কাশীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র ভট্ট রঘুনাথও এক জন পরম বৈরাগী ছিলেন। তিনি এই সময় গৌড়ের রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বিষয়ীর সঙ্গে পথে মিলিয়া গৌর সন্নিধানে উপনীত হন। আট মাস কাল রঘুনাথকে নিকটে রাখিয়া প্রভু এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন, অবিবাহিত থাকিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা কর, বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন কর, এবং আর একবার এখানে আসিও। পরে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ সনাতনের সঙ্গের সঙ্গী হন। ভট্ট রঘুনাথ প্রতি দিন সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করিয়া লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তিনিও এক জন অতি নিষ্ঠাযুক্ত প্রধান সাধুর মধ্যে গণ্য ছিলেন।

এক নারীর একাগ্রতা।

এক দিন গৌরাঙ্গ জগন্নাথের মন্দিরমধ্যে গরুড়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছেন, লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে একটী দেবদর্শনপিপাসু উড়িয়া স্ত্রী নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই জনতার ভিতর গরুড়ের উপর এক পা এবং গৌরের স্কন্ধের উপর আর এক পা রাখিয়া জগন্নাথ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দ তাহাকে তিরস্কার করাতে সে ভীত হইয়া পরে প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করে। কিন্তু চৈতন্য বলিয়াছিলেন আহা! উহাকে কিছু বলিও না, আশানিবৃত্ত করিয়া

ঠাকুর দেখিতে দাও, ইহার যেমন ব্যাকুলতা আগ্রহ আমার তেমন নাই। এই নারী ভাগ্যবতী, আমি ইহার চরণবন্দনা করি, আমার যেন এইরূপ আর্ত্তি হয়। ক্ষণকাল পরে সচকিত হইয়া তিনি দূরে প্রস্থান করিলেন।

প্রভুর প্রেমবিকার।

শেষাবস্থায় চৈতন্যের বিরহোন্মাদ এবং প্রেমবিকার এমন বৃদ্ধি হইয়া পড়িল যে, তাঁহার কিছুই আর জ্ঞান গোচর থাকিত না; অভ্যাসের গুণে কেবল স্নান আহার ঠাকুর দর্শন করিতেন মাত্র। ক্রমে মহাভাবময়ী ভক্তির লক্ষণ সকল শেষ সীমায় উপনীত হইতে লাগিল। বিহ্বল হইয়া কেবল হাহাকার করেন, স্বরূপ ও রামানন্দের গলা ধরিয়া কাঁদেন; তাঁহাদের মুখে প্রেমলীলা শ্রবণ করিয়া এক একবার স্থির হইয়া থাকিতেন। এক দিন রাত্রে শুইয়া আছেন, চক্ষে নিদ্রাত প্রায় ছিল না, সমস্ত যামিনী নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতেন, খানিক রাত্রে আর কিছু সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। গোবিন্দ দ্বার খুলিয়া দেখিল প্রভু নাই, সহা ব্যাকুল হইয়া সকলে চারিদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, প্রভু সিংহদ্বারে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। মত্ততার দুর্জ্জয় বিকারে শরীর দীর্ঘাকার, অস্থির গ্রন্থি শিথিল, জ্ঞান চৈতন্য বিহীন দেখিয়া সকলে মিলে তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চ রবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ এই রূপ করিতে করিতে প্রভুর চেতনা লাভ হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। এক দিন হঠাৎ উঠিয়া চটক পর্ব্বতের দিকে এমনি বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন যে, কেহ আর ধরিতে পারে না। সে দিনকার দৃশ্য আর এক প্রকার। প্রত্যেক রোমকূপে রক্তবর্ণ ব্রণ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল, শরীর কদম্বাকৃতি হইল, কণ্ঠে ঘর্ঘর শব্দ, মুখে বাক্য নাই, দুই চক্ষে অনবরত জল ঝরিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ, শেষ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইলেন। গোবিন্দ ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে জল সিঞ্চন করিয়া বাতাস করিতে লাগিল, সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গে জলসেক করিয়া কর্ণে হরিনাম শুনাইয়া বহু

কষ্টে সে দিন চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। মহাভাবের এই সকল অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ এ পৃথিবীতে অতি বিরল দৃশ্য। তদনন্তর জ্ঞানলাভ করিয়া সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া গৌর বলিলেন, এখানে আমি কিরূপে আসিলাম? কোন্ ভাবের প্রাবল্যহেতু সে প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল পরে তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন। আর এক দিন সকলের অগোচরে বহির্গমন করিয়া কুষ্মাণ্ডাকৃতি হইয়া পথের মধ্যে মাংসপিণ্ডের ন্যায় পড়িয়াছিলেন, অনেক অনুসন্ধানের পর তবে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। হরি বলিয়া কাণের কাছে চীৎকার করিলে তবে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইত। ভাবাবেশে মত্ত হইয়া একবার কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। শরীরের পঞ্চেন্দ্রিয় এক সময় পূর্ণমাত্রায় স্ব স্ব বিষয় ভোগের জন্য অধৈর্য্য হইলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, তেমনি তাঁহার দর্শন, আলিঙ্গন, প্রেমরসপান ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা পিপাসা সমস্ত বলিষ্ঠ অশ্বের ন্যায় এক সময় নানাদিকে ধাবিত হইত। এত বড় প্রেমিক অদ্বিতীয় ভক্ত হইয়া চৈতন্যদেব এরূপ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতেন ইহা সহসা মনে হইলে কিছু আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়, কিন্তু তাহার কোন কারণ নাই। ভগবানের ঐশ্বর্য্য অনন্ত, রূপগুণে তিনি অসীম, ভক্তের সীমাবদ্ধ হৃদয় তাহা কত ধারণ করিবে? যতই উন্নতি ততই লালসা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হরিপদারবিন্দের মকরন্দ লোভে তাঁহার চিত্তভৃঙ্গ নিরন্তর উন্মত্ত থাকিত; মস্তিষ্ক সেই পদকমলের মধুর আঘ্রাণে সর্ব্বক্ষণ বিঘূর্ণিত হইত; এবং হৃদয় সেই পরম প্রভুর চরণালিঙ্গনের জন্য অবিশ্রান্ত প্রধাবিত হইত। কিছু দিন পরে রথযাত্রার সময় গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসিলেন, তখন ঐ সকল মহাভাবের উত্তেজনা কিছু নরম পড়িল।

কালিদাসের কথা।

রঘুনাথ দাসের পিতৃব্য কালিদাস কিছু দিন পরে বৈরাগী হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের পথ অনুসরণ করেন। এ ব্যক্তি কেবল বৈষ্ণবের পত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাইয়া ভক্তি উপার্জ্জন করে। বৈষ্ণব গৃহস্থদিগকে তিনি উত্তম সামগ্রী উপহার দিয়া পরে তাহাদের বাটীতে প্রসাদ খাইয়া

আসিতেন। কেহ কোন আপত্তি করিলে গোপনে তাহার আঁস্তাকুড় হইতে পাত কুড়াইয়া খাইতেন। এইরূপে গৌড়ের শত শত সাধুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শেষে নীলাচলে প্রভুসমীপে তিনি উপস্থিত হন। বৈষ্ণবের প্রসাদ ভক্ষণে তাঁহার এমনি আস্থা ছিল যে, ঝাড়ু ঠাকুর নামে এক ভুঁইমালি জাতীয় বৈষ্ণবকে আম্র উপহার দিয়া পরে লুক্কায়িতভাবে তাহার এবং তাহার পত্নীর পরিত্যক্ত খোসা ও আঁঠি ইনি চুষিয়া খান। কালিদাসকে গৌরাঙ্গ যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈরাগী হইতে হইলে কত দূর অভিমানশূন্যতা, দীনতা আবশ্যক, কালিদাস তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

সৎপ্রসঙ্গ।

চৈতন্য জননীর তত্ত্ব লইবার জন্য প্রায় বর্ষে বর্ষে হয় জগদানন্দ না হয় দামোদরকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। তিনি যখন কাহারো কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার অর্থ এই ছিল যে, সে ব্যক্তির ভক্তি আছে কি না। একবার দামোদরকে জিজ্ঞাসা করেন, মাতার বিষ্ণু-ভক্তি কিরূপ দেখিলে বল? স্পষ্টবক্তা দামোদর এ জন্য গৌরকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, শচীর ভক্তির কথা আবার তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাঁহার প্রসাদেইত তোমার ভক্তি? চৈতন্য ইহা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভক্তিমান্ ব্যক্তিকেই তিনি ধনবন্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন, তদ্ভিন্ন অভক্ত জীব সকলেই তাঁহার মতে দরিদ্র। উড়িয়া এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিত। কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে তিনি বলিতেন, যাও আগে তুমি লক্ষেশ্বর হও, যে লক্ষপতি তাহার গৃহেই আমার ভিক্ষা হয়। ইহা শ্রবণে এক দিন কেহ কেহ বলিলেন ঠাকুর, লক্ষের কথা দূরে, সহস্রও কাহারো ঘরে নাই। তুমি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না কর, তবে আমাদের গৃহাশ্রম পুড়িয়া ছারখার হউক! গৌরচন্দ্র বলিলেন, কাহাকে আমি লক্ষেশ্বর বলি তাহা কি জান? প্রতি দিন যে ব্যক্তি লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করে তাহাকেই আমি লক্ষেশ্বর বলি, তাহারই গৃহে আমার ভিক্ষা হয়, অন্য ঘরে আমি যাই না। তাঁহাকে আহার

করাইবার জন্য অনেকে লক্ষ হরিনাম জপের ব্রত গ্রহণ করিলেন, চৈতন্যেরও উদ্দেশ্য সফল হইল। লৌকিকভাবে অসার সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন না। হরিনাম আর ভক্তি, ইহা ছাড়া তাঁহার মুখে অন্য কথা ছিল না।

অবতারত্বের প্রতিবাদ।

এক দিন সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া বৃদ্ধ অদ্বৈত গোসাঞী বলিলেন, এস ভাই আজ প্রাণ ভরিয়া চৈতন্যাবতারের মহিমা গান করি। যিনি সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন, যাঁহার প্রসাদে আমরাও সর্ব্বত্র পূজিত হইলাম, এস অদ্য তাঁহার গুণ সকলে মিলে গাই। কোন প্রকার প্রশংসাসূচক কথা কিম্বা গান শুনিলে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরক্ত হইতেন তাহা আমরা জানিতাম, এই জন্য আমরা ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। শেষ প্রাচীন সাধুর অনুরোধ সকলকে রক্ষা করিতে হইল। অদ্বৈত নিজেই এক নূতন পদ রচনা করিয়া উৎসাহের সহিত ভক্তসঙ্গে তাহা গাইতে লাগিলেন। ইহাতে সকলের বিশেষ আমোদ বোধ হইল। কীর্ত্তনের মহাধ্বনি শ্রবণে গৌর তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তগণের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। আনন্দের বেগে ভয় লজ্জা সমস্ত বিলুপ্ত হইল, শেষে তাঁহার সম্মুখেই এই গান সকলে গাইতে লাগিলেন। দাস্য ও মধুর ভাবই চৈতন্যের ধর্ম্ম, দাস ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া তাঁহাকে কেহ সম্বোধন করিতে পারিত না, তথাপি অদ্বৈতের চক্রে পড়িয়া সে দিন এই প্রকার ঘটনা হয়। চৈতন্য যখন তাঁহার নিজের স্তুতিবাদ শুনিলেন, তখন লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া আপনার বাসায় চলিয়া গেলেন। অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন শেষ করিয়া বৈষ্ণব সাধুগণ প্রভুর আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি তখন রাগ করিয়া ঘরের মধ্যে শুইয়াছিলেন; বন্ধুদিগকে নিকটে সমাগত দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেল, ওহে শ্রীবাস পণ্ডিত! আজ তোমরা ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন না করিয়া কি গান গাইলে বুঝাইয়া বল দেখি শুনি? অন্য সকলে তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া ভীত হইল, কিন্তু শ্রীবাস আকাশের দিকে করতল বিস্তার করিয়া বলিলেন, সূর্য্যের

প্রকাশ কি কখন হস্তে আচ্ছাদিত হয়? এমন সময় ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং অন্যান্য স্থানের শত শত যাত্রী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া গৌরগুণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল, মহা ধুম উঠিল, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবেরা হাসিতে লাগিলেন। শ্রীবাস বলিলেন, এখন কি করিবে? আমিত আর এ সকল লোককে ডাকিতে যাই নাই। উহারা কি বলিতেছে শুন দেখি? তখন প্রভু নির্ব্বাক্ হইলেন। প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের এরূপ আচরণ দেখিয়া আমি সে দিন একটু চটিয়াছিলাম। অদ্বৈতকে স্পষ্টই বলিলাম, ঠাকুর নিজে যাহা অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন তোমরা তাহা শুনিবে না কেন? এ তোমাদের ভারি অন্যায়! আমাকে অজ্ঞ এবং সামান্যবুদ্ধি বিবেচনা করিয়া সে কথা কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। বরং কেহ কেহ ক্রোধবিস্ফারিত কুটিল নয়নে আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই অর্ব্বাচীন মূর্খ এ কথা কি বুঝিবি? চপলতা প্রকাশ করিস্ না। এ প্রকার করিবার কারণ কি আমি শেষ ভাবিতে লাগিলাম। তবে কি চৈতন্য প্রভু অপেক্ষা ইহাঁরা বেশী জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক হইলেন? পরে বুঝিলাম, মনুষ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব, আর ঈশ্বর, এই উভয়ের প্রভেদ লোকে সাধারণতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য তাহারা সাধু মহাপুরুষকে অন্য কোন শব্দে এবং ভাবে প্রশংসা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া শেষ ঈশ্বর বলিয়া মনোক্ষোভ দূর করে। নতুবা আমি দেখিয়াছি, ঈশ্বররূপে গৃহীত ভক্ত মহাজনেরা যেমন জীবের ক্ষুদ্রত্ব এবং ভগবানের মহত্ত্ব এই দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহ পারে না। সুতরাং তাঁহারা যেমন ইহার প্রতিবাদ করেন এমন কে করিতে পারে? যাঁহারা ভগবানের অনুপম গৌরব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যের হীনতা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছেন, এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহা শুনিবে কে? তিনি যদি এক গুণ বিনয় প্রকাশ করেন, শিষ্যগণ সহস্র গুণ করিয়া তাঁহাকে বাড়াইয়া তোলে, একা তিনি কি করিবেন? যদিও আমি নির্ব্বোধ ছিলাম, কিন্তু এ বিষয়ে গৌরের যথার্থ ভাব আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতাম।

একবার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে আসিয়াছিলেন। এখানে অন্নবিচার নাই দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন; ইহারা সকলেই ব্রহ্ম হইয়াছে না কি? গৌরাঙ্গের শিষ্যগণ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ বড় গ্রাহ্য করিতেন না। ভক্তচূড়ামণির নিকট থাকিয়া এ বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর লীলাসমাপ্তি।

চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র ভাব সকল দেখিয়া প্রধানতম ভক্তগণ পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন তাঁহারা বলিতেন, স্বয়ং ভগবান্ হরি ভক্তের আনন্দ এবং সুখ সম্ভোগের জন্য গৌরদেহে ভক্তাবতার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক অর্থে ইহা বাস্তবিক কথাই বটে, ঈশ্বরত্ব অবতীর্ণ হইয়া নবদ্বীপে এই ভক্তাবতার উৎপন্ন করিয়াছিল। মানবজীবনে এরূপ অসামান্য ধর্ম্মোন্মত্ততা কেহ কখন দেখে নাই, এই জন্য তাহাকে কি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবে কেহ কিছু বুঝিতে পারিত না। ফলতঃ জীব যখন ভগবানের একান্ত অনুগত হয়, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন আর ভেদাভেদ বড় থাকে না; যেন অগাধ সিন্ধুনীরে স্রোতস্বতী মিলিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। সে ভাবের মানুষ যাহা বলে এবং যাহা করে তাহা অলৌকিক।

একদা জ্যোৎস্নাশোভিত পূর্ণচন্দ্র-বিরাজিত নিশীথ সময়ে ভক্তগণসঙ্গে গৌরচন্দ্র টোটা নামক পর্ব্বতোপরি বিহার করিতে করিতে চন্দ্রিকারঞ্জিত সুনীল জলধিবক্ষঃ দর্শন করত সেই দিকে চলিয়া যান। সকলেই আমোদে মত্ত, কোন্ দিক দিয়া কখন তিনি প্রস্থান করিলেন কেহ জানিতে পারেন নাই। পরে অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্র উপকূলে জনৈক ধীবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে দামোদরকে সে বলিল, আমি মৎস্য ধরিতে গিয়া একটি মৃত দেহ জালে পাইয়াছিলাম, তাহাকে স্পর্শ করিয়া অবধি ভয়ে আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আতঙ্কে অঙ্গ কাঁপিতেছে, সে ব্রহ্মদৈত্য কি ভূত হইবে জানি না, তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, অস্থি মাংসের বন্ধনী সমস্ত শিথিল, প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার শরীর, মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করে, আমাকে সেই ভূতে পাইয়াছে। আমি মরিলে আমার স্ত্রী

পুত্র কি খাইবে? হায়! আমি দুঃখী লোক, একাকী রাত্রিতে মাচ ধরিয়া বেড়াই; এখন ওঝার বাড়ী যাইতেছি, তোমরা ওদিকে যাইও না। স্বরূপ তাহার কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সেই দিকে দৌড়িতে লাগিলেন, গিয়া দেখেন যে গৌরচন্দ্র স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া আছেন, দেহ পাংশুবর্ণ হইয়াছে, ঠিক যেন শবাকৃতি। সকলে মিলে উচ্চৈঃস্বরে কর্ণের নিকট হরিধ্বনি করাতে তখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। প্রভু অচেতনাবস্থায় সমুদ্রের জলে ভাসিতেছিলেন, ঐ ধীবর জালে ধরিয়া উপরে তোলে, তাহাতেই সে দিন রক্ষা পান।

এইরূপে তিনি কখন একাকী রজনীযোগে বাহির হইয়া যান, কোন দিন বা দ্বার খুলিতে না পারিয়া দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ করেন; ইহা নিবারণের জন্য শঙ্কর নামক একটি শিষ্য কিছু দিন প্রহরিরূপে নিযুক্ত ছিল। সে আবার অতিশয় নিদ্রালু, মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িত। কিন্তু এত যে বিরহোন্মাদ, প্রেমপ্রলাপ, তথাপি প্রভু জননীকে বিস্মৃত হন নাই। জগদানন্দ দ্বারা প্রতি বৎসর বস্ত্র ও প্রসাদ মাতার জন্য পাঠাইতেন। সমুদ্রের জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইয়া শেষ অবস্থায় জগদানন্দকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া বলিয়া দেন যে, জননীকে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলিও। তাঁহার আজ্ঞায় আমি নীলাচলে আছি। বাউল হইয়া ধর্ম্ম নাশ করিলাম, এ অপরাধ যেন তিনি গ্রহণ না করেন। শচীমাতার জন্য বস্ত্র এবং প্রসাদ ও অন্যান্য ভক্তগণের জন্য প্রসাদ লইয়া জগদানন্দ নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে পৌঁছিলেন। প্রত্যাগমন কালে তাঁহা দ্বারা অদ্বৈত চৈতন্যকে এই তর্জ্জা বলিয়া পাঠান, "প্রভুকে কহিবা আমার কোটি নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার। বাউলকে কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল। বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছেন বাউল।" এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

মহাভাবের প্রভূত প্রভাবে মহাপ্রভুর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ আর কত সহ্য করিবে? স্বর্গের

জ্বলন্ত অগ্নি তাহাকে জীর্ণ শীর্ণ এবং ক্রমশঃ বিকল করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি পুণ্যের শরীর বলিয়া এত দিন সে অমরাত্মার গুরুভার বহন করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার এক দিনের প্রেমাবেশে, ভাবের মত্ততায় অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়, জীবনী শক্তি নিঃশেষিত হয়। ঈদৃশ ধর্ম্মভাব সচরাচর কাহারো হয় না, যাহার হয় সে অধিক দিন বাঁচে না। ঠিক অণ্ডের মধ্য হইতে পক্ষীশাবক যেমন যথাসময়ে অণ্ডভেদ করিয়া বাহির হয়, তেমনি গৌরপ্রেমবিহঙ্গ সেই চিদাকাশস্থিত পক্ষিমাতার ক্রোড়ে বিচরণ করিবার জন্য পার্থিব দেহপিঞ্জর ভগ্ন করত নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহলোক পরিত্যাগের অল্প কাল পূর্ব্বে পরম অন্তরঙ্গ চিরসঙ্গী স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে এক দিন এই শেষ কথা কয়েকটি বলিয়া যান ;—কলিতে নামসঙ্কীর্ত্তনই ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির পরমোপায়, ইহাতে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। তদনন্তর নিজকৃত এই শ্লোক কয়টি আবৃত্তি করিলেন্।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি, স্তত্রার্পিতো নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"॥ হে ভগবন্! ভক্তগণের বাঞ্ছানুসারে নানাবিধ নাম ধারণ করিয়া তাহাতে তোমার সমগ্র শক্তি সঞ্চার করিয়াছ। শয়নে ভোজনে যাহার যখন ইচ্ছা সে এই নাম লইয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে। এমন কৃপা তোমার, তত্রাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ সে নামে আমার অনুরাগ হইল না। স্বরূপ ও রামানন্দকে বলিলেন, কিরূপে নাম লইলে প্রেমোদয় হয় তাহা বলি শ্রবণ কর। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা! অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" যে ব্যক্তি উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম মনে করে, বৃক্ষ যেমন সহিষ্ণু হইয়া সকল সহ্য করত ফল ফুল ছায়া দান করে, তদ্রূপ সমুদায় সহ্য করে এবং আপনি অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক হরি কীর্ত্তনীয় হন। অনন্তর নিজের দীনতা ও প্রেমহীনতার জন্য খেদ করিয়া এই শ্লোকটি পড়িলেন। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরু-

হৈতুকী ত্বয়ি"। হে জগদীশ! ধন জন সুন্দরী কবিতা এ সকল কিছুই প্রার্থনা করি না, জন্ম জন্মান্তর তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি হউক এই কামনা। পরে অন্যকৃত আর একটি শ্লোক পড়িয়া এইরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। হে প্রভো! আমি তোমার নিত্য দাস, তোমায় বিস্মৃত হইয়া আমি ভবার্ণবে পড়িয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণধূলির সমান কর। পুনরায় দীনতা এবং উৎকণ্ঠা সহকারে নিজ-কৃত এই শ্লোক দ্বারা প্রার্থনা করেন, "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা, পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥" হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়নে গলদশ্রুধারা বহিবে এবং কবে আমার কণ্ঠ অবরোধ এবং বাক্য গদ্গদ হইবে, এবং কবে আমার বপু পুলকে পরিপূর্ণ হইবে। তদনন্তর নিজের রচিত এই শ্লোক পড়িয়া লীলা শেষ করিলেন। "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" হায়! গোবিন্দবিরহে আমার সমুদয় জগৎ শূন্য, নিমেষ যুগপ্রায় এবং নয়ন বর্ষাকালের ন্যায় হইল।

কৃষ্ণ আমার প্রাণধন জীবন, তাঁহাকে আমি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে রাখিব, তাঁহার সেবাই আমার সর্ব্বস্ব ইত্যাদি বাক্য কহিয়া কয়েক দিবস পরে প্রভু দেহলীলা সংবরণ করেন। বিরহোত্তাপে সন্তপ্ত হইয়া প্রেমের প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে ক্রমে সেই সুবর্ণ প্রতিমা গৌরতনু বিলীন হইয়া গেল। সে বিরহে নিরাশার নাম গন্ধ নাই, বাহিরের সন্তাপের মধ্যে ভিতরে এক প্রকার অপূর্ব্ব শান্তি অনুভূত হইত।

প্রেমবিরহোন্মাদ শেষে এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহাতেই শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। পার্থিব ভঙ্গুর দেহে আর কত সহ্য হইবে? কখন কোন্ ভাব হয়, কোথায় কখন চলিয়া যান এই ভয়ে সর্ব্বদা সকলকে সশঙ্কিত থাকিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে এক দিন আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না। একবার সমুদ্র হইতে ধীবরকর্ত্তৃক রক্ষা পান, শেষে তদীয় প্রিয় সঙ্গী গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে গিয়া আর প্রত্যাগমন করিলেন না। চৈতন্য এই স্থানে মধ্যে মধ্যে গিয়া

গদাধরের মুখে ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার অদর্শন সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গদাধরের আশ্রমে গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে প্রভু প্রবেশ করিলেন আর ফিরিলেন না। তিনি গোপীনাথের দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। ইদানীং আর জ্ঞান চৈতন্য বড় থাকিত না। সর্ব্বদা প্রেমে বিহ্বল, বিশেষ কথাবার্ত্তাও কহিতে পারিতেন না। ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন।

আমরা গৌরবিরহে নিতান্ত ব্যথিত এবং শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিছু দিন পর্য্যন্ত সে দুঃখ ভুলিতে পারি নাই। যাঁহাকে এক দিন না দেখিলে ভক্তগণ মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অস্থির হইতেন, যাঁহার প্রফুল্ল মুখচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যে তাঁহারা অহোরাত্র বিহার করিতেন, চিরদিনের জন্য তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কিরূপ শোকাবহ অবস্থা তাহা স্মরণ করিলেও প্রাণ আকুল হয়। সোণার সংসার আনন্দের মেলা, চির মহোৎসবের ক্ষেত্র একবারে শোকসিন্ধুনীরে মগ্ন হইল। প্রেমের পূর্ণশশধরকে ভীষণ কাল আসিয়া একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মবিধানপ্রবর্ত্তকের তিরোভাবে অনুবর্ত্তিগণের কি অবস্থা হয় তাহা এই পুরাতন পৃথিবী বার বার নিরীক্ষণ করিয়াছে। সেই নবদ্বীপের চন্দ্র অষ্ট চত্বারিংশ বৎসর কাল সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া নীলাচলে অস্তমিত হইল। নীলাচলধাম অষ্টাদশ বর্ষ পরে মৃত্যুর আকার ধারণ করিল। তিনি যেন সকলকে বলহীন জীবনশূন্য করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। প্রেমোৎসবের রজনী প্রভাত হইল, বসুন্ধরা বিষাদ ও ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, কেবল ছায়া মাত্র হৃদয়পটে জাগ্রৎ রহিল। আর সে লোকসমারোহও নাই, নৃত্য কীর্ত্তন জয়োল্লাসের ভীষণ গর্জ্জনও নাই, কালের নিষ্ঠুর দণ্ডাঘাতে প্রেমের প্রতিমা চূর্ণ হইয়া গেল। এক জনের অভাবে যেন সমুদায় দেশ শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আমাদের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে চির দিনের জন্য যে এক প্রেমের গৌরাঙ্গ রাখিয়া

গেলেন তাহা দ্বারা আমাদের শোক সন্তাপ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ক্রমে অপনীত হইতে লাগিল। যেখানে ভক্তির অশ্রু প্রেমের মত্ততা, ভাবের উচ্ছ্বাস, এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন, সেই খানেই অমরাত্মা গৌরচন্দ্র বিদ্যমান। হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের ভাবরসোম্মত্ত সুন্দর ছবি খানি তৎক্ষণাৎ নয়নের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখনও তাঁহাকে আমি হরি সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে দেখিতে পাই। মহাপুরুষগণ বাষ্পীয় পোতের ন্যায় যখন যে নদীবক্ষ বিদারণ করিয়া চলিয়া যান তখন তাহার পশ্চাদ্ভাগের উভয় কূল উত্তাল তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হয়। গৌরপ্রেমের জাহাজ বঙ্গদেশ, উৎকল কম্পিত করিয়া পুরীর উপকূলে অন্তর্দ্ধান হইল, কিন্তু ইহার পশ্চাদ্বাহিনী তরঙ্গমালা বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর এই কয়টি স্থানের কতকগুলি শাক্ত ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ব্যতীত সকল জাতীয় নরনারী গৌরপ্রেমরাজ্যের প্রজা, ইহার বিস্তৃতি বহু দূর পর্য্যন্ত। এই সকল দেশের পনর আনা লোক বৈষ্ণবধর্ম্মপথের পথিক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এক জন মহাপুরুষের কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! ইহার ভিতর এখনও জীবনীশক্তি আছে, সেই জন্য সামান্য সামান্য নূতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপসংহার।

মহাপ্রভুর দেহলীলা শেষ হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ প্রভুর বিরহে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ পুরীধামে থাকিয়া তাঁহার লীলা চিন্তা করত শোকে মগ্ন রহিলেন। আমার সহযোগী বন্ধুগণও ক্রমে দুই একটি করিয়া পরলোকগত হইলেন, আমি সেই মহাপুরুষের জীবনলীলা অনুধ্যান করিতে করিতে এমনি বিবাগী হইয়া পড়িলাম যে, দেশে ফিরিয়া আসিতে আর ইচ্ছা হইল না। তদবধি ক্রমাগত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে কিছু দিন হইল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি। লীলাসমাপ্তির পর যে সকল ভক্ত যথার্থ গৌরপ্রেমিক ছিলেন তাঁহারা হরিনাম প্রচারে প্রবৃত্ত রহিলেন, কেহবা সাধন ভজন নামসঙ্কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, প্রভুর দেহ ত্যাগের পর দ্বিতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত ভাবের স্রোত একরূপ ছিল, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ, নরোত্তম ঠাকুর; রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ, বীরভদ্র, অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ গৌড় ও উৎকল দেশে বিগ্রহ স্থাপন এবং নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রেম ভক্তি প্রচার করেন, তাহার পরেই ক্রমশঃ বিকৃত হইতে লাগিল। এখন কেবল বাহিরের ঠাট মাত্র বজায় আছে ভিতরকার পদার্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। যে পবিত্রতার জন্য চৈতন্য এত শাসন করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তাহাই অগ্রে নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা আবার ব্যভিচার দুষ্ক্রিয়াকে ধর্ম্ম বলিয়াও ব্যাখ্যা করে। হায়! চারিদিকে গৌরলীলার চিহ্ন সকল দীপ্যমান পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ তিনি নাই, তাঁহার ভাবের ভাবুক তেমন মানুষও আর পাওয়া যায় না। মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন এই সমস্ত জনপদকে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল জাগ্রৎ রাখিয়াছিলেন, তাঁহার

পদার্পণে পৃথিবী ধন্য হইয়াছিল। সহস্র সহস্র নর নারী ভক্তিরস-পানে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। তেমন শুভ সময় আর কি ঘটিবে? এক সময়ে এতাধিক উন্নতচরিত্র সাধুর সমাগম এক দেশে আর কি দেখিতে পাইব? তেমন দেবের দুর্ল্লভ ভক্তিসুধা আর কি এখানে জন্মিবে? গৌরচন্দ্রের জীবন, এক খানি অখণ্ড ভক্তিরসময় প্রেমের প্রতিমা। কি স্বর্গের অমৃতই তিনি আনিয়াছিলেন! তেমন নৃত্যও আর দেখিব না, তেমন হরিসঙ্কীর্ত্তনও আর শুনিব না। প্রেমরসসিন্ধু গোরাচাঁদের প্রেমাশ্রুবিগলিত মুখচন্দ্রমা পরকালের মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে আর সে আনন্দ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। গোলকের সম্পত্তি হরিপ্রেমামৃত বিলাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন, কিছু দিন পরে সে বস্তু তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, দুর্ভাগ্য মানব তাহা রাখিবে এমন স্থান নাই, কেবল চিত্তপটে সেই প্রেমলীলার সুন্দর ছবি এখন জাগিতেছে। পাপানলে সন্তপ্ত, সংসারভারে আক্রান্ত, জরা দারিদ্র্য শোক দুঃখে অভিহত মানব মানবী কোথায় এক বিন্দু ভক্তিরসপানে হৃদয়কে শীতল করিবে, তাহা না করিয়া তাহারা সংসারের দুঃখ ক্লেশ সংসারের দ্বারাই মোচন করিতে চায়, পারে না, তথাপি হরিভক্তি অন্বেষণ করিবে না, গৌরপ্রেমের দৃষ্টান্ত লইবে না। তাহারা পদে পদে বিপদাপন্ন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও হরিপদে শরণ লইতে চাহে না। চক্ষের সম্মুখে এমন সুন্দর পথ, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়াও দেখিবে না, সে দিকে চলিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিবে। হায়! কি দুর্ভাগ্য, হরিপ্রেম হরিভক্তি ভিন্ন আর কি কিছু সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী পদার্থ পৃথিবীতে আছে? অযোগী অজ্ঞানী বেদবিমুখ সাধারণ নরনারী এবং শুষ্কহৃদয় কুতার্কিকদিগের জন্য এমন সহজ পথ গৌরাঙ্গ দেখাইয়া গেলেন, তথাপি মূঢ় জীবের দুর্নিবার বাসনা ঘুচিল না। যাহারা দুই দিন পরে ফেলিয়া পলাইবে, স্নেহ মমতা দেখাইয়া ইহ পরলোক নাশ করিবে, সেই অসার কুটুম্বভরণে জীবন চলিয়া গেল, অথচ তাহাদেরই অনুরোধে মনুষ্য মায়ামুগ্ধ হইয়া কত পাপ করিতেছে, দিনান্তে একবার ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে স্মরণ করিবে তাহারও অবসর

পায় না! ঈশ্বর, সাধু, ধর্ম্ম, পরকালকে ফাঁকি দিতে গিয়া তাহারা আপনারা বিড়ম্বিত প্রচারিত হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিলেও বুঝে না। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! পক্ষান্তরে কত ব্যক্তি কেবল ভেকমাত্র অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। তাহাদের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্ম নাই এ কথা তাহারা বলিতে দিবে না, কারণ তাহাদের অহঙ্কার ধর্ম্মাভিমান তাহা স্বীকার করিতে দেয় না।

আমি বহুকাল পরে দেশে আসিয়া জন্মভূমি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, নবদ্বীপের শাক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে ভক্তির প্রতি বিদ্বেষ ভাব তদ্রূপই রহিয়াছে। সেই পুরাতন সুরধনী গঙ্গার নির্ম্মল প্রবাহ গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে শোভা পাইতেছে, শত শত আখড়াধারী বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু যাঁহার নামে স্থানটি বিখ্যাত তাঁহার প্রকৃত ভাবের চিহ্ন মাত্র নাই। রাসপূর্ণিমার দিনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শবশিবে, মহিষমর্দ্দিনী বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, জয়দুর্গা প্রতিমা সকলের পূজা হয়, তাহাদের সম্মুখে বলিদান রক্তপাত, নাচ গান যথেষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ভিতর বিন্দুমাত্র সাত্ত্বিক ভাব আছে কি না সন্দেহ। টোলের ছাত্র ও পণ্ডিতদিগের এ বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ। ইহাঁরা গৌরচন্দ্রকে শচীপিসীর ছেলে বলিয়া এখনও বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। আধুনিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদিগের যত কিছু দুরাচার তৎসমুদায় যেন গৌরের দোষেই হইয়াছে এইরূপ মনে করেন। ফলতঃ এখানকার বৈষ্ণবগণের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। শাক্ত হিন্দুগণ তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করেন। বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে আর হরি ভজনা করিবে, গৌরাঙ্গের এই উচ্চ আদেশ, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তাহারা গ্রহণ করিল, বৈরাগী হইয়া হরিকে ভজিল না।

শান্তিপুরের গোস্বামীদিগের মধ্যেও নিতান্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাঁহাদের পরিবার সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে বৈষ্ণবত্বের হ্রাস হইয়া মূর্খতা এবং গরিব অশিক্ষিত শিষ্যগণের উপর বৈষয়িক প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। গোস্বামীগণ শিষ্যব্যবসায়ী হইয়া ধর্ম্মের

নামে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করত উন্মার্গগামী হইয়াছেন। গৌরাঙ্গকে ইহারাই হত্যা করিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। বঙ্গীয় দুঃখী শ্রমজীবী সাধারণ লোকেরা হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ রাশি রাশি অর্থ দিয়া ইহাঁদের সেবা করে, আর ইহাঁরা তাহাদের অর্থে সুখ বিলাস চরিতার্থ করেন; এক্ষণে গুরু শিষ্যের মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়ী বৈরাগী এবং গোস্বামীদিগের মধ্যে গৌরের ভক্তিপ্রভাব কিছুমাত্র নাই কেবল তাহা নহে, তাহার বিপরীত যাহা কিছু সমুদায়ই বিদ্যমান আছে; কিন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণব এবং ভক্তিপথাবলম্বী ভদ্র, কৃষক, নবশাক জাতির মধ্যে কিছু কিছু ভক্তির সরল মধুর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহাহউক, এ সকল দোষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও গৌরশিষ্য বৈষ্ণববৃন্দকে আমি ভালবাসি, এবং ইহাদের ভিতরে গৌরপ্রেমের মধুর আঘ্রাণ কিছু কিছু পাই; সাধু বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিনয়, ভাবুকতা, নামসঙ্কীর্ত্তন, সাধুসেবা এবং মদ্যমাংস পরিত্যাগ, সারল্য, দীনভাব, সাত্বিকতা এখনও যাহা কিছু আছে তদ্দর্শনে সুখী হওয়া যায়। ভগবান্ করুন যেন সাধারণ বৈষ্ণবসমাজের জীবনহীন বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে আবার ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়।

যদিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শনে আমি নিতান্ত ব্যথিত হইলাম, কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি বিধানবাদী ব্রাহ্মগণের ভক্তি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার ধর্ম্মভাবের অনুকরণস্পৃহা দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাঁরা জ্ঞানগর্ব্ব, বুদ্ধিবিচার, কুতর্কের পথ ত্যাগ করিয়া যে ভক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক হরিসঙ্কীর্ত্তন-প্রণালী ধরিয়াছেন ইহা বড় সুখের বিষয়। সকল শাস্ত্রের সার এই হরিনাম, এবং ভক্তিই একমাত্র পরম সাধন, সমস্ত ধর্ম্মরাজ্য নিষ্পেষণ করিলে এই দুইটী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিভক্তিই জীবনের অন্ন, পান, সুখ, সম্পদ, স্বর্গ এবং মুক্তি, ভবপারের ইহাই একমাত্র সার সম্বল। ইহার ভিতর অনন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বলোকপালক ভগবান্ বিরাজিত। তাঁহাকে যদি একান্ত মনে বিশ্বাস করা যায়, এবং তাঁহার চরণপদ্মের মধুপানে যদি সুদৃঢ় রতি জন্মে, তবে আর জীবের অপ্রাপ্য কি থাকে? এই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে

অনেক জিতেন্দ্রিয় সাধুচরিত্র সদ্বিদ্বান্ অনুরাগী যুবাও দেখিলাম। ইহাঁরা সভ্যতার অভিমান, বিদ্যার সম্ভ্রম মর্য্যাদা, জাতি কুলে জলাঞ্জলি দিয়া লজ্জা ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যে দীন বেশ ধারণ করিয়াছেন, ইহা দ্বারা পরিত্রাণের আশা জীবিত হইবে। কিন্তু ইহাঁরা জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন উন্নত এবং বিশুদ্ধ ব্যবহার বিষয়ে যেরূপ উদার, কার্য্যানুষ্ঠান-সম্বন্ধে যেমন তৎপর এবং উৎসাহী, ভাবসম্বন্ধে তেমন নহেন। আমি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় মাটিতে গড়াগড়ি দেয় তাহা কোথা? এ সব সভ্য ভব্যতা, ব্যাকরণ বিজ্ঞানের কর্ম্ম নয়। যদি মধুপান করিতে চাও, তবে মাত আর মাতাও। প্রেমস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্তমানস হও, যথাসময়ে গম্যস্থানে উপনীত হইবে। ভাবরসে মন ডুবিয়া তাহাতে সাঁতার খেলিবে তবেত বলি ভক্তি! বাহিরের জ্ঞান চৈতন্য, ভাবনা চিন্তা দূর হইবে, ভাবে বিহ্বল এবং মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিবে তবেত বুঝিব প্রেমের মত্ততা। মত্ততা না জন্মিলে পাপও যায় না, পুণ্য প্রেমের আস্বাদনও পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার না কি ইহাও শুনিতে পাই যে, "হরি" "চরণপদ্ম" "গুরু" "সাধুভক্তি" "দৈবাণী" "কৃপা" "যুগধর্ম্ম" "বৈরাগ্য" "মত্ততা" ইত্যাদি শব্দ শুনিলে অনেকে বিরক্ত হন, এবং ইহাকে কুসংস্কার মনে করেন? ও হরি! এখনও এমন অবস্থা আছে? বাস্তবিক আমি ও দেখিয়াছি, মাথা যেন নোয় না, ঘাড় উপরের দিকেই আছে! তবে ইহারা ঈশ্বরের সঙ্গে হস্ত কম্পন করিতে চান নাকি? কালধর্ম্মে এ সব দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কথার ভাবার্থ না লইয়া ব্যাকরণ ধরিয়া গোলযোগ, এ প্রকার ভক্তিবিমুখতা গৌরাঙ্গ দেখিলে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম করিবে তাহাতে আবার লজ্জা অপমান বোধ! দেবদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল বাক্য বক্তৃতা জ্ঞান যুক্তি লইয়া যাহারা ধার্ম্মিক হইতে চান তাঁহাদের ভাব গতি আমি বুঝিতে পারি না। কর্ত্তব্য জ্ঞানের দোহাই দিয়া কত লোকই না নিকৃষ্ট সংসারবাসনা চরিতার্থ করিতেছে! মানব-প্রকৃতিসুলভ দোষ দুর্ব্বলতা আমি ধরিতেছি না,

কিন্তু দেববাণী, দেবদর্শন, প্রেমভক্তি, বিনয়, বৈরাগ্য, ভাবুকতা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, গুরুভক্তি, সাধুসেবা এ সকল যদি তর্ক যুক্তির অধীন হয়, বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে যদি বিলাসবাসনা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে অনেককে সংসারকূপে ডুবিয়া মরিতে হইবে, অথচ সেই অবস্থাই ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে। যা হউক, বঙ্গদেশের ভাবী আশা এখন এই নব্য যুবক সদাশয় ব্যক্তিদিগের উপর অনেক নির্ভর করিতেছে। শাক্ত, হিন্দু ও গৌরভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ সাধু বিদ্যমান আছেন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য বিনয় ভক্তি সহকারে আমি অভিবাদন করি, এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল নবীন ও প্রবীণ সাধু সজ্জন আপনাদের এবং অন্যের মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে সরলচিত্তে সাধন ভজন ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন তাঁহাদিগকেও আমার শত শত প্রণিপাত। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায়ে যাহারা ধর্ম্মের নামে নিকৃষ্ট বাসনা চরিতার্থ করিতেছে তাহারা তিরস্কার ও দয়ার পাত্র সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবন যেরূপ চিত্রিত হইল, তাহার সমুদায় অঙ্গ-গুলি একত্রিত করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ইহা একটি অখণ্ড অবিমিশ্র প্রেম পদার্থ, ধর্ম্মোন্মত্ততার আদর্শ। ইহাতে ধর্ম্মবিজ্ঞান, কর্ম্মকাণ্ড, নীতিশাস্ত্র বিস্তারিতরূপে বিকসিত হয় নাই। এ প্রকার প্রমত্ত জীবনের নিয়তিও তাহা নহে। গৌরজীবনের লক্ষ্য অন্যবিধ যাহার অনুরূপ ভাব কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মায়া-মুগ্ধ কঠিন জড়বৎ বঙ্গসমাজকে আলোড়িত করিয়া তাহাকে ভক্তিরসে আর্দ্র করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা সফলও হইয়াছে। এক খানি অবিভক্ত সাধু জীবন ত্রিশ বৎসর কাল চক্রের ন্যায় নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইয়াছিল। যত দিন তিনি মর্ত্তাধামে ছিলেন তত দিন ধর্ম্মার্থী-দিগকে নিদ্রা যাইতে দেন নাই, দিবানিশি দুর্জ্জয় স্রোতের মুখে সক-লকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির যে প্রবল আঘাত অনুভূত হইত তাহার বেগ বহু সাধকের জীবনকে কম্পিত করিয়া তুলিত। একটী বিস্তৃত প্রেমরাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তিনি অহর্নিশি তড়িতের প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেন।

চৈতন্য সাকারবাদী ছিলেন, প্রথম বয়সে বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করিতেন, তদনন্তর প্রেমোন্মাদের অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনুধ্যান করত ভক্তির অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার অনেক ব্যবহার আচরণ পক্ষপাতশূন্য উদার ছিল, ধর্ম্মানুরাগের আতিশয্য বশতঃ সঙ্কীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা তাঁহার ভিতরে স্থান পাইত না, এই জন্য কাহারো কাহারো সংস্কার থাকিতে পারে যে তিনি নিরাকারবাদী এক ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সাকারবাদী হওয়াতে তাঁহার ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য পবিত্রতার কোন ব্যাঘাতও জন্মে নাই। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনপ্রিয় নিরাকারোপাসক একেশ্বরবাদিগণ হয়ত এ কথা শুনিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, গৌরচন্দ্রকে পৌত্তলিক, কুসংস্কারাপন্ন ভাবান্ধ বলিয়া আপনাদিগকে উন্নতমনা মনে করিবেন। তাহা করুন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক নিরাকারবাদীকে দয়ার পাত্র বোধ হইবে। নিরাকারবাদীর বুদ্ধি যুক্তি কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে ইহা মানি, কিন্তু অন্ধকারময় আকাশ এবং চৈতন্যশক্তিহীন বিচিত্র কল্পনার পূজা করিয়া শত শত ব্রহ্মজ্ঞানী কার্য্যেতে জড়বাদীর ন্যায় পার্থিব পদার্থের সেবায় জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সমস্ত জীবন অন্বেষণ করিলে এক বিন্দু হরিভক্তিরস পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহাঁরা যে পৌত্তলিকতা সাকারোপাসনার জন্য অন্যকে হেয় জ্ঞান করেন, সেই পৌত্তলিকতাদোষে অনেক সময় নিজেরা দোষী; কেন না, কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি এবং কল্পিত ভাব বিশেষ এক অর্থে উভয়ই সমান। যাঁহারা ঘনচিৎস্বরূপকে যথাযথরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া কেবল মতে নিরাকারবাদ স্বীকার করা অতিশয় বিড়ম্বনার বিষয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানে কি করিবে, প্রত্যক্ষ দর্শন কোথায়? পক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ সাকারবাদী হইলেন তাহাতেই বা কি? তিনি

জড়মূর্ত্তির সহিত একত্রীভূত করিয়া ঈশ্বরের দয়া প্রেম পবিত্রতার সৌন্দর্য্য এমন স্পষ্টরূপে সর্ব্বত্র অনুভব করিতেন যাহা কত শত নিরাকারবাদী কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারিবেন না। তাঁহার এত মত্ততা আনন্দ উৎসাহ হাস্য ক্রন্দন কি দারু মৃত্তিকা প্রস্তরখণ্ডের গুণে? এ কথা বিশ্বাস করিতে পার না। আন্তরিক বিশ্বাস বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল, তাহার প্রকাশ এবং আলম্বন উদ্দীপন পরিমিত পদার্থে নিবদ্ধ ছিল। নিরাকারবাদীর সঙ্গে তিনি ভিতরে এক বাহিরে বিভিন্ন। কিন্তু চৈতন্যের বাহ্যাবলম্বন সম্বন্ধে বুদ্ধিগত ত্রুটি থাকিলেও তাঁহার ভিতরের বিশ্বাস ভক্তি এত বেশী ছিল যে, তাহাতে বুদ্ধির অভাব আর অভাব বলিয়া বোধ হয় নাই। সচ্চিদানন্দ জ্বলন্ত জাগ্রৎ হরির রূপসাগরে যিনি অনুক্ষণ সন্তরণ করিতেন সামান্য ভ্রমে তাঁহার কি করিবে? অবিশ্রান্ত যাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উচ্ছ্বাস, পুণ্যের অগ্নি, মহাভাবের মত্ততা প্রদীপ্ত থাকিত, বাহিরের ভুল ভ্রান্তি কি সে স্রোতের মুখে তিষ্ঠিতে পারে? ভগবৎ তত্ত্ববিষয়ে তাঁহার মত যেরূপেই থাকুক, তিনি আপনার অভীষ্ট দেবতাকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাহা দ্বারা দিন রাত্রি কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইত তিনি তাহা জানিতেও পারিতেন না। তেমন করিয়া ভাল বাসিতে, শ্রদ্ধা ভক্তি দান করিতে কয় জন নিরাকারবাদী সক্ষম হইবেন? ভালবাসায় একবারে পাগল, তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ আকুল, এক ভালবাসাতেই তাঁহার সকল অভাব মোচন হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞানীর শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান যুক্তি বিচার শুনিয়া কি পিপাসিত ব্যাকুল চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? প্রাণের গভীর তৃষ্ণা, আত্মার দুঃসহ পাপ যন্ত্রণাও তাহা দ্বারা বিদূরিত হয় না। নিরাকারবাদী আবার যখন মাতিয়া মাতাইবে. কাঁদিয়া কাঁদাইবে, বৈরাগী হইয়া অন্যকে বৈরাগী করিবে, তেজস্বী পবিত্রচরিত্র হইয়া পাপ হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করিবে, উপাস্য দেবতার দর্শন স্পর্শন শ্রবণ আলিঙ্গনসুখ সম্ভোগ করিয়া প্রেমনীরে ভাসিয়া যাইবে; যখন তাহার মুখমণ্ডলে ব্রহ্মের পবিত্র জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইবে, "এই আমার ঠাকুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান" এইরূপ বলিয়া যখন সে সকলকে রোমাঞ্চিত করিবে, তখন

তাহার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানানুমোদিত নির্ম্মল ধর্ম্মশাস্ত্রের মহিমা বুঝিব। তদ্ভিন্ন কেবল বাক্য আর তর্ক শূন্য অন্ধকার নিরাকারবাদ, ইহাতে মানবহৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

চৈতন্যদেব যদি গভীর জ্ঞানগর্ভ বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত বিস্তীর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান কিম্বা সাধনপ্রণালী প্রচার না করিলেন, তবে তিনি কি করিলেন? তিনি দুই বাহু তুলিয়া আনন্দভরে একবার নাচিলেন, আর চারিদিকের লোকেরা ছায়াবাজীর পুত্তলিকার ন্যায় নাচিতে লাগিল। তিনি হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার রবে কাঁদিলেন, আর অমনি নয়নজলে সকলের বক্ষ ভাসিল। একবার ভীম গর্জ্জনে হরিনামের হুঙ্কারধ্বনি করিলেন, অমনি মোহনিদ্রাচ্ছন্ন মানবসমাজ সচকিত নেত্রে জাগিয়া উঠিল। বক্ষ বিস্তার করিয়া দীনাত্মা পতিত চণ্ডালদিগকে আলিঙ্গন দিলেন, তাহা দেখিবামাত্র সকলের প্রাণ বিমুগ্ধ হইল। আর কি করিলেন? নির্জ্জনে সজনে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া মাতিলেন এবং সকলকে মাতাইলেন; সংসারবাসনার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, সন্ন্যাসী হইয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিলেন, ভাবে মত্ত হইয়া ভূতলে পড়িলেন, আচণ্ডাল দুঃখীদিগকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক কোলে গ্রহণ করিলেন, অস্পৃশ্য অনাথ দীনজনের তাপিত মস্তকে হস্ত রাখিলেন, পাপীর দুঃখে দুঃখী হইয়া রোদন করিলেন, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইলেন, বিনয়ী হইয়া পণ্ডিতগণের গর্ব্ব খর্ব্ব এবং নীচ জাতিকে উচ্চ করিলেন, আর কি করিবেন? প্রত্যেক কার্য্যে শত শত লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি কিছু শুনাইলেন না, সমস্ত দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার উদ্দাম নৃত্যের ভীষণ পদাঘাতে পাষণ্ডহৃদয় কম্পিত হইত, ব্যাকুলতার উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে বুক ফাটিয়া যাইত; তাঁহার প্রেমবিস্ফারিত বদনকমলের উল্লাসকর হাস্যধ্বনি শ্রবণে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত; ভাবরসে আন্দোলিত পরমসুন্দর তনু দর্শন করিলে মন নৃত্য করিত। যে ভাবে জননী ও সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন সেই জ্বলন্ত বৈরাগ্যের আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিলে

প্রাণ এখনও উদাস হয়। পতিতপাবন হরির নামে তিনি অদ্ভুত ভোজবাজী করিতেন ইঙ্গিতমাত্র শত শত লোক নামরসে উন্মত্ত হইত। জ্ঞান শিক্ষা দিবার তাঁহার অবসর ছিল না, ভগবান্ হরির সৌন্দর্য্য-রসে মজিলে মানুষ কি রূপ অবস্থাপন্ন হয় তাহাই কেবল তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মাভিনয়ের যে অংশ অভিনয় করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তাহা তিনি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্রূপ দর্শন করিয়া তাহাতে প্রমত্ত হওয়া তাঁহার নিয়তি ছিল। দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন দ্বারা সেইরূপ গুণে মজিয়া তিনি পাগল হইয়াছিলেন। এমন সুমিষ্ট ব্রহ্ম যাগ, ভগবানের সহিত জীবের এতাদৃশ প্রেমব্যবহার কোন ধর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম্মবিধানের এইটিই প্রধান উদ্দেশ্য, যেমন তাঁহার বৈরাগ্য তেমনি ভাবুকতা! যদি কেহ তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে বন্ধুগণে মিলিত হইয়া মৃদঙ্গ করতালের সহিত গভীর স্বরে হরিনাম গান কর। তাহাতে যখন মন মাতিবে, হৃদয় গলিবে, নয়নে অশ্রুধারা বহিবে, শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইবে, এবং প্রেমময় হরির মাধুর্য্যরসসাগরে চিত্ত ডুবিবে তখন সেই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কিম্বা নামরসের মত্ততার মধ্যে প্রেমনয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিও, দেখিবে যে সোণার গৌরাঙ্গ দুনয়নে আনন্দধারা বর্ষণ করিতেছেন আর নাচিতেছেন। এই তাঁহার বাহিরের রূপ। ভিতরের রূপ ইহা অপেক্ষা আরো মনোহর। যখন যে হরিনামরসে মজে তখনই সে গৌরভাবাপন্ন হয়; যখন যে বিষয় বাসনা ছাড়িয়া প্রেমামৃত পান ও বিতরণ করে, তখনই সে চৈতন্য হয়; তিনি ভক্তের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, কোন কালে আর সে রূপের ধ্বংস হইবে না।

ভক্ত রাজ চৈতন্যচন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক মতসম্বন্ধে বঙ্গীয় যুবকগণ যেরূপ ভাব পোষণ করিতে ইচ্ছা করেন করুন, কিন্তু তাঁহার নিকট যাহা শিক্ষা করিবার আছে তাহা হইতে কেহ যেন বঞ্চিত না হন। তিনি সাকারে প্রেম ভক্তি অর্পণ করিতেন তোমরা না হয় তাহা নিরাকারে অর্পণ কর। সুযুক্তি সুশাস্ত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃত মত লইয়া

সন্তুষ্ট থাকিলেত চলিবে না। গৌরাঙ্গ যে প্রগল্‌ভা ভক্তি প্রেম মহাভাব বৈরাগ্য অনাসক্তি সাধুভক্তি শিষ্যবৎসলতা ভ্রাতৃপ্রেম বিনয় উৎসাহ জিতেন্দ্রিয়তা তেজস্বিতা ঐকান্তিক আস্থা সাধুভাব জীবেদয়া নামেভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মভাব প্রদর্শন করিয়া গেলেন তাহা পৃথিবী চিরকাল তাঁহার পদতলে পড়িয়া শিক্ষা করুক। এ সকল ভাব বিনষ্ট হইবার নহে, ভগবদ্ভক্তগণের উপেক্ষণীয়ও নহে।

দয়াল শ্রীচৈতন্য পৃথিবীকে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শিখাইয়া গিয়াছেন, যদি কেহ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া সুখী এবং পুণ্যাত্মা হইতে চাও, তবে কখন একাকী কখন সবান্ধবে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর। নামসঙ্কীর্ত্তনের মধুরতা যিনি সম্ভোগ করিয়াছেন তিনি কখন ইহা ভুলিতে পারিবেন না। আমি এ সম্বন্ধে যে সকল লোকের কথা বলিয়া আসিলাম তাঁহাদেরত কথাই নাই, নিজেও অনেক সময় এই হরিনাম সুধারস পানে অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ করিয়াছি। ইহাতে অত্যন্ত আরাম লাভ করা যায়। অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে ইহা উপহাসের বিষয় মনে হইতে পারে, কিন্তু ভিতরে রসে পরিপূর্ণ। ভক্তের কর্ণে মৃদঙ্গ করতাল সহ হরিনামধ্বনি অতীব মধুর বলিয়া প্রতীত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখ, প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিতে পারিবে।

দয়াময় হরি এইরূপে তাঁহার প্রিয় ভক্ত গৌরাঙ্গের দ্বারা অভূতপূর্ব্ব ভক্তিলীলা প্রদর্শন করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি দণ্ডবৎ, এবং চৈতন্য প্রভুর চরণেও পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিয়া এক্ষণে আমি বিদায় লই।

গৌরাঙ্গদেবের পরবর্ত্তী সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মহাত্মা গৌরাঙ্গদেবের দেহলীলা সংবরণের অব্যবহিত পরে বৈষ্ণবসমাজের অবস্থা কিরূপ হইল, তিনি আপনার মহজ্জীবনের স্থায়ী ফল পৃথিবীতে কি রাখিয়া গেলেন, প্রধান ভক্তগণ কি প্রণালীতে কাল হরণ করিতে লাগিলেন, কি ভাবে কাহা কর্ত্তৃক এ দেশে গৌরের ভক্তিভাব প্রচারিত হইল এ সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য বোধ করি পাঠকগণের মনে নিতান্ত কৌতূহল থাকিতে পারে। প্রথম সংস্করণে আমি এ কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি "ভক্তিরত্না-কর" গ্রন্থ পাঠে কিছু কিছু তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই এ স্থলে বিবৃত হইল।

চৈতন্য গোসাঞী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ভক্তসমাজের কীদৃশ অবস্থা হয় তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এই সময় তিনি পুরী গৌড়দেশ বৃন্দাবন পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করেন। গৌরের পরবর্ত্তী সময়ে ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার বিষয়ে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য ইহাঁকে তৎকালে অনেকে গৌরপ্রেমাব-তার বলিয়া বিশেষ সম্মান প্রদান করিত। ভাগীরথী তটে চাখুন্দিয়া নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়, পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। গঙ্গাধর নবদ্বীপের কোন অধ্যাপকের চৌপাঠির ছাত্র ছিলেন। ইনি যুবাকালে গৌরের প্রভাব স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মোহিত হন। নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে গঙ্গাধর তাঁহার শোকে নিতান্ত উন্মাদপ্রায় হইলেন, এই হেতু তাঁহার পরে নাম চৈতন্যদাস হয়। শ্রীনিবাস এই চৈতন্যদাসের শেষ বয়সের সন্তান। পিতার মুখে

ইনি গৌরগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রেমে একবারে মগ্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর শ্রীনিবাস মাতামহাশ্রয় জাজি গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গৃহে থাকিয়াই তিনি গৌর প্রেমে হৃদয়কে অভিষিক্ত করেন ; পরে শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি রঘুনাথ প্রভৃতি গৌরপ্রিয়গণের পরামর্শে পুরীধামে গৌরদর্শনার্থ বহির্গত হন। তখন গৌড়দেশ এবং পুরীর পথে চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রায় বার মাসই গমনাগমন করিতেন ; উৎকলবাসীরা ইহাঁদের দেখিলেই চিনিতে পারিত। শ্রীনিবাসের অপরূপ লাবণ্য, মনোহর ভক্তিভাব পথিক-দিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। পথিমধ্যে যাহাকে দেখেন তাহার নিকটে তিনি পুরীর সমাচার জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে চলিতে লাগিলেন। কতক দূরে আসিয়া এক দিন শুনিলেন প্রভু লীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে শ্রীনিবাস একেবারে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দুঃখেতে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন, কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, এমন সময় স্বপ্নাদেশ হইল। গৌর দেখা দিয়া বলিলেন, প্রত্যাগমন করিও না, নীলাচলে যাও তথায় গদাধরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। শ্রীনিবাস তদনুসারে পুরীতে উপস্থিত হন এবং স্থানে স্থানে ভক্তবৃন্দের শোকভগ্ন মলিন মুখ দর্শন করেন। পণ্ডিত গদাধরের বাসায় গিয়া দেখিলেন তিনি প্রভুশোকে নিরন্তর হাহাকার করিতেছেন, বর্ণ মলিন, দুই চক্ষে অজস্র বারিধারা বহিতেছে, তথাপি শ্রীনিবাসকে পাইয়া পণ্ডিতের চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি অনুভব করিল। তার পরে শ্রীনিবাস বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাসায় গিয়া দেখেন যে তিনি রামানন্দের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর বিরহশোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শিখি মাহিতি, মাধবী মাহিতি, কানাই খুলিয়া, স্বরূপ, পরমানন্দ সন্ন্যাসী প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসায় বসিয়া কাঁদিতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গৌরশোকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, রঘুনাথ দাসও শোকে মুহ্যমান হইয়া বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়াছেন, সকলেই যেন শোকেতে একেবারে আচ্ছন্ন। ইহাঁরা সেই দুঃখের সময় শ্রীনিবাসকে

পাইয়া সুখী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের রূপ গুণ ভক্তিভাব দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল, সমস্ত ভক্তগণ ইহাকে এত স্নেহ করেন এ ব্যক্তিত তবে সামান্য লোক নয়! ইহার ভিতরে গৌরাঙ্গ বিহার করিতেছেন।

অনন্তর আচার্য্য শ্রীনিবাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নবদ্বীপ দর্শনে যাত্রা করেন। পথে আসিতে শুনিলেন নিতাই অদ্বৈত প্রভুও অদর্শন হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার শোকানল আবার প্রদীপ্ত হইল। আচার্য্য নবদ্বীপ পৌঁছিয়া দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষীণ মলিন দেহে দিন রাত্রি যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। চক্ষে নিদ্রা নাই, অহর্নিশি পতিশোকে আকুল, ভূমিশয্যায় শয়ন, সোণার অঙ্গ ধূলায় মলিন হইয়া গিয়াছে। যে তণ্ডুলের দ্বারা নাম জপ সংখ্যা পূরণ হয়, তাহাই মাত্র আহার। সেই পবিত্র তণ্ডুল রন্ধনপূর্ব্বক দেবতাকে নিবেদন করিয়া অপরাহ্ণে আহার করিতেন। আহারের শুদ্ধচারিতা বিষয়ে ইহা একটি নূতনবিধ সুদৃষ্টান্ত, ইহা বৈরাগ্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠাও বটে। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিবাসের নয়নানন্দকর রূপ এবং অপূর্ব্ব ভক্তি প্রেম সন্দর্শনে অতিশয় পরিতৃপ্ত হন। তৎকালে ভ্রাতৃগণসহ শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর, গদাধর দাস, দামোদর, সঞ্জয়, বিজয় প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। শচীমাতা ইতঃপূর্ব্বেই পরলোকগত হন। নবদ্বীপের তাৎকালিক শোভা সৌন্দর্য্য, লোকসমারোহ, ধর্ম্মভাব, কীর্ত্তনোৎসাহ দেখিয়া আচার্য্যের মন মুগ্ধ হইয়াছিল।

নবদ্বীপ হইতে আচার্য্য শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর পত্নী শ্রী ও সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সেখানেও দেখিলেন অদ্বৈতের অদর্শনশোকে পারিষদবর্গ রোদন করিতেছে। অনন্তর তিনি খড়দহে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় নিত্যানন্দের পত্নীদ্বয় এবং বীরভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় জাজিগ্রামে চলিলেন। তৎপর নানাস্থানের ভক্তগণের অনুমতিক্রমে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথায় যাইতে যাইতে পথিমধ্যে রূপ সনাতনের পরলোকগমন বার্ত্তা শুনিয়া তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন বৃন্দাবনে

শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ আচার্য্য, হরিদাস আচার্য্য, রাঘব নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান ভক্ত জীবিত ছিলেন। ইহাদিগকে দর্শন করিয়া শ্রীনিবাসের চিত্ত কতক পরিমাণে শান্তি লাভ করে। তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষিত হন এবং শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এখানেও দেখিলেন গৌর নিতাই অদ্বৈত এবং রূপ সনাতনের শোকে সকলে অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন, কেহ বা পাগলের ন্যায় পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারের ভার শ্রীনিবাসের উপর অর্পিত হয়, এই জন্য তিনি বিশেষ যত্নের সহিত গোস্বামিগণের প্রণীত ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। কিছু দিন পরে তাঁহাকে সকলে বিশেষ স্নেহ অনুগ্রহের সহিত গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন এবং কতকগুলি গ্রন্থ গাড়ি বোঝাই করিয়া সঙ্গে দিলেন। শ্যামানন্দ এবং নরোত্তম ঠাকুরও এই সঙ্গে দেশে প্রত্যাগমন করেন। বিদায়কালে সমুদায় ভক্তমণ্ডলী শ্রীনিবাসকে ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারকার্য্যে বিশেষরূপে অভিষেক করিয়াছিলেন এবং গাড়ির সঙ্গে মথুরা পর্য্যন্ত কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। আচার্য্যের জ্ঞানপ্রতিভা বিদ্যা-বত্তা দেখিয়া পণ্ডিত ভক্তগণ অতিশয় আহ্লাদিত হন।

পথে আসিতে বনবিষ্ণুপুরের নিকট ঐ সকল গ্রন্থ চুরি যায় এবং প্রধান চোর সেই সুযোগে ভক্তিপথ আশ্রয় করে। ঐ স্থানে বীরহাম্বীর নামে এক দস্যুরাজ কতকগুলি দুষ্টলোক দ্বারা পথিকগণের ধন বস্ত্রাদি হরণ করিত। গ্রন্থের গাড়ি দেখিয়া রাজা মনে করিল অনেক মূল্যবান্ সামগ্রী আছে, এই সংস্কারে লোকদিগকে বলিয়া দিল যে তোমরা কৌশলে দ্রব্যাদি হরণ করিবে, কিন্তু কাহারো প্রাণ হানি করিবে না। রঘুনাথপুরের নিকট বাবাজীরা রাত্রিকালে নিদ্রিত আছেন এমন সময় দস্যুগণ গ্রন্থের গাড়ি লইয়া পলায়ন করিল। এই স্থান পঞ্চকোট পর্ব্বতের নিকট, সীতারামপুর ষ্টেশনের কিছু দক্ষিণে; এখানে অদ্যাপি দস্যুভয় কিছু কিছু আছে। রাজা হাম্বীর অত্যন্ত আশার সহিত গ্রন্থের আবরণ উন্মুক্ত করিল এবং এক সিন্ধুক দেখিয়া

মহা আহ্লাদিত হইল। লেখা আছে যে, ভক্তিগ্রন্থের মহিমায় রাজার মন মোহিত হয় এবং বাবাজীদিগের দর্শনলাভের জন্য সে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া নানাস্থানে লোক প্রেরণ করে। এ দিকে নিদ্রাবসানে আচার্য্য গ্রন্থ না দেখিয়া মহাদুঃখিত হইলেন; কে লইল, কোথায় গেল, কিছুই সন্ধান না পাইয়া সঙ্গিগণের সহিত বহু শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি শ্যামানন্দ ও নরোত্তমকে গৃহে পাঠাইয়া আপনি গ্রন্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিলেন। রাজা গ্রন্থ চুরি করিয়া অবধি ধর্ম্মের জন্য এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, দস্যুবৃত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব শ্রবণে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। তাহার গৃহে প্রতিদিন ভাগবত পাঠ হয় ইহা শুনিয়া শ্রীনিবাস তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভক্তিরসরঞ্জিত দিব্যকান্তি অবলোকনে রাজার মন মোহিত হইল এবং বুঝিল যে ইনিই সেই ব্যক্তি হইবেন যাঁহার গ্রন্থ আমি চুরি করিয়াছি। তখন সে আচার্য্যের পদতলে পড়িয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যেখানে যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থাদি রাখিয়াছিল সেইখানে তাঁহাকে লইয়া গেল। শ্রীনিবাস তাহার দীনতা অনুতাপ ব্যাকুলতা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এখন হইতে রাজা হাম্বীর পরম বৈষ্ণব হইয়া যায়। তাহার স্ত্রী পুত্র পারিষদবর্গ সকলেই ক্রমে বৈষ্ণব হইয়াছিল। আচার্য্য দুই মাস এখানে থাকিয়া জাজি-গ্রামে গমন করিলেন এবং ছাত্রদিগকে ভক্তিশাস্ত্র শিখাইতে লাগি-লেন। এ সময়ে শ্রীনিবাসকেই বঙ্গদেশের প্রধানপ্রচারক বলিতে হইবে। কিছু দিন পরে দাস গদাধর নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কাটোয়ার গঙ্গা-তীরে যেখানে গৌর সন্ন্যাসী হন সেই স্থানে বাস করেন এবং তথায় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। শ্রীখণ্ডবাসী সরকার নরহরিও ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে লীলা সংবরণ করেন। এই দুই জনের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে মহামহোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয় প্রধান ভক্তগণ সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। গদাধরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী কাটোঁয়ার প্রধান বৈষ্ণব, তিনি মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে

নবদ্বীপের প্রাচীন ভাগবত যে কয় জন তখন জীবিত ছিলেন তাঁহারাও আসিয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতের পুত্র কৃষ্ণমিশ্র এবং অচ্যু-তানন্দ, খড়দহ হইতে বীরভদ্র, ক্ষেতুর গ্রাম হইতে নরোত্তম স্ব স্ব পারিষদগণ সমভিব্যাহারে কাটোঁয়া নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। শত শত ভক্তের সমাগমে ঐ সকল দেশ আন্দোলিত হইয়াছিল। গদাধরের মহোৎসবে মহা সমারোহের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তন হয়। এখানকার উৎসব সাঙ্গ করিয়া সকলে শ্রীখণ্ডে আগমন করেন। তথায় নরহরির মহোৎসবেও যথেষ্ট সমারোহ হইয়াছিল। এই উপলক্ষে জাজি গ্রামে শ্রীনিবাসের গৃহে কীর্ত্তন উৎসব হয়। এক একটি মহোৎ-সব তখন ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ উপায় ছিল।

বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথমে ভাগীরথীর দুই ধারের লোকসকল বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এ দিকে খড়দহ পানিহাটী সপ্তগ্রাম হালিসহর কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি, তার পর শান্তিপুর অম্বিকা নবদ্বীপ কাটোঁয়া শ্রীখণ্ড জাজিগ্রাম, পদ্মার ধারে ক্ষেতুর বুধরি পর্য্যন্ত; এই সকল স্থানে প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণের আশ্রম ছিল। নরোত্তম ঠাকুর পূর্ব্বে এক জন রাজবংশীয় ছিলেন; পরে পরম বৈরাগী হইয়া ক্ষেতুর গ্রামে আশ্রম এবং দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে একটি মেলা হইয়া থাকে। নরোত্তম সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। বুধুরিতে রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ কবিরাজ, কাটোঁয়ায় যদুনন্দন, খণ্ডে রঘুনন্দন, জাজিগ্রামে শ্রীনিবাস, বনবিষ্ণুপুরে রাজা হাম্বীর; অম্বিকায় হৃদয়চৈতন্য, শান্তিপুরে অদ্বৈতের পুত্রদ্বয়, খড়দহে বীরভদ্র, এইরূপ লোকসকল স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে মহোৎসব উপলক্ষে সকলে সমবেত হইতেন। ক্ষেতুরে নরোত্তম ঠাকুর ছয়টি বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন করেন, তদুপলক্ষে মহা মহোৎসব হয়, তাহাতে জাহ্নবা দেবী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্য শ্রীনিবাস এই সকল মহোৎসবে এবং বিগ্রহ স্থাপন ক্রিয়ায় উচ্চাসন লাভ করিতেন। কিছু দিন বৈরাগ্য, ভক্তিসাধন ও প্রচারের পর বৈষ্ণব ভক্তগণের অনুরোধে তিনি বিবাহ করেন। কয়েক বৎসর পরে আর একটি বিবাহ করেন।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত চৈতন্য শ্রীনিবাস প্রত্যেকেরই দুই দুইটি করিয়া বিবাহ। তখন সতিনে সতিনে বড় ভগ্নীভাব ছিল, এখন তাহা দেখা যায় না। এ সময় ধর্ম্মপ্রচারের রীতি পদ্ধতি নিয়ম প্রণালী পরিষ্কাররূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। পুরী মথুরা বৃন্দাবন শান্তিপুর নবদ্বীপ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ, মৃত সাধুদিগের সমাধি ও লীলাবিলাসের স্থান দর্শন, বিগ্রহ স্থাপন, মহোৎসবে নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত শিক্ষা এবং পাঠ এই সকল দ্বারা লোক ধর্ম্ম সাধন করিত। শ্যামানন্দ এক জন সদ্গোপের ছেলে, ইনি উৎকলে প্রচার করিতেন, নৃসিংহপুরে ইহাঁর আশ্রম ছিল। নরোত্তম বৃন্দাবন হইতে আসিয়া ক্ষেতুরগ্রামে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ পুরী ভ্রমণ করিতেন। তিনি যখন উক্ত দুই স্থানে গমন করেন তখন প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। শেষ বারে শ্রীনিবাস নরোত্তম এবং রামচন্দ্র কবিরাজ এই তিন জনে নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। তদ্বৃত্তান্ত পাঠে নবদ্বীপের বিস্তৃতি বিষয়ে অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণব বাবাজীরা এই নবদ্বীপকে নিত্যকাল স্থায়ী এবং গৌরাঙ্গকে সর্ব্বাবতারের সার এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে নিত্যসিদ্ধ জীব বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি যত্ন পাইয়াছেন। কেহ বলেন নবদ্বীপ বিশ ক্রোশী, কেহ বলেন ষোল ক্রোশী। এত দূর হউক না হউক, নবদ্বীপ যে বঙ্গদেশের মধ্যে তখন প্রধান গণ্ডগ্রাম ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয় রামকেলীর পরেই নবদ্বীপ। যে সময় শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্দ্রের সহিত নবদ্বীপ পর্য্যটনে যান তখন প্রচীন ভক্তগণ সকলেই গত হইয়াছিলেন কেবল ঈশানকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। ঈশান শচী এবং গৌরের বড় প্রিয় সেবক। বালকগৌরাঙ্গ যখন কোন বস্তুর জন্য খোট ধরিতেন তখন ঈশান কেবল তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ ছিলেন। শূন্য নবদ্বীপের শূন্যগৌরগৃহে বৃদ্ধ ঈশান বসিয়া শোকে হাহাকার করিতেছেন আচার্য্য এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিলেন। পর দিন প্রাতে ইহাঁরা নবদ্বীপ দর্শনের জন্য ঈশানের সঙ্গে নানা স্থান ভ্রমণ করেন। গৌর কোন্ স্থানে কোন্

সময় কি করিয়াছিলেন ঈশান বিস্তারিতরূপে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। নবদ্বীপের যে পাড়ায় গৌরের জন্ম হয় তাহার নাম মায়াপুর। বর্ত্তমান নবদ্বীপ হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে ঐ নামে এক পল্লী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঈশান যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রতিপন্ন হয় বর্ত্তমান নবদ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম যথা সমুদ্রগোড়, চাঁপাহাটি, বিদ্যানগর, জাহান্নগর মামগাছি, মাতাপুর, বামুনপুখুর, বেলপুখুর, গাদিগাছা প্রভৃতি সমস্তই নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। ঈশান ঐ সকল গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

গৌরাঙ্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের সাধারণ অবস্থা যত দূর আমি বুঝিতে পারিলাম তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, গৌরাঙ্গের দেহলীলা শেষ হইবার অল্প কাল পরেই নিতাই অদ্বৈত সনাতন রূপ-গোস্বামীও পরলোক গত হন। জীবগোস্বামী পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং আরও বিশ পঁচিশ জন উচ্চপ্রকৃতির সাধু তাঁহার সঙ্গে একযোগে গ্রন্থ প্রচার, বিগ্রহসেবা, নামকীর্ত্তন, ভজন সাধন করিতেন। বৃন্দাবনে তখন এক প্রকার ভাবের জমাট মন্দ ছিল না। পুরীতে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা ক্রমে কেহ কেহ পরলোকে চলিয়া গেলেন, কেহ বা স্থানান্তরিত হইলেন। বঙ্গদেশে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের পুত্রগণ শ্রীনিবাসাদির সহিত কিছু দিন নানা স্থানে মহোৎসব নৃত্য গীতাদি করেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, গৌরজীবনবৃক্ষের যে কয়েকটি সুপক্ক সুফল প্রসূত হইয়াছিল, তাহা হইতে কয়েকটি ফলবান্ বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়; এবং তাহা হইতেও কয়েকটি সুচরিত্র বৈষ্ণব জন্মে, কিন্তু তার পরে ক্রমে মন্দ হইয়া আইসে। যদিও গৌরাঙ্গ ভক্ত-পরিবারকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সাধু-চরিত্র যে সকল সাধুচরিত্র উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মাভাস জগতে রহিয়া গেল। বৈষ্ণব বাবাজীদের ভাবুকতা, বিনয়, সাধু-ভক্তি, সেবা, নিষ্ঠা দেখিয়া আমার বড় লোভ হয়। এখন যদিও আধুনিকদিগের অনেক কথা এবং ব্যবহার উপহাসের বিষয় হইয়াছে, এই

কারণে যে তাহাতে সারতা নাই;—পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে এক জন যদি বলেন আমি নরাধম, আর এক জন বলিবেন আমি অধমাধম; ভিতরে কিছু থাকুক আর না থাকুক চখে মুখের ভাব ভঙ্গীতে দেখান হয় যেন ভাবে গদ্‌গদ্—কিন্তু মূলে আসল জিনিষ ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। চৈতন্যের শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের মধ্যে যদিচ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য বিনয় ভক্তির অধীন থাকাতে সমকক্ষদিগের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা বা দ্বেষ হিংসা প্রকাশ পাইত না; পরস্পর পরস্পরের অনুমতি না লইয়া কেহ কোন সাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। হয় জপ না হয় গ্রন্থপাঠ, হয় সৎপ্রসঙ্গ না হয় কীর্ত্তন ইহাতেই সাধুদিগের জীবন অতিবাহিত হইত, বিষয় কার্য্যের আলোচনা বা অসার গ্রাম্য কথা ছিল না। এ সকল ব্যক্তি যে কেবল সংস্কৃত ভাষায়, শাস্ত্রচর্চ্চায় পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, ইহাঁদের দ্বারা তৎকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের এবং কবিত্বেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কীর্ত্তনাঙ্গ গানের মধ্যে ভারি অঙ্গের রাগ রাগিণী কঠিন তাল মানের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলাবতী গীতে যেমন রাগ রাগিণী তাল, কীর্ত্তনে তদপেক্ষা কঠিনতর গান বাদ্য আছে। নরোত্তম প্রভৃতির গানে সকলে মোহিত হইতেন। প্রধান প্রধান বাবাজীদিগের জীবন ধর্ম্মভাব ভক্তিনিষ্ঠা সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এত বিনয় বৈরাগ্য ভাবুকতা হিন্দুস্থানে বোধ হয় কেহ কখন দেখে নাই। অল্পকালের মধ্যে যে বহু লোক এই পথের পথিক হয় তাহার প্রধান কারণ ঐ সকল সাধুদিগের সদ্দৃষ্টান্ত। তদ্ব্যতীত নিতাই গৌর অদ্বৈতের এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে কৃষ্ণ রাধার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহোৎসবাদি করিয়া এবং ভদ্রসমাজের লোকদিগের জাতিভেদপ্রথার উপর কোন হাত না দিয়া, বৈষ্ণব সাধুরা সাধারণ শ্রেণীর শূদ্র জাতীয় বহু শত নরনারীকে ভক্তিপথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কোন প্রতিবন্ধক নির্য্যাতন ত্যাগস্বীকার নাই, অথচ সাধন ভজনপ্রণালী বহু পরিমাণে সমতলকারী; সুতরাং সহজসাধ্য, এই জন্য শীঘ্র শীঘ্র দল বৃদ্ধি হইয়া

যায়। প্রথমতঃ শাক্তদিগের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ ভাব ছিল, শেষে জাতিভেদ রক্ষা এবং বিগ্রহসেবার মিলনভূমিতে তাহা তিরোহিত হইয়া গেল। মহোৎসব উপলক্ষে আহারাদিরও দিব্য আয়োজন হইত। ঠাকুরের প্রসাদী ক্ষীর সর ছানা মাখন মালপুয়া পূরী কচুরি মোহনভোগ ফলাদি যাহা এখন গুলিখোর গোস্বামী ঠাকুরদের চাট্‌নিরূপে পরিগৃহীত হয় তাহা ভোজন করিয়া তখনকার ভক্তগণ হৃষ্ট পুষ্ট হইতেন এবং মহা উদ্যমের সহিত সিংহরবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য গীত করিতেন। অনেক বিষয়ে সুবিধা ছিল বলিয়াই পরিণামে তাহার এত অপব্যবহারও ঘটিয়াছে। কিন্তু সরল নিরীহ বৈষ্ণবদিগের জীবন অনেক বিষয়ে অনুকরণীয়। তাঁহারা পরস্পর সমবিশ্বাসী ভক্তগণকে যেরূপ ভালবাসিতেন এক অন্যের আশীর্ব্বাদ প্রসন্নতা পাইবার জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা বিনয় প্রকাশ করিতেন; এক জন অপরের বিচ্ছেদ ও মিলনে যে ভাবে শোক ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া ভাবে প্রেমে মগ্ন হইতেন; তাহা দেখিলে এবং শুনিলে হৃদয় ঠাণ্ডা হয়। ভাবের উল্লাস, ক্রন্দনকোলাহল, কোলাকোলি, পদধূলি গ্রহণ, সেবা শুশ্রূষা কীর্ত্তনানন্দ এ সমস্ত এদেশের মধ্যে এক বিচিত্র দৃশ্য। চৈতন্যের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহা পূজা করা যদিও তাঁহার মতের বিপরীত আচরণ, কিন্তু স্থানে স্থানে এইরূপ বিগ্রহ স্থাপন দ্বারা বাবাজীরা তৎকালে গৌরের বর্ত্তমানতাকে অতিশয় জাগ্রৎ রাখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পরলোকগত সাধুগণের লীলাস্থান ও সমাধিক্ষেত্র ইহাঁরা যেরূপ ভাবের সহিত দেখিতেন তাহা পড়িলেও মনে উল্লাস জন্মে। এক দিকে ভিতরে তাঁহার অনুরূপ ভাবের প্রবাহ ছিল, অপর দিকে বাহিরে তাঁহার বাহ্য আকারের অনুরূপ প্রতিমাও ছিল, সুতরাং প্রভুর বিচ্ছেদের আঘাত তাদৃশ কাহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই। ইহা দ্বারা ফটোগ্রাফের অভাব বিমোচন হইয়াছিল। ইহাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন ঘটনাকে আধুনিক বা আকস্মিক বলিয়া ধরিত না। সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে নিত্য কালের যোগ স্বপ্নাদেশ, প্রতি কাজেই হইত। এক জন ভক্ত আর এক জনের সঙ্গে মিলিত হইবেন তাহার পূর্ব্বে স্বপ্নাদেশ চাই। যা কিছু

সংঘটিত হয় তাহা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা আছে, সময়মতে ভগবান্ তাহা ঘটাইয়া দেন, এই বিশ্বাস বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এত অধিক ছিল যে নবদ্বীপধামকে বেদ পুরাণের অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভগবানের কৃত নিত্য অখণ্ড শাসনপ্রণালীর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতাধিক উন্নতির পর বৈষ্ণব সমাজের ক্রমে কি দুর্দ্দশা ঘটিল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না, চক্ষের সম্মুখেই জাগিতেছে। তথাপি বাবাজীদের প্রভাব সাধারণ লোক দিগের মধ্যে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সামান্য চণ্ডাল নেড়া বাউল,—যে দিনে ভিক্ষা করে, রাত্রে হয়ত দুষ্কর্ম্মে রত হয়, তাহাকেও " বাবাজী " বলিতে হইতেছে। যিনি যে ভাবে ইহা বলুন কিন্তু বাবাত বলিতে হইল? ব্রাহ্মণদিগের এত যে অভিমান বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাহাদিগের মস্তকেও "দাস" উপাধি চাপাইল। ইহা ভিন্ন আরো সাধুগুণ কি হিন্দুসমাজের মধ্যে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত নাই? অবশ্য আছে। বৈষ্ণবপরিবারে এখনও এই মদ্যমাংসপ্রিয় সভ্যতার ভিতরে কত ব্যক্তি মিতাচারী নিরীহ বৈষ্ণব দৃষ্টিগোচর হয়। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না, কেবল এই মাত্র বলি, বর্ত্তমান কালের যুবক দল এই বাবাজীদের নিকট হৃদয়তত্ত্ব কিছু শিক্ষা করুন এবং শুদ্ধাচারী হইয়া নাস্তিকতা আর্য্যকুল-কলঙ্ক পাষণ্ডতা চূর্ণ করত দিনান্তে অন্ততঃ একবার ভক্তিভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করুন। আহার পান ভোগবিলাসের দাস হইয়া মাংসপিণ্ড দেহের শ্রীবৃদ্ধি করিলে কি হইবে? উপাধি সম্মান বিদ্যার গৌরবেই বা কি ফল দর্শিবে? আজ কাল রাজকীয় কিম্বা সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে বঙ্গবাসীদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য সংবাদপত্রে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়, বড় বড় সভা করিয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেওয়া হয়, কিন্তু তথাপি যুবাদলের নির্ব্বীর্য্যতা অপনীত হয় না। শিক্ষিত যুবা বিশ বৎসর বয়স পার হইতে না হইতে যেন বৃদ্ধ পিতামহের শীতলতাকে প্রাপ্ত হন। ইহার কারণ কি? মদ্য মাংস ভোজন দ্বারা কি নির্জ্জীবতা দূর হইবে? কখন না, তাহাতে কেবল বিলাসবাসনা মাদকপ্রিয়তাই বৃদ্ধি হইবে। কোন সৎকার্য্যের সঙ্গে ভগবানের নামগন্ধ নাই, কেবল

নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধির বাগ্মিতার প্রশংসা কিসে হয় সেই দিকেই দৃষ্টি। ইহাতে কি বাঙ্গালীর হাড়ে কখন উৎসাহ অগ্নি জ্বলিতে পারে? বলি শুন, ঘরে ঘরে খোল কর্ত্তাল তূরী ভেরি বাজাইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন কর, দেখিবে তাহাতে আগুন জ্বলে কি না। সভা করিয়া বক্তৃতা দাও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে কি জীবন সঞ্চার করিতে পারে? খুব মত্ততার সহিত খোল কর্ত্তাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ গান কর। এই সঙ্কীর্ত্তন বাঙ্গালীর ধাতুকে উষ্ণ করিবার পক্ষে এক প্রধান উপকরণ, তদ্ভিন্ন তাহার বিলাস ও সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইবার উপায় আমি কিছু দেখিতে পাই না।

পরিশিষ্ট।

ভক্তির ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের সুমিষ্ট ধর্ম্মজীবন, সরস ভাব এবং তৎপ্রদর্শিত মহাভাবময়ী ভক্তির বিচিত্রতা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আমি এই অমৃতপ্রবাহিনী ভক্তিনদীর উৎপত্তিস্থান এবং প্রাচীন বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হই, এবং ভারতের পৌরাণিক কাল হইতে আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের অবলম্বিত নানা ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্বেষণ করি, কিন্তু এ দেশের লোকের ঐতিহাসিক তত্ত্বসম্বন্ধে যেরূপ ঔদাস্য ভাব পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে আমার আশা সফল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা হউক, আমার পরম বন্ধু উপাধ্যায়জীর বিশেষ সাহায্যে এবং স্বকীয় অনুসন্ধানে এ বিষয়ে যত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই স্থলে বিবৃত হইল।

বিশ্বপালক আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে এই নদী সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যেমন ইহা একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীরূপে প্রশস্তাকারে পরিণত হইয়া মানবচক্ষের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, আদিমকালে এবং তৎপরবর্ত্তী বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তদ্রূপ স্পষ্টতঃ নয়নগোচর হয় নাই, এবং ধর্ম্মের একটী প্রকাণ্ড শাখার মধ্যেও ইহাকে কেহ গণনা করিতে পারিত না। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাণ্ডপতিকে বিধাতা, দৈনিক জীবনের নেতা এবং হৃদয়স্বামী গৃহদেবতা বলিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে হৃদয়ের কোমল অনুরাগ অর্পণ করার নাম ভক্তি। বৈদিক সময়ে এ ভাবের তাদৃশ বিকাশ

হয় নাই। তখন ঈশ্বরের সহিত জীবের নিকটতর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধ অনুভূতির সময় নহে। সৃষ্টির অদ্ভুত ক্রিয়া অবলোকনে প্রথমতঃ মানব-হৃদয়ে গভীর বিস্ময় রসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎকালে জগৎ-স্রষ্টাকে লোকে প্রধানতঃ অতি দূরের দেবতা, মহান্ শক্তিশালী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিত। যদিও কিছুদিন পরে তাহারা প্রত্যেক ভৌতিক ঘটনার নিয়ন্তা এবং নৈসর্গিক ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী বহু দেবতার উপর সমস্ত ঐশী শক্তি আরোপ করিত, কিন্তু সেই আদি-পুরুষ ভগবানের ব্যক্তিত্ব সত্তার সহিত সুমিষ্ট ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অনুভব করিয়া প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয় নাই। বেদ ও উপনি-ষদের কালে প্রকৃতিপূজা, কর্ম্মকাণ্ড, তপস্যা, যোগ সমাধি, ঐশ্বর্য্য বীর্য্যসম্পন্ন অপরিমেয় দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্তব স্তুতি গাথা, এবং কঠোর বৈরাগ্যানুষ্ঠানেরই আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। মানবস্বভাবের হৃদয়রূপ উর্ব্বরা ভূমিতে তখন ধর্ম্মবৃক্ষ সংরোপিত হয় নাই, সুতরাং সরস ভক্তিপ্রেমের ধর্ম্মের লক্ষণ বা অনুষ্ঠান সে সময়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৌরাণিক সময় হইতে বিষ্ণুপাদবিনিঃসৃত ঐ প্রচ্ছন্ন ভক্তিনদীর সঙ্কীর্ণ রেখা ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। জীবের প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং বিধাতৃত্ব শক্তির অবতার হইয়া যুগে যুগে ভূমণ্ডলে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন, পালনীশক্তির অবতার বিষ্ণু; তিনি জগৎপালনের জন্য যথাসময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এইরূপ বিশ্বাস এ সময় অঙ্কুরিত হইল। এই-জন্য বিষ্ণূপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা ভক্তির প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই; ভক্তিবৃত্তি স্বভাবতঃই কোন একটী স্পর্শনীয় মূর্ত্তির অন্বেষণ করে, তাহা না পাইলে তাহার পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। যাহাকে দেখা শুনা যায়, স্পর্শ আলিঙ্গন করা যায়, যাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করিয়া মন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হয়, এবং যাঁহার সঙ্গে লীলাবিহার আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য প্রাণ ক্রন্দন করে, ভক্তি এমন এক জাগ্রৎ সত্য শিবসুন্দর দেবতাকে চায়। এই আন্ত-রিক লালসা চরিতার্থের জন্য মনুষ্য আপনার সদৃশ ব্যক্তিতে ঈশ্বরত্ব

স্থাপন করিয়াছে। এই নিমিত্ত অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তির অনুরোধেই ঈশ্বর স্বর্গ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া মানবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বদ্ধ হইলেন।

এই সুমধুর ভক্তির ধর্ম্ম স্পষ্টরূপে কোন্ সময়ে স্বীয় মনোহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ইতিহাসের অভাবহেতু তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই; ইহা বহু পূর্ব্বাচরিত কঠোর শুষ্ক বৈরাগ্য; নির্গুণবাদ জ্ঞানকাণ্ড এবং নীরস যোগধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী বিপরীত ফল। ভক্তির আদি তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে দেবহুতির প্রতি কপিলের উপদেশের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ইহার উজ্জ্বলতা এবং পরিণতাবস্থা সর্ব্বজনবন্দনীয় যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সম্পন্ন হইয়াছে। এ পথে অগ্রসর হইতে হইলে বহু গুণালঙ্কৃত মহচ্চরিত্র নন্দতনয়কে আমরা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারি না। সুতরাং সংক্ষেপে ইহাঁর জীবনের গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব এস্থলে কিছু বলিতে হইল।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে বদ্ধমূল সংস্কার জন্মিয়া আছে তাহা উন্মূলন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাঁহার বিরোধী এবং উপাসক উভয় সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের দ্বারা এই সংস্কার পরিপোষিত হয়, সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি না হইলে এ বিষয়ের নিরপেক্ষ মত প্রচার হওয়া সম্ভাবিত নহে। অন্ততঃ উদারভাবে এ বিষয়ের অনুসন্ধান প্রবৃত্তিও যদি কাহারো মনে জাগ্রৎ হয়, তাহা হইলেও যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণের নামে এমনি জঘন্য সংস্কার লোকের মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে, ইহাতে হস্তক্ষেপ করাও একটি দুঃসাহসের কার্য্য। হয়ত কত লোক কুটিল ভ্রুভঙ্গির সহিত বলিবেন, "ইনিও ঐ দলের এক জন, কোন নীচ অভিপ্রায় সমর্থন করিবার জন্য রাসলীলায় হরির পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।" একে আমি চৈতন্যের অনুচর তাহাতে কৃষ্ণচরিত লিখিতে অগ্রসর হইতেছি, এস্থলে আমার উপর অসদভিসন্ধির আরোপ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা হউক, সে জন্য আমার কোন ক্ষোভ নাই। আমি এই মহাত্মার জীবনচরিত আলোচনা করিয়া তৎপরে তাঁহার উপর সচরাচর যে সকল গুরুতর দোষ আরোপিত হয় তদ্বিষয়ে

যুক্তিসঙ্গত মত প্রকাশ করিব। ভরসা করি, উদারচেতা প্রশস্তমনা ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে সহানুভূতি করিবেন।

কলিযুগের প্রারম্ভে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রের গণনানুসারে ৪৯৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ক্ষত্রকুলে মথুরানগরে যদুবংশাবতংস বসুদেবের ঔরসে দৈবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা দেবর্ষি নারদ কংসকে বলিয়াছিলেন, তোমার ভগ্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে তাহা কর্ত্তৃক তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু এই অষ্টম গর্ভ কোন্ গর্ভ হইতে গণনীয় তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই বলাতে কংসরাজ প্রথম হইতে ভগিনীর যাবতীয় সন্তানের প্রাণ বিনাশার্থ বসুদেব দেবকী উভয়কে কঠিন নিগড়ে কারা-বদ্ধ করিয়া রাখেন। ক্রমাগত সাতটি সন্তান ঐ নৃশংস নৃপতির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে বসুদেব নিতান্ত শোকার্ত্ত হন। পরে অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কোন সুযোগে রাত্রি কালে তিনি তাহাকে যমুনার পরপারস্থ গোকুল নগরের রাজা নন্দ ঘোষের আলয়ে লুকাইয়া রাখিলেন এবং যশোদার সদ্যঃ প্রসূতা এক কন্যা ছিল তাহাকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। বসুদেবের সঙ্গে নন্দরাজের বন্ধুতা ছিল। নন্দ যশোদা এই শিশু সন্তানকে অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন, এই জন্য তাঁহারা কৃষ্ণের পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়াছেন। দুরন্ত কংস ঐ শিশুকে বধ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। শেষ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে পুনর্ব্বার কারাবদ্ধ করত বহু ক্লেশ প্রদান করেন। নন্দরাজ কংসের করদ রাজ্যের এক জন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন।

দেবকীনন্দন প্রথম বয়স হইতেই অত্যন্ত প্রেমবান্ প্রিয়দর্শন হইয়া উঠেন। গোপালক বালকবৃন্দের সঙ্গে মিশিয়া তিনি নানাবিধ বাল্যক্রীড়া করিতেন। বয়স্য বালকেরা তাঁহাকে এত দূর ভালবাসিত যে, এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। বাল্যকালে কৃষ্ণ কিছু দিন বয়স্য-দিগের সঙ্গে প্রতিবাসীর ঘরে ঘরে ননী চুরি করিয়া খান। পরে গোচারণাদি করিয়া তদনন্তর ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়াদি

বহু প্রকার লীলা বিহার করেন। সহৃদয় প্রেমিক কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীদিগের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার ভিতরে এমন এক অসাধারণ প্রেম ছিল যাহা দ্বারা তিনি অতি সহজে সমবয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইতেন। কৃষ্ণের শরীরের গঠন সৌষ্ঠব, সুচিক্কণ নবঘন শ্যামবর্ণ, সুমধুর বংশীধ্বনি এবং প্রেম-ব্যবহার ব্রজবধূগণের প্রাণ মনকে মোহিত করিয়াছিল। ছিদাম সুবল প্রভৃতি বয়স্য গোপবালকেরা তাঁহার প্রেমে এমনি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা দ্রব্য বিশেষ ভোজন করিতে করিতে মিষ্ট বোধ হইলে তাহার কিয়দংশ কৃষ্ণের জন্য রাখিয়া দিত। বৃন্দাবন অতি রমণীয় স্থান, তথায় যমুনাপুলিনে তরুলতাসমাকীর্ণ বিহঙ্গকূজিত বনমধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ব্রজবালক ও বালিকাগণ সহ তিনি কৈশোর বয়স অতিক্রম করিয়া অক্রূরের সমভিব্যাহারে মথুরা যাত্রা করত তথায় কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্যপদ প্রদান করেন। তদনন্তর পিতা মাতার সঙ্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদের চরণ বন্দন করিয়া তিনি বলিলেন, আপনারা আমার বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর জীবনের সাধ আহ্লাদ কিছুই উপভোগ করিতে পারেন নাই তজ্জন্য দুঃখিত হইবেন না। এই সময় শ্রীকৃষ্ণদেব ক্ষত্রীয় ধর্ম্মের প্রথানুসারে অবন্তীনগরবাসী সন্দীপন মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ উপস্থিত হন। কিছু কাল পরে বেদান্ত ন্যায় দর্শন বিজ্ঞান এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এ দিকে কংসের মহিষী বিধবা হইয়া তদীয় পিতা জরাসন্ধের নিকট দুঃখের কথা বলাতে সেই মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ রাজা সপ্তদশ বার শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে রণ সজ্জা করে। শেষ কালযবন ও বহু সংখ্যক অসভ্য লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া পুনরায় তাঁহার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। নন্দতনয় এই কালযবনদিগের ভয়ে পলায়ন করিয়া সমুদ্রমধ্যে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করত তথায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থান দ্বারকা তীর্থ বলিয়া পরে বিখ্যাত হয়।

রাজা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রণয় সৌহৃদ্য

ছিল। পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবী কৃষ্ণের পিসী হইতেন, আবার কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হয়। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল। দৈবকীতনয় যে কেবল প্রেমবান্ প্রিয়-দর্শন চিত্তহারী ছিলেন তাহা নহে, যৌবন বয়সে তিনি আবার তত্ত্ব-বিদ্যা সংগ্রাম কৌশল এবং রাজনীতিতেও এক জন অদ্বিতীয় দূরদর্শী বিজ্ঞ হইয়া উঠেন। বুদ্ধি বিচক্ষণতা, গভীর চিন্তাশীলতা এবং সূক্ষ্ম-দর্শিতা তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। পারিবারিক মর্য্যাদাতেও তিনি তৎ-কালীন রাজন্যবর্গের মধ্যে এক জন সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। যদুবংশ একটি প্রধান ক্ষত্রীয় রাজবংশ, অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীর এবং রণনিপুণ সৈনিক পুরুষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করে। সেই যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-গ্রহণ করিয়া পিতৃকুলের নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সে সময় ভারতীয় ভূপালবর্গের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ জ্ঞানী এবং বুদ্ধি-মান প্রায় আর কাহাকেও দেখা যায় না। ফলতঃ কৃষ্ণের জীবনে বহু গুণ একত্র সমাবেশিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি যে ঘোর বিষয়ীর ন্যায় স্বহস্তে রাজকার্য্য করিয়াছেন, কি নিজ বাহুবল দ্বারা সংগ্রামে বীর সেনাদিগকে পরাভূত করিয়া বিখ্যাতনামা হইয়া গিয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি এক দিকে রাজনীতিবিশারদ অসা-ধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন, অপর দিকে অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী, মানবচরিত্রজ্ঞ যোগাচার্য্য পণ্ডিতও ছিলেন। এক দিকে প্রেমবান্ সহৃদয়, অন্য দিকে সৎপরামর্শদাতা রাজমন্ত্রী, রণপণ্ডিত এবং গভীর তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মাচার্য্য এই ত্রিবিধ গুণে অসাধারণ গুণবান্ হইয়া তিনি রাজা যোদ্ধা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু এবং প্রেমপিপাসার্ত্ত নরনারীকে বশীভূত করেন। নিজে রাজা হইয়া রাজকার্য্য কখন করেন নাই, অথচ শত শত নরপতি ও সম্রাট্‌কে ইঙ্গিতে পরিচালিত করিয়াছেন। সংগ্রামক্ষেত্রে বাহুবল ও শারীরিক বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ না হইলেও অগণ্য সেনানীপরিবেষ্টিত সমরকুশল মহাপরাক্রমশালী সেনাপতিদিগকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করি-য়াছেন। সাধন ভজনের কঠোর প্রণালী অবলম্বন করিয়া তপোনিষ্ঠার উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই, অথচ মহামহোপাধ্যায় যোগী তপস্বী

ভক্ত সাধকদিগকে যোগ ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বৈদিক সময়ে কিম্বা পৌরাণিক কালে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নানা গুণবিশিষ্ট মহৎ ও উন্নত আত্মা আর একটিও নয়নগোচর হয় না। মহাভারতের অঙ্গীভূত যুধিষ্ঠির ভীষ্ম প্রভৃতি মহাতেজা ধর্ম্মপরায়ণ যত যত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন সকলেই ইহাঁকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। পাণ্ডবদিগের এমন কোন কার্য্য ছিল না যাহা এই মহাপুরুষকে অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরই তৎকালে রাজপদের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণদেব তাঁহাকে সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যের একাধিপত্য প্রদানে প্রয়াস পান। সুতরাং বিরোধী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ এবং দুর্য্যোধনাদি যোদ্ধাগণকে তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। এত বিষয় ব্যাপার যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি অর্জ্জুনকে গভীর যোগতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি নিজে অস্ত্র ধরেন নাই, অর্জ্জুনের রথে সারথী হইয়া কেবল পরামর্শ দিতেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহার পূর্ব্ব সময়ে যে সকল প্রধান প্রধান মহাত্মা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা সংসারের সমুদায় বিষয়ের সঙ্গে লিপ্ত থাকিয়া এ প্রকার প্রণালীতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন নাই। জনক, অম্বরীষ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত কিছু কিছু দেখাইয়াছেন, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে নহে, আর তাঁহারা এ শ্রেণীর লোকও নহেন, প্রসিদ্ধ সাধক ও ভক্তের মধ্যে তাঁহাদিগকে গণনা করিত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহাতে আমরা জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। নির্লিপ্ত ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তিনি বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন।

রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ বহু শত ক্ষত্র রাজবংশকে যুদ্ধে নিহত এবং পাণ্ডবদিগের পদানত করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাইয়া, অর্জ্জুনকে যোগ ভক্তি শিক্ষা দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবশিষ্ট জীবন দ্বারকাধামে

অতিবাহিত করেন। তথায় জ্ঞাতিবর্গের সহিত কোন কোন যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। এইখানে অনুগত আত্মীয় পরম ভাগবত উদ্ধবকে তিনি ভক্তিবিষয়ে অতি আশ্চর্য্য এবং সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। যথার্থ ভক্তির শাস্ত্র আমরা এই স্থলে প্রথম দেখিতে পাই। ভক্তির লক্ষণ সকল ইহাতে অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিনী প্রভৃতি আট জন পট্টমহিষী এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার ষোড়শ সহস্র পুরনারী ছিল। প্রত্যেকের দশ দশটি করিয়া সন্তান, তাহা হইলে গণনায় সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ ষষ্টি সহস্র আশিটি সন্তান হয়। ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি লইয়া ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এ সকল লোক প্রভাস-তীর্থে গিয়া গৃহবিবাদে নিধন প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্ট একটি প্রপৌত্র মাত্র রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহ ত্যাগ করেন। এক দিন তিনি সেই প্রভাস-তীর্থে অশ্বত্থমূলে পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় বসিয়াছি-লেন, মৃগ বোধে এক ব্যাধ আসিয়া বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল, তাহাতেই তিনি গতাসু হইলেন। কৃষ্ণের জীবনসম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই থাকুক আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

এ বিষয়ে আমি যত দূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, শৈশবাবস্থা হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কৃষ্ণের জীবনে এমন গুটি কতক অসা-ধারণ গুণ প্রকাশিত হইয়াছিল যাহা অনুকরণ করিবারও কাহারো সাধ্য নাই, এক জীবনে বিভিন্ন সময়ে অন্যত্র তাহা দেখিতেও পাওয়া যায় না। শৈশবকালে স্বভাবতঃ সকল বালকই প্রেমাস্পদ নয়নানন্দকর হয়, কিন্তু কৃষ্ণের তৎকালে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত আরও কিছু অসাধারণতা ছিল। মাখনচোর গোপাল যেন সকল আদরের পরিস-মাপ্তির আধার; এই জন্য বাল্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া তিনি উক্ত হইয়াছেন। শিশু কালের বিষয় এই গেল, তাহার পর পৌগণ্ড, পঞ্চম হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত, এ সময়টিও তাঁহার বড় আনন্দে অতিবা-হিত হইয়াছে। গোষ্ঠযাত্রা, বনবিহার, নন্দের বাধা বহন, ইত্যাদি অবস্থায় ছিদাম সুদাম সুবলাদি বয়স্য সখাগণের মনকে তিনি এমন

মোহিত করিয়াছিলেন যে, তাদৃশ প্রেমিক সখাও আর কেহ কখন দেখে নাই। ব্রজবালকগণ তাঁহাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত। তদনন্তর কৈশোর কাল, এই কালে কিশোর বয়স্কা বালিকাদিগের সঙ্গে রাসলীলা প্রেমবিহার করেন। একাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কৈশোর কালের সীমা, এই বয়সের মধ্যে প্রতিবাসিনী নারী ও গোপ-বালিকাদিগকে লইয়া তিনি এমনি আহ্লাদ আমোদ নৃত্য গীত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া গিয়াছেন যাহা সমস্ত ভারতবর্ষে প্রেমের আদর্শরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই লীলা ভক্তি পরায়ণ পবিত্র চরিত্র মহাত্মগণের ধর্ম্মসাধনের প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিগৃহীত হয়। কৃষ্ণনামের ধাতুর্থ তাঁহার জীবনের একটি অদ্বিতীয় গুণ ছিল; সেই গুণের আকর্ষণে স্বামী পিতা মাতা সন্তান ও আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবধূগণ তাঁহার নিকট আসিত। কালাচাঁদের সুমধুর বংশী-ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাদের প্রাণ উচাটন হইত। এমন বংশীই বা কে বাজাইতে পারে? কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিশুদ্ধ ব্যবহার গোপবধূগণের একান্ত বিশ্বাস ছিল। এই রাসলীলাকে আমরা বাল্য-কালোচিত নির্দ্দোষ ক্রীড়ার মধ্যে যদি গণ্য করি তাহাতে কি কোন অপরাধ হয়? স্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন, গোপীরাও তাঁহাকে প্রাণতুল্য জীবন সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিত। কৈশোর কাল এইরূপ অসাধারণ প্রেমলীলায় অতিবাহিত হইল। শেষ যুদ্ধ বিদ্যা, রাজ্যশাসন, যোগ ও ভক্তিশিক্ষা প্রদান এই তিনটি অনুপম ক্ষমতা ও আশ্চর্য্য গুণ তাঁহার জীবনে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়। রাজ্য-শাসন এবং যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে এমন গভীর বুদ্ধির পরিচয় কে দিতে পারে? এবং সশস্ত্র সমরোদ্যত বিপক্ষদলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এমন সূক্ষ্মতম অধ্যাত্ম যোগতত্ত্বই বা কে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়? তাদৃশ যোগপ্রধান মায়াবাদাচ্ছন্ন আর্য্যসমাজে দ্বৈতভাবাপন্ন সরস ভক্তির ধর্ম্মই বা আর কে প্রচার করিতে পারিত? কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে হইলে সংক্ষেপে এই জানিতে হইবে যে, তিনি অদ্বিতীয় সুন্দর শিশু বাৎসল্য রস চরিতার্থের গোপাল, প্রিয়তম সখা, চিত্তহারী প্রেমবান্

সুরসিক, যুবা, ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী, তত্ত্বদর্শী যোগাচার্য্য, ভাবগ্রাহী ভক্তিরসজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে এক একটি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অবতার বল আর মহাপুরুষ বল, ইহাঁর মত বিস্তৃত প্রভাব এবং প্রতিভা ভারতবর্ষের মধ্যে কাহারো হয় নাই।

যে সকল দোষ এবং জঘন্য কলঙ্ক ইহাঁর উপর সচরাচর আরোপিত হয় তদ্বিরুদ্ধে এক্ষণে আমি কিছু সহজজ্ঞানমূলক যুক্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি। "কৃষ্ণ" এই শব্দার্থ ও ধাতু প্রত্যেয়ের মধ্যে অবশ্য কোন দোষ নাই। ইহাঁর যেমন প্রভাব, নামের অর্থ তাহার অনুরূপই আছে। কৃষ ধাতু নক্ প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণ হয়। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, যিনি জগৎকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। "কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্ব্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" [গৌতমীয় তন্ত্র] কৃষ ধাতু ভূ বাচক, ণ নির্ব্বৃতিবাচক, এই দুই অর্থাৎ সত্য ও আনন্দ যে পরব্রহ্মে সম্মিলিত হইয়াছে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা যায়। বাল্যকালের যে ননীচুরির অপরাধ তাহা ধর্ত্তব্য নহে, কারণ চঞ্চলমতি সুলক্ষণাক্রান্ত বালকেরা তাহা চিরকাল সর্ব্বত্রই করিয়া থাকে। তদনন্তর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাখাল হইয়া গোপবালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ ও বাল্যক্রীড়া করিয়াছেন, সে অবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারো শস্যক্ষেত্রে গোচারণ করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে কোন অভিযোগ শুনা যায় নাই। এই সময় বস্ত্রহরণের বিষয় উল্লেখ আছে। সাত বৎসর বয়সে তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করেন, বস্ত্রহরণ তাহার পূর্ব্বে, ভাগবতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। গোপবালিকাগণ কাত্যায়নীব্রতে ব্রতী হইয়া নগ্নবেশে যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় বয়স্যবালকগণসঙ্গে নন্দতনয় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বালিকাগণের পরিত্যক্ত বস্ত্র লইয়া বৃক্ষারোহণ করিলেন; ইহা যে বালক বালিকাগণের বাল্যোচিত ক্রীড়ামাত্র তাহা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া, অদ্ভুতচরিত্র সন্দর্শনে সকলে বলিত, এমন অদ্ভুতকর্ম্মা সুকুমারমতি বালক পল্লীগ্রামে গোপকুলে কিরূপে জন্মিল? বিবস্ত্র হইয়া স্নান

করিলে ব্রতভঙ্গ হয় এই কথা বলিয়া তিরস্কার করত গোপীকাদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন তোমরা আমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত কর। এ সম্বন্ধেও ভাগবতোক্ত বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক সংস্কারের কত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তাহার পর দশ হইতে পনর বৎসর বয়সের মধ্যে রাসলীলা ধরা হইয়াছে। এই রাসলীলা যদি একটি নির্দ্দোষ বাল্যক্রীড়া হয়, তাহা হইলে এই ভদ্রসন্তানের অপরাধ কি? বৈষ্ণবধর্ম্মবিরোধীরাও রাসলীলার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে পরদারাসক্ত ব্যভিচারী বলেন। আধুনিক বৈষ্ণবগণও তাহা স্বীকার করত পরকীয়ারসাস্বাদন জন্য ভগবানের লীলা এই বলিয়া এবং "তেজীয়সাং ন দোষায়" এই সংস্কৃত বাক্যের দোহাই দিয়া উক্ত অপরাধ প্রকারান্তরে আপনাদের ইষ্টদেবতার স্কন্ধে স্থাপন করেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ প্রমাণানুসারে বিপক্ষ ও স্বপক্ষ দলের লোকেরা এই দোষ আরোপ করিতে চাহেন? প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং যুক্তিমূলক সম্ভবনীয়তা ব্যতীত আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের কথা আমরা মান্য করিতে পারি না। প্রচলিত জনপ্রবাদ বাক্যত গ্রাহ্যই নহে, তাহা সাধারণ লোকে বিশ্বাস করুক। শ্রীমদ্ভাগবত এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ, তাহা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ।" ১০ স্ক, ৩৩ অ, ২৬ শ্লোক। এইরূপে সত্যসঙ্কল্প হরি এবং তাঁহার অনুরক্তা অবলাগণ ইন্দ্রিয়বিকার নিরোধ করিয়া শরৎকালীয় কাব্যরসাশ্রিত কথা সেবনে শশাঙ্কবিরাজিতা নিশা যাপন করিলেন। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।" ১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩৯ শ্লো। ব্রজবধূগণের সঙ্গে ভগবানের এই লীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ বা বর্ণন করে, সেই ধীর ব্যক্তি ভগবানেতে পরমা ভক্তি লাভ করত হৃদ্রোগ কামকে অচিরে পরিহার করে। হৃদ্রোগকামবিজয়ের জন্যই এই লীলা, কিন্তু

সাধারণ্যে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ লইয়া কেহ নিন্দা করে, কেহ নিন্দাকে দেবলীলা বলিয়া তাহাকে প্রশংসার বিষয় মনে করিয়া লয়। রাসবিলাসে ব্রজকুলবধূগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বাধীনতার সহিত নিরঙ্কুশভাবে বিহার করেন তাহা তৎকালের সামাজিক ব্যবহারবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই, বর্ত্তমান হিন্দু আচার ব্যবহারেরও বিপরীত। কেন না তিনি কিশোরবয়স্কা অবলাগণের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা একত্র পান ভোজন নৃত্যগীত আমোদ আহ্লাদ ক্রীড়া কৌতুকে রত থাকিতেন, আলিঙ্গন চুম্বন, অঙ্গস্পর্শ ইত্যাদি কথাও ভাগবতে উল্লিখিত আছে, এ সমস্ত আচরণের সঙ্গে ইয়োরোপের সভ্য নরনারী ভিন্ন কেহ সহানুভূতি করিতে পারে না। কিন্তু ঈদৃশ আমোদ আহ্লাদ নৃত্যগীত কেলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ নরনারীদিগকে করিতে দেখিয়া তোমরা কি তাঁহাদিগকে দুষ্কর্ম্মান্বিত অপবিত্রচরিত্র মনে কর? সাধ্য কি? তাহা হইলে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ভদ্রসমাজে সকলকে তিরস্কৃত হইতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে সকল ইয়োরোপীয় জাতি স্ত্রীলোকদিগের গাত্র স্পর্শ করিয়া নৃত্যগীতাদি করেন, পরনারীর সঙ্গে নানা ভাবে বিহার করিয়া বেড়ান, শ্রীকৃষ্ণের নামে তাঁহাদেরও ঘৃণার উদয় হয়। বিশেষতঃ পাদ্‌রী সাহেবেরা এ সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের রাসবিলাস ইংরাজদিগের নাচ এবং স্বাধীন প্রেমবিহারের অপেক্ষা কি নিকৃষ্ট ব্যবহার বলিয়া স্থির হইবে? এ দেশে সেরূপ প্রথা চলিত নাই বলিয়া, বিশেষতঃ তখন ঋষিপ্রচারিত যোগধর্ম্ম এবং স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি কঠোর বৈরাগ্যপ্রধান ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই এরূপ রাসলীলা একটী সাংঘাতিক নূতন প্রথা মনে হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া কেবল রুচিবিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য একজন মহৎ লোকের উপর এত বড় একটা দোষ দেওয়া কি কখন বিবেকসঙ্গত হইতে পারে? ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক এবং আধুনিক গ্রন্থকার জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির লিখিত বাক্যের শব্দার্থ লইলে রাসলীলাকে ইন্দ্রিয়বিকারঘটিত জঘন্য কার্য্যরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আমি তাহা

পারি না। আমার চৈতন্য, এবং রামানন্দ, হরিদাস, রূপসনাতন প্রভৃতি পবিত্রাত্মা গুরুজনেরা সেরূপ নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের জীবন যেমন পবিত্র নির্ম্মল ছিল, রাসলীলার ব্যাখ্যানও তাঁহারা তদনুরূপ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা নীচ ঘৃণিত ভাবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের অজ্ঞানতা দোষে সাধারণ বৈষ্ণববৈষ্ণবী-গণের ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। আজ কাল যাহা দেখিতে পাই, ঠাকুরের রাসলীলা যেন অধম ইন্দ্রিয়াসক্ত বৈষ্ণবগণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থের এক দৃষ্টান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের চরিত্র যেরূপ জঘন্য পশুবৎ ধর্ম্মমত তদ্রূপ। ইহাদের চরিত্রের অনুগামী ধর্ম্ম-মত, কিন্তু ধর্ম্মমতের অনুগামী চরিত্র নহে। দুষ্কর্ম্ম করিয়া তাহা নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য যেন তাহারা এইভাবে রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করি-য়াছে। বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলা বৃন্দাবনে সংঘটিত হয় তাহা বস্তুতঃ যেরূপ, ভাগবতের দশমস্কন্ধে তাহা বর্ণিত আছে। ঐ সমস্ত লীলাবিহারের কোন কোন বিষয়ে লম্পটচরিত্র দুষ্কৃতাধম ব্যক্তি-দিগের কুক্রিয়ার সঙ্গে বাহ্য সাদৃশ্য আছে বলিয়া আধুনিক বৈষ্ণবগণ কেহ তাহাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের প্রতিপোষক জ্ঞান করিয়া আপ-নাদের অপবিত্র রুচি ঘৃণিত বাসনা এবং কুৎসিত কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, কেহ বা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ঘটিত ব্যবহার স্বীকার করিয়া লইয়া উহাকে দেবতার লীলা, সুতরাং নির্দ্দোষ, এই কথা বলিয়া সন্তুষ্ট আছেন। শেষোক্তদিগের এই মাত্র উচ্চ ভাব যে, তাঁহারা "তেজীয়সাং ন দোষায়" এই কথা বলিয়া দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে সেরূপ লীলানুকরণ বিনাশের কারণ ইহা স্বীকার করত আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে রাখিয়াছেন। আধুনিক গ্রন্থোল্লিখিত মান-ভঞ্জন কলঙ্কভঞ্জন নবনারীকুঞ্জর চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন, আরও অন্যান্য বিলাসরসের কথা যাহা জনসমাজে প্রচলিত আছে তাহাও আমার বোধ হয় কুকবিদিগের কুকল্পনার ফল, যাত্রা নাটকের শাস্ত্র।

গোপীদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম যে নির্লিপ্ত এবং নিষ্কাম তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নিশর্ম্মা তেজস্বী ঋষি দুর্ব্বাসা

কৃষ্ণকে ব্রহ্মচারী বলাতে প্রধানা গোপিনী বলিলেন, তিনি ব্রহ্মচারী কিরূপে হইলেন? ঋষি বলিলেন, "যোহি বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যোহি বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি।" সকাম হইয়া কামনার বিষয় ভোগ করিলে কামী হয়, অকাম হইয়া করিলে সে অকামী হয়। পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ এবং তৎসঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা ইত্যাদি নির্দ্দোষ ব্যবহারও তখন পরদারাভিমর্ষণ বলিয়া অভিহিত হইত। "পরদার" অর্থ নানা প্রকারে গৃহীত হয়। এ সম্বন্ধে দোষ ধরিলে অনেক সচ্চরিত্র ইংরাজ ও সুসভ্য বাঙ্গালী ভদ্রলোককেও দোষী করা যাইতে পারে। তন্ত্রে এক স্থানে লিখিত আছে, "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং" গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেম কাম বলিয়া লোকবিখ্যাত হইয়াছে। গোপালতাপনীর টীকাকার এই কারণেই "সকামাঃ সর্ব্বরীমুষিত্বা" ইহার অর্থ, প্রেমের সহিত বর্ত্তমান বুঝাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রৈণ ছিলেন না, কিন্তু অনাসক্ত চিত্তে গৃহাশ্রমে স্ত্রীপুত্র সহ বাস করিতেন, তৎসম্বন্ধে ভাগবতের আর এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করিয়া দ্বারকায় আসিলেন তখন স্ত্রীগণ তাঁহাকে মূঢ়তা বশতঃ স্ত্রৈণ এবং অনুব্রত বোধ করিয়াছিল।

অধুনা তত্ত্বানুসন্ধায়ী কৃতবিদ্য সমাজেও কৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নিকৃষ্টশ্রেণীর বিদ্যাভিমানী অজ্ঞান বৈষ্ণবদিগের উচ্ছিষ্ট মত ইহাঁরা আদরের সহিত গ্রহণ করেন। এক জন বলেন লীলা, এক জন বলেন অপবিত্র দুরভিসন্ধিচরিতার্থতা। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপরে উল্লেখ করা হইল, যুক্তি এবং সহজজ্ঞান কি বলে তাহাও একবার দেখা কর্ত্তব্য। পনর বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে ব্রজলীলা শেষ হয়। এ বয়সের এক জন ভদ্রসন্তানকে ভয়ানক দোষে দোষী করা কি সঙ্গত? তাঁহার পূর্ব্ব জীবন ও পরজীবন ইহাতে কোন সাক্ষ্য দান করে না। যে বালক কৈশোরে এত মন্দ হয় সে কি যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে ভাল হইয়া যায়? সেই কৃষ্ণ আবার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া পরে যোদ্ধা রাজমন্ত্রী ধর্ম্মাচার্য্য হইলেন। এই সময়েই তাঁহার যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এমন গভীরতম যোগ

এবং প্রগল্‌ভা ভক্তির কথা শিক্ষা দিলেন তাঁহাকে চিরকাল রাসলীলার কৃষ্ণ বলিয়া নিন্দা করিতে হইবে, ইহা কোন্ ধর্ম্মের মত? অজিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণবদিগের চরিত্র দেখিয়া কি তাঁহার জীবন বিচার করা উচিত? পনর বৎসর বয়সের মধ্যে যে কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা ভবিষ্যতের সমস্ত জীবন কখন বিচারিত হইতে পারে না। তাদৃশ তরুণ বয়সে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া আর একবারও শ্রীকৃষ্ণ তথায় ফিরিলেন না ইহাতেই বা কি বুঝায়? যাঁহারা চিন্তা না করিয়া সহসা মন্দ ভাব আরোপ করেন তাঁহাদের জানা উচিত, একটি রাজ্যের ভিতরে গৃহস্থ নরনারীর মধ্যে বাস করিয়া তাদৃশ নীচ কার্য্যে রত থাকিলে সে ব্যক্তির জীবন কখন নিরাপদ থাকিত না, নগরে পরিবারে শান্তি কুশলও রক্ষা পাইত না, বৃন্দাবনের গোপবৃন্দ আপনাপন স্ত্রী কন্যাগণকে সেরূপ ব্যক্তির নিকট যাইতেও দিত না। যুদ্ধ ও রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক কৌশল চতুরতা অবশ্য যোগ ভক্তি প্রেমলীলার সঙ্গে সমঞ্জস হয় না, তদ্বিষয়ে যাহা বলিতে চাও বল; কিন্তু মহতের মহত্ত্ব কি তদ্দ্বারা একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে? কৃতবিদ্য উদার চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের তাহা মনে করা কদাপি উচিত নহে। চৈতন্যের ন্যায় সাধু যাঁহার জন্য উন্মত্ত, তাঁহাকে নিন্দা ও উপেক্ষা করিতে হইলে অন্ততঃ একটু চিন্তাও করিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ নরনারী শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছে ইহারও কি কোন অর্থ নাই? তাঁহার প্রচারিত যোগ ও ভক্তিতত্ত্ব সাধকদিগের নিকট অতীব মহামূল্য সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হয়। অবশ্য নিজ জীবনে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ভক্তির ইতিবৃত্ত আমি অন্বেষণ করিতেছি তাহার প্রথম অধ্যায় এই যোগাচার্য্যের নিকট ভিন্ন আর কোথাও পাই না।

কৃষ্ণের পূর্ব্বে সনক সনাতন নারদ ধ্রুব প্রহ্লাদের জীবনে ভক্তির লক্ষণ অভিলক্ষিত হয়, ইহাঁরা সকলে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের কিছু পূর্ব্ব হইতে দ্বিভুজ মূর্ত্তির পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে কৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। পূর্ব্বাচার্য্য-

গণ উপদেশ দিবার সময় যেমন আপনাদিগকে ঈশ্বরভাবাপন্ন অভেদাত্মরূপে প্রকাশ করিতেন, ইনিও সেইরূপ করিয়াছেন। ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব কথা মনুষ্যমুখ হইতে বাহির হয় না, স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার প্রেরয়িতা এই দৈবাবিষ্ট ভাব সে সময় সকল গুরু ও আচার্য্যদিগের মধ্যেই প্রবল ছিল। ঈশ্বরের সহিত এক না হইলে মনুষ্য তাঁহার কথা বলিতে পারে না, এ কথার তাৎপর্য্য অতি গূঢ় সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ অদ্বৈত ভাবের মধ্যে থাকিয়াও ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ উচ্চ অর্থে অদ্বৈতবাদ সকল ধর্ম্মের চরমাবস্থা। ঈশ্বরের একান্ত অনুগত হইলে জীব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণ করিয়াও ইচ্ছায় কার্য্যে তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া যায়, এ কথা অন্যান্য সাধু মহাত্মারাও বলিয়া গিয়াছেন। যোগের অদ্বৈতবাদমতে জগৎ মায়া, ঈশ্বর নির্গুণ, ভক্তির অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর সগুণ, কর্ম্মশীল, জগৎ তাঁহার রূপ এই প্রভেদ। কার্য্যকালে মনুষ্য আপনার স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইতে পারে না, কিন্তু মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়। কৃষ্ণ যোগ করিতেন এবং তদবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহাকে চিনিতে হইলে গীতা এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ পড়িতে হয়। সে সমুদায় অমূল্য তত্ত্বোপদেশ মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ দিতে পারে না। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে যেরূপ হতশ্রদ্ধা করেন তিনি তাহার ঠিক বিপরীত ভাবের পাত্র ছিলেন। ভারতের এত লোকে কোন যৎসামান্য ব্যক্তিকে কখন অবতার বলে নাই। কিছু অলৌকিক দেবভাব তাঁহাতে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রাসলীলা বহু লোকের ঘৃণার উদ্দীপক হইয়া আছে, রামানন্দের ন্যায় সিদ্ধাত্মা তাহা বর্ণন করিতে করিতে এবং চৈতন্যের ন্যায় দেবাত্মা তাহা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কত সাধু ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া অদ্যাপি বিশুদ্ধ প্রেমপিপাসাকে চরিতার্থ করিতেছেন। সংস্কার ও বিশ্বাসগুণে একই বিষয় লোকের অন্তঃকরণে বিপরীত ভাবের উদ্দীপক হইয়া থাকে, ইহা সে বিষয়ের দোষ, কি মনুষ্যের দোষ তাহা বুঝিতে হইবে। এই কৃষ্ণ হইতে ভক্তির ধর্ম্ম বিকাশিত হইয়া ক্রমে

ভারতবর্ষে বহুল বৈষ্ণব সম্প্রদায় সঙ্গঠন করিয়াছে। স্বভাবের অধীন হইয়া সংসারাশ্রমে পরিবারমধ্যে বাস করিয়া যোগ ভক্তি সাধন করা যায়, মানবতত্ত্বদর্শী শ্রীকৃষ্ণ এ কথা পরিষ্কাররূপে শিক্ষা দিয়াছেন। গীতা ভাগবতের কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া পরে আধুনিক সময়ের ভক্তির উন্নতিবিষয়ে কিছু বলিয়া আমি গ্রন্থ শেষ করিব। 'আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী"। গীতা ২ অ, ৭০ শ্লো। নানা দিক্ হইতে নদ নদী সকল আসিয়া সমুদ্রে পতিত হইতেছে অথচ তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তেমনি কামনার বিষয় সকল যাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না তিনিই শান্তি লাভ করেন, ভোগকামনাশীল ব্যক্তির কখন তাহা লাভ হয় না। এই উপদেশানুরূপ দৃষ্টান্তও আমরা কৃষ্ণের জীবনের নানাবস্থায় পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। শাণ্ডিল্য ঋষি ভগবদ্গীতায় যে ভক্তিভাব প্রচারিত হয় তাহা লইয়া ভক্তিমীমাংসা সূত্র লিখিয়াছেন। এই ভক্তি ক্রমে বিকসিত হইয়া ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভক্তিপথ কাহাকে বলে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, তথাপি অহৈতুকী ও সাধনভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতের দুইটি শ্লোক তুলিয়া দিলাম। "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥" পুরুষোত্তম ভগবানে যে শুদ্ধাভক্তি তাহাকে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥" পরমেশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন, ও স্মরণ, তাঁহার পদসেবা, পূজা, বন্দনা, দাস্য ও সখ্যভাব এবং আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণযুক্ত ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে। ভক্তি কাহাকে বলে তাহা আর এখানে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণের জীবন হইতে ভক্তির শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়া, চৈতন্যজীবনে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ ভক্তিপ্রেমে মাতিয়া যদি চৈতন্যের মত অচেতন হইতেন, তাহা হইলে আর এ বিষয়ের তত্ত্ব তিনি প্রচার করিতে পারিতেন না। চৈতন্য

মাতিলেন, সুতরাং স্বয়ং ভক্তিশাস্ত্রকর্ত্তা না হইয়া ভক্তি পদার্থের স্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গেলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারস-পিপাসু হইয়া ভক্তির চরমাবস্থা মহাভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, কিন্তু কৃষ্ণলীলা অনুকরণ না করিয়া বরং বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সংন্যাসী সর্ব্বত্যাগী হইয়া যোষিৎসঙ্গ এককালে পরিহার করত তদ্বি-পরীত নীতি দেখাইলেন। এ বিষয়ে চৈতন্যদাস, ভগবান্‌দাস প্রভৃতি আধুনিক বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের পথ অনুসরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণবদলের কেহ কেহ যদি এইরূপ সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিয়া ভক্তিযাজন করিতেন, তাহা হইলে এ ধর্ম্মের অনেক গৌরব রক্ষা পাইত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্যের কেমন প্রভেদ! এক জন স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তৎসঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেম প্রচার করিলেন, এক জন স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখিতেন না। প্রথমোক্ত প্রেম অত্যন্ত উর্চ্চ, নির্ব্বিকারচিত্ত পবিত্রমনা হইয়া তাহা পালন করিতে পারিলে স্বার্থ লাভ হয়, কিন্তু অনুকরণকারীদিগের ইহাতে প্রায়ই নরকভোগ হয়। নারীজাতির সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেমব্যবহার দেবতাদি-গেরও প্রার্থনীয়, এবং ইহাই সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। যাহা হউক, কৃষ্ণ-লীলা হইতে সাধারণ নারীকুলের প্রতি সাধকগণের প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এ প্রকার পবিত্র প্রেমের সদ্দৃষ্টান্ত আছে। মুনি ঋষিদিগের আচরিত কঠোর বৈরাগ্য সংসারত্যাগ বনগমন ইত্যাদি প্রথার পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ধর্ম্ম আনিলেন, স্ত্রীজাতিকে ভাল বাসিয়া গৃহাশ্রমে পরিবারমধ্যে যোগভক্তি প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতির প্রতি ভক্তির উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে ভক্তির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনুমান উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শৈবধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালের যে দুই একটি বৈষ্ণব সম্প্রদা-য়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে কেহ গণ্য করিত না। সপ্তম শতাব্দীর শেষে বা অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে ঐ দেশে শঙ্করাচার্য্য জন্ম-

গ্রহণ করেন তাঁহাকে লোকে শিবাবতার বলিত। পরে কেশবাচার্য্যের পুত্র রামানুজ আচার্য্য অবতীর্ণ হন। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য, এবং নিম্বাদিত্য পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানে এই চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামানন্দী বা রামাৎ, দাদু, কবীর, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বহুতর বৈষ্ণব সম্প্রদায় যাহা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা উক্ত চারি প্রধান সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত শাখা প্রশাখা। ইহাতে বিষ্ণু এবং রামের উপাসনা প্রচলিত ছিল, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রায় দেখা যায় না ; এবং ভক্তি প্রেমের প্রমত্ত ভাবও এ সকলের মধ্যে ছিল না। ভক্তির কোন কোন ভাব দেখা দিয়াছিল এই মাত্র। নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের লোকেরা রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি পূজা করিত। প্রকৃত ভক্তি চৈতন্যদেবই প্রদর্শন করেন। চৈতন্য-প্রদর্শিত ভক্তির ন্যায় প্রগল্‌ভা ভক্তি পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের সংস্থাপক বাবা গুরু নানক সে দেশে যে ভক্তি প্রচার করিয়া যান তাহাও অতি আশ্চর্য্য। তিনি ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্যের ষোলবৎসর অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এক সময়ে দুই জন দুই স্থানে এক হরিভক্তি প্রচার করেন। চৈতন্যের পাঁচ বৎসর পরে নানকের পরলোক প্রাপ্তি হয়। নানক প্রচারিত হরিভক্তির প্রভা শিখ কুকা নিরাঙ্কারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। নামগান, গ্রন্থপাঠ, সাধুভক্তি, নানক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। এত বড বলবান্ পঞ্জাবীদিগকে এই ধর্ম্মের গুণে যেন নির্দ্দোষ মেষশাবকের ন্যায় নম্র করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষ পরম্পরায় সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। তন্মধ্যে অমৃতসরোবরের গুরুদরবার একটি অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তিস্তম্ভ। সেখানে বারমাস অষ্ট প্রহর কাল নামগান গ্রন্থপাঠ সাধুসমাগম হইয়া থাকে। এ প্রকার চির উৎসবের ধর্ম্মমন্দির পৃথিবীর কোন স্থানে নাই। নানকপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় শেষে একটি যোদ্ধা জাতি সংগঠন করিয়াছে। এই জাতি একটি প্রকাণ্ড দল হইয়া বহুতর যুদ্ধ করিয়াছে। ইহা দ্বারা মহাপুরুষদিগের

প্রভাব কেমন তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেশ এবং জাতির সমুদায় নরনারী তাঁহাদের নামে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়। মহম্মদের শিষ্যগণ এ বিষয়ে জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে এবং অদ্যাপি দেখাইতেছে।

পূর্ণ ভক্তির বিকাশ আমরা স্বদেশবাসী বঙ্গকুলতিলক চৈতন্যের জীবনে দেখিতে পাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে যত যত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইত তাহা দ্বারা বৈধ অর্থাৎ সাধনপরতন্ত্রা ভক্তি প্রচারিত হইয়াছিল। চৈতন্য কর্ত্তৃক অহৈতুকী মহাভাবময়ী ভক্তির অসাধারণ ভাব জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার পিতা মাতা সখা স্বামী বলিয়া পূজা করিতেন এবং তাঁহার প্রেমময় সচ্চিদানন্দ রূপ সদা সর্ব্বক্ষণ দর্শন আলিঙ্গনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। কি এক অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্যরসে তাঁহার মন মজিয়াছিল যাহা আমরা কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি না। কৃষ্ণবর্ণ ত্রিভঙ্গ-মুরারি শ্যামরূপের বাহ্য সৌন্দর্য্যে চিত্ত কি এরূপ বিশুদ্ধ হইতে পারে? আরও কিছু তিনি দেখিয়াছিলেন। তাহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ চৈতন্য-রূপী ভগবান্ পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ সৌন্দর্য্য মহিমা মাধুর্য্য অবশ্য তিনি সেই শ্যামরূপের অভ্যন্তরে দেখিতেন। প্রকৃত দেবদর্শন না হইলে এমন অদ্ভুত প্রেমবিকার কি উপস্থিত হয়? তবে মুর্ত্তির ভিতর দিয়া তিনি দেখিতেন। নিরাকারব্রহ্মবাদী যোগিজনেরাই কি সকলে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনসুখ প্রাপ্ত হন? অনেকেই অন্ধকার শূন্য এবং কল্পিত মানস-পুত্তলিকা দেখিয়া ফিরিয়া আসেন। দিব্যচক্ষু থাকিলে ভক্ত তদ্দ্বারা সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া দেবদর্শন লাভ করেন। চৈতন্যের সে চক্ষু ছিল। তিনি মৌখিক বাক্য কিম্বা লিখিত গ্রন্থ দ্বারা কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন নাই। দিবা নিশি ভাবরসেই উন্মত্ত; অবসর কোথায়? কেবল জীবন দ্বারা ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়াছেন। তৃণের ন্যায় বিনম্র, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, আপনি অভিমানশূন্য হইয়া অপরকে মান দান, এইরূপে সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন কর, এই মাত্র তাঁহার উপদেশ ছিল। তাঁহার মত বিনয়ী এবং প্রমত্ত ভক্ত আর দেখা যায় না। বিজ্ঞান প্রতিপাদিত উপদেশও তিনি কোন কোন পণ্ডিতমণ্ডলীতে দিয়াছিলেন;

কিন্তু সে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের অবলম্বিত পথ নহে। জ্ঞান বুদ্ধি বিচার এ সকলকে তিনি ভক্তিরসে ডুবাইয়া ধর্ম্মার্থীদিগের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেন, এই জন্য বুঝিবার অগ্রে লোকে তাঁহার শিষ্য হইয়া পড়িত। প্রত্যক্ষ দৈবশক্তির নিকট উপদেশ আর কি করিবে? তাঁহার দুর্জ্জয় ভক্তিপ্রভাবে লোকের জ্ঞান বুদ্ধির গর্ব্ব অগ্রেই চূর্ণ হইয়া যাইত। পরে রূপ সনাতন জীব ইহাঁরা ধর্ম্মগ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক প্রেম ভক্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিলেন। চৈতন্যের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে কৃষ্ণ রাধিকার অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের পূর্ণাবতার বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধিকার সহিত লীলা করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্ত্যনুভব করিতে পারিলেন না, শ্রীরাধিকা যেরূপ আনন্দ ভোগ করিলেন তদ্রূপ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না, এই জন্য উভয়ের সুখ সম্ভোগার্থ উভয়ে এক দেহ হইয়া গৌর হইলেন। এ কথার আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। মানব প্রকৃতির স্ত্রী পুরুষ যুগল ভাবের সামঞ্জস্য তাঁহাতে ছিল। ইহাঁকে ভক্তাবতারও বলিয়া থাকে। "অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ" এইরূপ নানা কথা চলিত আছে। গৌরাঙ্গ পূর্ণাবতার কি অংশাবতার তাহা মীমাংসা করিবার জন্য নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এক সভা করেন। প্রবাদ আছে কোন নারীর উপর দৈবশক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার নখ দ্বারা এই শ্লোকটি লিখাইয়া লয়েন, যথা "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো ন চাংশকঃ"। ইহার অর্থ দুই প্রকার হয়, বৈষ্ণবেরা বলেন, তিনি ভক্তও নহেন অংশও নহেন, পূর্ণ। অপরে বলেন, তিন পূর্ণও নহেন, অংশও নহেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত।

চৈতন্যের প্রধান প্রধান ভক্ত শিষ্যগণের নাম এই স্থলে দেওয়া যাইতেছে। হরিপ্রেম অমৃতফলের বীজ পুরীসম্প্রদায়ের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী অঙ্কুরিত করেন, তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী সেই অঙ্কুরকে স্কন্ধরূপে পরিণত করেন। নয় জন পুরীগোস্বামী চৈতন্যরূপ ভক্তিবৃক্ষের মূল, নিতাই অদ্বৈত তাহার দুই প্রধান শাখা, তাহা হইতে বহু শত উপশাখা উৎপন্ন হইয়া বঙ্গদেশে ভক্তিফল বিতরণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চৈত-

ন্যের শ্রীবাস শ্রীরাম শ্রীপতি শ্রীনিধি চারি ভাই, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত বক্রেশ্বর পণ্ডিত [ইনি নৃত্যেতেপ্রধান ছিলেন,] পণ্ডিত জগদানন্দ, [ইনি প্রভুকে শারীরিক সুখে .রাখিতে চেষ্টা করিতেন,] পাণিহাটীর রাঘবপণ্ডিত, তাঁহার সঙ্গী মকরধ্বজ কর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, দামোদর, ভক্ত অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত, আচার্য্য পুরন্দর, সদাশিব পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, নারায়ণ পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, [ইনি প্রভুর নৃত্যের সময় মসাল ধরিতেন,] শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, নন্দন আচার্য্য, গায়ক মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, যবন হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, শ্রীমান সেন, গদাধর দাস, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ দত্ত কীর্ত্তনীয়া, বিজয় দাস পুথিলেখক, খোলাবেচা শ্রীধর, ভগবান্ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য, প্রভুর ছাত্র পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, বনমালী পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, গরুড় পণ্ডিত, গোপীনাথ সিংহ, দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, রঘুনন্দন, নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন, কুলীনগ্রামের সত্যরাজ, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু, অনুপম, শ্রীরূপ, সনাতন, ভক্ত শাখা জীব, রাজেন্দ্র, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, শঙ্করারণ্য আচার্য্য, কাশীনাথ রুদ্র, শ্রীনাথ পণ্ডিত, জগন্নাথ আচার্য্য, বৈদ্য কৃষ্ণদাস, কবিচন্দ্র গায়ক ষষ্ঠীবর, শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, শ্রীনিধি ও গোপীকান্ত মিশ্র, সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমল নয়ন, মহেশ পণ্ডিত, মধূসূদন কর, পুরুষোত্তম শৃগালি, জগন্নাথ দাস, বৈদ্য চন্দ্রশেখর, দ্বিজ হরিদাস, রামদাস, ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গ দাস, বিপ্র জানকীনাথ, বিপ্র বাণীনাথ কীর্ত্তনীয়া, গোবিন্দ, মাধব বাসুদেব ঘোষ, অভিরাম, মাধব আচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন, জগাই মাধাই প্রভৃতি অনেক গুলি প্রাচীনশিষ্য ছিলেন। উড়িষ্যা দেশের প্রধান শিষ্য, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য, কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ, রামানন্দাদি পঞ্চ ভ্রাতা, রাজা প্রতাপরুদ্র, কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, শিবানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতি, মুরারি মাহিতি, মাধবী দেবী, ভৃত্য গোবিন্দ, রামাই, নন্দাই, কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস—[প্রভুর

তীর্থ যাত্রার সঙ্গী,] বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, ছোট হরিদাস, রামভদ্র আচার্য্য, সিংহেশ্বর, তপন মিশ্র, নীলাম্বর, সিংহ ভট্ট, কাম ভট্ট, দন্তর শিবানন্দ, কমলানন্দ, অদ্বৈত তনয় অচ্যুতানন্দ, নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস প্রভৃতি। নিত্যানন্দের সঙ্গে গদাধর দাস আর রামদাসকে দিয়া গৌড়দেশে প্রচারার্থ প্রেরণ করা হয়। মাধব ও বাসুদেব ঘোষ ইহাঁর সঙ্গে কীর্ত্তনীয়া গায়ক ছিলেন। নিত্যানন্দ কিছু দিন পরে বিবাহ করেন। বসু ও জাহ্নবা নামে তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। বীরভদ্র নামক তাহার এক সন্তান মহা যশস্বী পণ্ডিত হইয়া অদ্বৈতবাদ মত প্রচার করাতে পিতাকর্ত্তৃক ত্যজ্যপুত্র হন। নিতাইয়ের শিষ্যগণ শৃঙ্গ বেত্র ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন। "চৈতন্য ভাগবত" লেখক শ্রীবাসের নারায়ণী নাম্নী কন্যার পুত্র বৃন্দাবন দাস, এবং সুবর্ণ বণিক কুলের পূর্ব্ব-পুরুষ উদ্ধরণ দত্ত, শ্রীজীব গোস্বামী এবং আরো অনেকগুলি প্রধান লোক ইহাঁর শিষ্য এবং সঙ্গী ছিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে নিতাই অনেক লোককে বৈষ্ণব করেন।

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে আর কতকগুলি প্রধান প্রধান ভক্ত যোগ দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। ইহার মধ্যে আবার দুই দল হয়। ক্রমে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের শিষ্য প্রশিষ্য এবং পুত্র পৌত্র দ্বারা বৈষ্ণব সমাজ বিস্তৃত হইয়াছে। খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দের এবং শান্তিপুরের গোস্বামিগণ অদ্বৈতের বংশ। তদ্ব্যতীত আর যে সকল বৈষ্ণব গুরু গোসাঞী নানা স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় তাঁহারা অধিকাংশ চৈতন্য প্রভুর শিষ্য ছয় জন গোস্বামী যথা—রূপ, সনাতন, জীব, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, ইহাঁদেরই অনুবর্ত্তী। ইহাঁরা শিষ্যদিগকে ছড়িদার ফৌজদার দ্বারা শাসন করেন, তাহাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করেন, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ আছে। সখীভাবক, রাধাবল্লভী, বলরামী, গৌরবাদী খুসিবিশ্বাসী, সহজী, আউল, সাঁই, দরবেশ, ন্যাড়া, বাউল সাহেবধনী, রামবল্লভী, কর্ত্তাভজা, স্পষ্ট-দায়ক প্রভৃতি অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা গত চারি শত বৎসরের মধ্যে চৈতন্যের মূল বৃক্ষ হইতে বাহির হইয়াছে। এ সকল সম্প্রদায়ের

প্রবর্ত্তক অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞান লোক, ইহাদের অনেকের ব্যবহার অতিশয় জঘন্য। কেহ কেহ উৎকৃষ্ট মত ও তত্ত্বকথা প্রচার করে বটে, কিন্তু ব্যবহার সাধারণ ভদ্রসমাজের নিকট ঘৃণিত। সামান্য লোকেরাই প্রায় ইহাদের সভ্য।

প্রথমাবস্থায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়মধ্যে নাম গান, মালা জপ, উপবাস, দেবপূজা ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি চৌষট্টি প্রকার সাধন বিধি ছিল। এক্ষণে তাহার অসার আড়ম্বর কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। গোস্বামিগণ শিষ্যদিগকে স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। ভিতরে ভিতরে অনেকে মদ্য মাংস, গুলি গাঁজা খান, ব্যভিচার করেন, শিষ্যের নিকট অর্থ গ্রহণ করেন, অবশ্য পণ্ডিত সচ্চরিত্র লোকও আছেন। দুঃখী কৃষক, অশিক্ষিত ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কেবল সামাজিক ভয়ে অর্থপিশাচ গুরুদিগকে পোষণ করে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে কিছু মাত্র উপকার প্রাপ্ত হয় না, গুরুভক্তিও তাহাদের আর তেমন নাই। এই সকল নিরীহ অবোধ ব্যক্তি অদ্যাবধি গুরু কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইতেছে দেখিলে মনে কষ্ট হয়।

নিত্যানন্দ ভেক দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। মস্তক মুণ্ডন, ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস, তিলক, জপমালা, কণ্ঠমালা, করঙ্গ কন্থা গ্রহণ করিয়া গোসাঞীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দিলেই বৈষ্ণবী হওয়া যায়। এই ভেকাবলম্বন এক্ষণে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থের প্রধান সহায় হইয়া উঠিয়াছে। বিধবাবিবাহ, জাতিভেদনাশক প্রণালী সামান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভদ্র গৃহস্থগণ হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করেন। বৈরাগী হইয়া হরিনাম শুনাইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে চৈতন্য উপদেশ দিয়াছেন, শত শত নরনারী তাহা পালন করিতেছে, কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে, কেবল ভক্তি ও বৈরাগ্য নাই, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই আছে। কোথায় ইহারা হরিসঙ্কীর্ত্তনে মাতাইবে; না এখন ইহাদিগকে দেখিলে কীর্ত্তনে রসভঙ্গ হয়। চৈতন্যের ধর্ম্ম অত্যন্ত সহজ, অল্প ব্যয়ে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এই জন্য দুঃখী অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। নিতাই আবার আরও সহজ করিয়া

দিয়াছিলেন। তিনি গৌরপ্রচারিত ভক্তির ধর্ম্মের বাহ্য আকারও সহজ সাধ্য আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার সাধন ভজন শাস্ত্র গীত বাদ্যযন্ত্র সমস্তই সহজ এবং সুলভ। গ্রাম্য সুরের গীত, সহজ রচনা, সকলের বোধগম্য। বাদ্যযন্ত্র তাল মান রাগ রাগিণী অতি সহজ। নাম জপ এবং কীর্ত্তন তপস্যার পরাকাষ্ঠা। বৈরাগী বৃক্ষ মূলে কুটীরে বাস করিবে, কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধান করিবে, হরি বলিয়া ভিক্ষা করিলেই তণ্ডুল পাইবে, বিবাহ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের ব্যয় পাঁচ সিকা, ঝুলি করোয়া কন্থা সম্পত্তি, সহজ বোধ্য কবিতা গাথা পদাবলী ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, দ্বারে দ্বারে পথে পথে হরিনাম কীর্ত্তন করিবে, এই সমস্ত আচার ব্যবহারের মধ্যে গৌর নিতাই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সহজ প্রণালী বলিয়াই দুষ্ট লোকেরা পাপচরিতার্থের উপায়রূপে উহা গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা চৈতন্য সম্প্রদায়ের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রধান শিষ্য জীব ও রূপ গোস্বামিপ্রণীত ভক্তিগ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে এই-রূপ লিখিয়াছেনঃ—

জীব তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরবিমুখ হয়। এই বৈমুখ্য হইতে জীবের সংসার দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সমুদায় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, বৈমুখ্য নিবারিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখ্য হয়। ঈশ্বরাভিমুখ্যের নাম উপাসনা। এই উপাসনা হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান হইতে ঈশ্বরানুভব হয়। ঈশ্বরানুভবের তাৎপর্য্য অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎ উপাসনারূপ ভগবদাভিমুখ্য দুই প্রকার। নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষময় আভিমুখ্য। নির্ব্বিশেষময় আভিমুখ্যে জ্ঞান প্রধান এবং সবিশেষময় আভিমুখ্যে অহংগ্রহোপাসনা এবং ভক্তি। প্রথমতঃ লোকে যে পরিমাণে জড়াতিরিক্ত চিদ্বস্তু অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেই পরি-মাণে বিবেকী হয়। কিন্তু এই চিদ্বস্তু অনুভব করিয়াও তাহার বিশেষ স্বরূপ সকল অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র

ব্রহ্ম অনুভব করিয়া পরিশেষে তাহাতে বিলীন হয়। সাধুজনের কৃপাতে যখন চিন্মাত্র পরব্রহ্মের বিশেষ স্বরূপ অবগতি হয় তখন হয় অহংগ্রহোপাসনা, না হয় ভক্তি সমুপস্থিত হয়। শক্তির আধার সেই ঈশ্বরই আমি, ঈদৃশ চিন্তার নাম অহংগ্রহোপাসনা। এতদ্দারা উপাসকে তাদৃশ শক্তি আবির্ভূত হয়। ভক্তি ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করাকে ভক্তি বলে। সুতরাং ভয়দ্বেষ হিংসা বা অহংগ্রহ উপাসনা এখানে স্থান পায় না।

এই ভক্তি ত্রিবিধ ;—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, এবং স্বরূপসিদ্ধা। অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বয়ং ভক্তি নয় ; কিন্তু ঐ সকল ঈশ্বরে অর্পণ করিলে, আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানধর্ম্মাদি স্বয়ং ভক্তি নহে, কিন্তু ভক্তির সঙ্গে সে সকলকে সংযুক্ত করিলে উহারা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হয়। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আনুগত্য। এখানে জ্ঞানকর্ম্মাদির কোন ব্যবধান নাই। শ্রবণ কীর্ত্তন আদি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে লইয়া হয় বলিয়া তাহারা ভক্তির অঙ্গ, সুতরাং ভক্তির স্বরূপসিদ্ধত্বে ইহারা ব্যাঘাত নহে।

এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছু চায় না, এজন্য ইহা নির্গুণা নিষ্কামা কেবলা আত্যন্তিকী অকিঞ্চনা ভক্তি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এই ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী এবং রাগা। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান এবং অর্চ্চন ব্রতাদি অনুসৃত হয়। বৈধী ভক্তিতে শরণাপত্তি অর্থাৎ একান্তভাবে শরণাপন্ন হওয়া সর্ব্ব প্রধান। শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে শরণাপত্তি হইয়া থাকে। শরণাপত্তির পর আরো উন্নতি হয় এজন্য ঈশ্বরোপদেষ্টা গুরু এবং সাধু সজ্জনের সেবা প্রয়োজন। মৃত্যুমোচক গুরু লাভ হইলে ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগ করিবে।

ঈশ্বরের সংসর্গলাভে স্বাভাবিক ইচ্ছা অনুরাগা ভক্তি। ইহা বৈধী ভক্তি অপেক্ষা প্রবলতর, কেন না বৈধী ভক্তি বিধিসাপেক্ষ বলিয়া দুর্ব্বল। সাধকের যেখানে স্বাভাবিক রুচি না থাকে সেখানে কষ্টে বিধিনিষেধ অনুসরণ করিয়া সাধন করিতে হয়, কিন্তু যেখানে রুচি

সেখানে স্বভাবতঃ ঈশ্বরের সন্তোষকর অনুষ্ঠান সকল হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা শ্রেষ্ঠ এবং বিধিনিষেধনিরপেক্ষ। অনুরাগের পথে এই জন্য পরম ঘৃণাস্পদ পাপক্রিয়াসকল হওয়া অসম্ভব, যদি প্রমাদ বশতঃ কিছু হয়, ভগবানের অনুগ্রহে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে অথবা যাঁহাদিগের প্রতি মহতের কৃপাদৃষ্টি হয়, তাঁহাদিগের ঈশ্বরের কথা শ্রবণ মাত্রই ঈশ্বরের দিকে চিত্তের আভিমুখ্য এবং ঈশ্বরানুভব হইয়া থাকে। তদনন্তর শ্রবণ কেবল রসোদ্দীপন জন্য। সাধারণ ব্যক্তি সকলের শ্রবণ মাত্র আভিমুখ্য হইয়াও কামাদিদোষ জন্য উহা প্রতিহত হইয়া অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ মাত্র সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় একথা সত্য; যদি তাহা কোথাও না হয় তবে মহৎ অপরাধে ফল অবরুদ্ধ হইয়া আছে মানিত হইবে। পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ এই অপরাধ নিবারণের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। কুটিলাত্মা ব্যক্তি সকলের নানা প্রকার আরাধনা অর্চ্চনাও ফলোপধায়ক হয় না। তাহারা অন্তরে অন্তরে ভগবান্ এবং তাঁহার ভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ সুতরাং তাহাদিগের ভজনার্চ্চনা গ্রাহ্য হয় না। ভজনাভাস দ্বারাও মুক্তি হয় শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে, কিন্তু উহা অকুটিল মূঢ়গণসম্বন্ধে। অপুণ্যবান্ কুটিলাত্মা মূঢ়গণের ভক্তি সিদ্ধ হয় না। "ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাং। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥"

ভক্তিতে শৈথিল্য জন্মান অসম্ভব। তবে দেহরক্ষণাদি জন্য কখন কখন ভক্তের যে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, তাহা অন্য বুদ্ধিতে নহে উপাসনা-বুদ্ধিতে। যেখানে মূঢ়তা বা অসামর্থ্য বশতঃ শৈথিল্য জন্মে সেখানে তদ্দ্বারা ভগবানের অনুগ্রহ আরো বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ভিন্ন বিবেকযুক্ত ব্যক্তির ভক্তিতে শৈথিল্য হয় না। শাস্ত্রশ্রবণজনিত শ্রদ্ধা জন্মিলে আর পাপে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ যদি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় দ্বারা ভক্ত আকৃষ্ট হন, তবে তদ্দ্বারা আরো দৈন্য বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে আরো ভক্তিমান্ করে। শ্রদ্ধা যখন সিদ্ধাবস্থা লাভ করে তখন অসত্য পরিবর্জ্জন, সত্যানুষ্ঠান সহজ হইয়া উঠে। যথা ব্রহ্ম-

বৈবর্ত্তে, "কিং সত্যমনৃতঞ্চেতি বিচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে। বিচারেঽপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবর্জ্জনম্। সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাত্তদা শ্রদ্ধা মহাফলা॥"

হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন;—ভক্তিতে পাপ এবং তন্মূল বিনষ্ট হয়। ইহাতে সমুদায় সদ্গুণ লাভ হয়, সমুদায় লোকের অনুরাগভাজন হওয়া যায় এবং বিবিধ সুখ উৎপন্ন হয়। ভক্তি বহুসাধনেও লাভ হয় না, ঈশ্বরের কৃপাতে আশু লাভ করা যায়। ইহাতে মোক্ষ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। ভক্তিতে যে পরম আনন্দ লাভ হয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মানন্দ পরার্দ্ধ গুণ করিলেও তাহার পরমাণুর তুল্য হয় না। ভক্তি ঈশ্বরকে সপার্ষদ ভক্তের নিকট আকর্ষণ করিয়া আনে। ভক্তির এই সকল গুণকে ক্লেশঘ্নী, শুভদা সুদুর্ল্লভা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা, এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

সাধন, ভাব এবং প্রেমভেদে ভক্তি ত্রিবিধ। [সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ভক্তি দ্বিবিধ। সাধনরূপা এবং সাধ্যরূপা। ঈশ্বরের অন্তঃকরণের বিকাশ সাধ্যরূপা। ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ রাগ এই পাঁচ, এবং মান, অনুরাগ এবং মহাভাব এই তিন, সমুদায়ে আট প্রকার সাধ্যরূপা ভক্তি।

সাধন।

সাধনরূপা ভক্তি দ্বিবিধ;—বৈধী এবং রাগানুগা। এই ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ। গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রগ্রহণ, গুরুসেবা, সাধুজনের অনুগমন, সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, ভোগাদিত্যাগ, তীর্থস্থানে নিবাস, কথঞ্চিৎ জীবননির্ব্বাহ, উপবাস, অশ্বত্থাদিসম্মাননা, এই দশটি ভক্তির আরম্ভ। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ, শিষ্যবৃদ্ধিবর্জ্জন, কার্য্যের আড়ম্বরত্যাগ, বহু গ্রন্থাদি অভ্যাস বর্জ্জন, লাভালাভে অক্লিষ্টভাব, শোকাদির অবশবর্ত্তিতা, দেবতান্তরে অনবজ্ঞা, ভূতগণের উদ্বেগের কারণ না হওয়া, দেবাপরাধত্যাগ, ঈশ্বর এবং তাঁহার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষনিন্দাদি সহ্য করিতে না পারা, এই দশটি অভাব পক্ষের ভক্ত্যঙ্গ। চিহ্নধারণ, নৃত্য, দণ্ডাবনতি, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত, সঙ্কীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, আত্মনিবেদন প্রভৃতি অবশেষ

চৌয়াল্লিশ অঙ্গ লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টি। এই সকল সমুদায় অঙ্গ সাধন করিতে হইবে তাহা নহে। এক অঙ্গ বা বহু অঙ্গ লইয়া সাধন হইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত এই সকল অঙ্গের সাধন বৈধী ভক্তিতে প্রধান।

রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধ। কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা। সমুদায় কামের বিষয়কে অবিশুদ্ধতা পরিত্যাগ করাইয়া প্রীতিপাত্রের সুখার্থ নিয়োগ কামরূপা। ঈশ্বরে পিতৃত্বাদি অভিমান সম্বন্ধরূপা। রাগাত্মিকা ভক্তিতে ঈশ্বরের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং তদুপযোগী ভক্ত্যঙ্গ সাধন বিহিত।

ভাব।

ভাব প্রেমসূর্য্যের কিরণসদৃশ, ইহা প্রেমের প্রথমাবস্থা। ইহাতে ইষ্টবিষয়ে রুচি হয় এবং সেই রুচি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়। সাধনে অথবা ঈশ্বর বা তদ্ভক্তের অনুগ্রহে ভাবোদয় হয়। সচরাচর সাধারণ লোকের সাধন দ্বারা ভাবোদয় হইয়া থাকে; অনুগ্রহে ভাবোদয় অতি অল্প লোকের সম্বন্ধে ঘটে। ভাবোদয় হইলে ক্ষোভের বিষয় উপস্থিত হইলেও ক্ষোভ হয় না, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভিন্ন বৃথা সময়হরণ নিবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয়ভোগ বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শ্রেষ্ঠ হইয়াও তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অভিমান থাকে না, ঈশ্বর প্রাপ্তির আশা সুদৃঢ় হয়, অভীষ্ট দেবতাকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠা জন্মে, ঈশ্বরের নাম গানে সর্ব্বদা রুচি, তাঁহার গুণগানে সর্ব্বদা আসক্তি, এবং তাঁহার বসতিস্থলে বাস করিতে একান্ত প্রীতি হয়। ভাবোদয় হইলেও ভক্তে দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা লইয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ উচিত নয়, কেন না তিনি ভাবোদয়ে কৃতকৃত্য হইয়াছেন। তাঁহার দোষ চন্দ্রস্থ কলঙ্করেখার ন্যায়।

প্রেম।

ভাব গাঢ় হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। ইহাতে হৃদয় সম্যক্ নির্ম্মল হয়, ইষ্টে অতিশয় মমতা হয়। এই প্রেমও দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। এক ভক্তির অন্তরঙ্গ অঙ্গসকল সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়, সেই ভাব গাঢ় হইয়া প্রেম হয়, দ্বিতীয় ঈশ্বর আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎপ্রদান করাতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। প্রেম দুই

প্রকার ;—মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত এবং মাধুর্য্যজ্ঞানযুক্ত। ঈশ্বরের মহিমাজ্ঞান হইতে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয়, ইটি বৈধী ভক্তিতে হইয়া থাকে। রাগাত্মিকা ভক্তিতে প্রায়শঃ মাধুর্য্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয়।

এই ক্রমে প্রেমোদয় হইয়া থাকে; সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা [শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস) তদনন্তর সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজনা, তদনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, [ভজনের বিঘ্ন সকলের তিরোধান] তদনন্তর নিষ্ঠা, তদনন্তর রুচি, তদনন্তর ভাব, তদনন্তর প্রেম। এই প্রেমোদয় হইলে আর বাহিরের সুখদুঃখজ্ঞান থাকে না; সুখ দুঃখ কেবল ঈশ্বরের প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিতে।

ভক্তিরস।

ঈশ্বরেতে রতি স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী ভাব বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী ভাব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। ইহাতে ভক্ত হৃদয়ে চমৎকার ভক্তিরসাস্বাদ হইয়া থাকে। ঈশ্বর এবং তাঁহার ভক্ত আলম্বন বিভাব, ঈশ্বরের গুণাদি এবং ভক্তের ঈশ্বর জন্য চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় অর্থাৎ সুখদুঃখাদিবোধশূন্যতা, এই সকল সাত্ত্বিকভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি প্রভৃতি তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্রভেদে ভিন্ন হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, প্রিয়তা, এই পাঁচ প্রকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন কোন সাধকে ইহার এক একটি মাত্র প্রকাশ পায় তখন তাহাকে কেবলা রতি, এবং যখন বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হয় তখন তাহাকে সঙ্কুলা রতি বলে। কিন্তু এতন্মধ্যে যিটি প্রধানতঃ প্রকাশ পায়, তদনুসারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে।

শমদমাদিপরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণেতে শান্ত রতি দৃষ্টি হয়। ইহাতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান। মহান্ ঈশ্বর এবং আত্মারাম শান্ত ঋষিগণ ইহাতে আলম্বন। উপনিষৎশ্রবণ, বিবিক্তবাস, তত্ত্ববিচার বিশ্বরূপদর্শনাদি ইহাতে উদ্দীপন। নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারিত্ব, মৌন, জীবন্মুক্তিতে সমাদর ইত্যাদি অনুভাব। প্রলয় ভিন্ন রোমাঞ্চ স্বেদ কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, ধৃতি অর্থাৎ দর্শন জন্য সুখ-

দুঃখাভাব এবং মনের নিশ্চাঞ্চল্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। শান্ত পরোক্ষ এবং সাক্ষাৎকারভেদে দ্বিবিধ। যেখানে উদ্দেশে ভক্তি উদ্রিক্ত হয় সেখানে পরোক্ষ এবং যেখানে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি উদ্রিক্ত হয় সেখানে সাক্ষাৎকার।

প্রীতি।

প্রীতিরস দাস্য, এবং লাল্যত্ব ভেদে দ্বিবিধ। ইহার একটীকে সম্ভ্রমপ্রীতি, অপরটীকে গৌরবপ্রীতি বলে। দাসগণের ঈশ্বরে সম্ভ্রম-পূর্ব্বক এবং পুত্রত্বাদি অভিমানিগণের গৌরবপূর্ব্বক প্রীতি হয় বলিয়া একটীর নাম সম্ভ্রমপ্রীতি অপরটীর নাম গৌরবপ্রীতি। হরি এবং তাঁহার দাসগণ একটীতে, হরি এবং তাঁহার লাল্যগণ অপরটীতে আলম্বন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি, কৃপা, শরণাগতপালকত্ব, ক্ষমাশীলত্ব, প্রভৃতি গুণ একটীতে, রক্ষণত্ব লালকত্বাদি গুণ অপরটীতে প্রধান। এদুয়েতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তি এবং স্নেহদৃষ্টি প্রভৃতি উদ্দীপন। আদেশপ্রতিপালন, প্রভুর নিকটে যাহারা প্রণত তাহাদিগের প্রতি মৈত্রী ইত্যাদি একটীর অনুভাব, স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রভৃতি অপরটীর অনুভাব, হর্ষ নির্ব্বেদ প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব প্রাচীনগণ দাস্যভাবকে সর্ব্বপ্রধান গণ্য করিতেন, এবং ইহাকেই তাঁহারা ভক্তিরস বলিয়াছেন।

রস ত্রয়।

সখ্যরসকে প্রেয়োরস বলে। ইহাতে ঈশ্বর এবং তাঁহার সখাগণ আলম্বন। বৎসলরসে ঈশ্বরে বাৎসল্য অর্থাৎ আদরাধিক্য প্রকাশ পায়। মধুর রস——সতী স্ত্রীর কামগন্ধশূন্য স্বামীর প্রতি একান্ত প্রীতির ন্যায়—ঈশ্বরে প্রীতি। [এই সকল রসের বিস্তারিত বর্ণন সময় ও স্থানোপযোগী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।]

ভক্তিতে উপাস্য।

ভক্তিতে উপাস্য কি ছিল নির্ণয় করিয়া আমরা প্রাচীন ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা সাঙ্গ করিতেছি। এ বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভক্তির প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ উপাসকগণের উপাস্য কি স্থির করিয়াছেন আমাদিগের দেখা উচিত। তিনি যখন গোকুলে নন্দকে শক্রযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করেন, তখনি প্রাকৃতিক পদার্থ সকলের অর্চ্চনা

উপদেশ করেন। আবার বসুদেব যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন তিনি বলেন ;

"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥"

হে আর্য্য! হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, তোমরা, ইনি [বলদেব], এই সমুদায় দ্বারকাবাসী, এমন কি সমুদায় চরাচর এইরূপ ব্রহ্মদৃষ্টিতে চিন্তা করিতে হইবে। ভক্তিমীমাংসাসূত্রকার শাণ্ডিল্য এই জন্যই গীতার অভিপ্রায়ানুসারে লিখিয়াছেন ;

"ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ। ৮৬।

অদ্বিতীয় এই জগৎ ভজনীয়, কেন না সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ। সমুদায় জগৎ চিন্তার বিষয় হওয়া অসম্ভব এজন্য ঈশ্বরের প্রকাশের তারতম্যানুসারে জগতের কোন অংশকে উপাস্য বলিয়া শাস্ত্রে স্থির করা হইয়াছে। যথা ভাগবতে লিখিত হইয়াছে ;

"তেম্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥"

৭ স্ক, ১৪অ, ৩২ শ্লো।

হে রাজন্ মনুষ্য, তির্য্যক, ঋষি, দেবতাতে ভগবান্ তারতম্যে অবস্থিত। সুতরাং যাহাতে জ্ঞানাংশ যত অধিক প্রকাশ পায় তাহাই তত অর্চ্চনার বিষয়। মনুষ্য তির্য্যগাদিতে ভগবানের প্রকাশ যত হউক না, যাঁহার নিকট যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তিনি তাহার নিকট ভগবানের বিশেষ প্রকাশ স্থল। সুতরাং গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা সর্ব্বোচ্চ বিষয়।

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ?"

৭ স্ক, ২৫ অ, ২০ শ্লো।

সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যাহার মনুষ্যবুদ্ধি, তাহার সমুদায় শাস্ত্রাভ্যাস কুঞ্জরশৌচবৎ বিফল। এই গুরুতে ভক্তি করিলেই কামাদি সমুদায় দোষ বিনষ্ট হয়।

"এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহঞ্জসা জয়েৎ ২০ । ।"

গুরুকে ঈশ্বর বলা উপচার মাত্র নয়, কারণ পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

"এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ॥ ২১ ॥"

ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রকৃতি এবং জীবের ঈশ্বর। যোগেশ্বরেরা ইহাঁরই চরণ অন্বেষণ করেন, অথচ লোকে ইহাঁকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে।

বিশেষ সময়ে যিনি সাধারণ লোকের আচার্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সমুদায় পৃথিবীকে নূতন ধর্ম্ম অর্পণ করেন, তিনি সর্ব্বজনগুরু বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবানের অবতাররূপে গৃহীত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব আপনি ঈশ্বর-রত্ব অস্বীকার করিলেও প্রধান প্রধান শিষ্যগণ এই কারণেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। গুরুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করা ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান ব্যাপার। তবে যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা সে কেবল নিম্নাধিকারীর জন্য। পূর্ব্বে মূর্ত্তি গঠন করা ছিল না লোকের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধাই মূর্ত্তিগঠনের মূল।

"দৃষ্ট্বা তেষাং মিথোনৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়াযৈ কবিভিঃ কৃতা ॥"

৭ স্ক, ১৪ অ, ৩৩ শ্লো, ।

হে নৃপ! পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা দর্শন করিয়া অর্চ্চনা জন্য ত্রেতা-যুগ হইতে কবিগণ কর্ত্তৃক পুত্তলিকা করা হইয়াছে। কিন্তু পুত্তলিকা অর্চ্চনা করিয়া কিছু হয় না, যদি উপাসকের মনুষ্যাদিতে প্রকাশিত পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ থাকে।

"উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥ ৩৪ ॥"

এই গুরুকে পূর্ব্বে অষ্টভুজ বা চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করিয়া পূজা করা হইত। পরিশেষে এই কাল্পনিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিভুজরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

"স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মঞ্চৈব চতুর্ভুজম্।
পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতত্রয়ং যজেৎ" ॥

অষ্টভুজ মূর্ত্তি স্থূল, কেন না ইহাতে সমুদায় জগৎকে এইরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। চতুর্ভুজ সূক্ষ্ম, কেন না সেই চরাচরের অভ্যন্তরবর্ত্তী অন্তর্যামী পুরুষকে সূক্ষ্মতত্ত্ব সহ এতদ্দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিভুজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন না যাঁহাতে ঈশ্বরের বিশেষ বিকাশ হয় কেবল তাঁহাকেই ইহাতে চিন্ময় ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঈশ্বরের অনন্ত মূর্ত্তি, যে তাঁহাকে যেরূপে চিন্তা করে তিনি তাহার নিকটে সেইরূপে প্রকাশিত হন প্রাচীন বৈষ্ণবগণের এই মত।

ভক্তি শাস্ত্রের অর্চ্চনাতে ঈশ্বর একাকী পূজিত হন না, সপার্ষদ তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সনক সনন্দ নারদ প্রভৃতি বিষ্ণুর পার্ষদ, গোপ গোপিনী গোপবালক কৃষ্ণের পার্ষদ। অর্চ্চনাকালে ইহাঁদিগকে ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রহণ করার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। ইহাঁরা ভক্ত; ইহাঁদিগকে চিন্তা করিয়া তন্ময় হইলে ভক্ত হওয়া যায়, এজন্য ইহাঁদিগের আরাধনা। গোপালতাপনীতে "গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ" এ স্থলে চক্রবর্ত্তী গোপালশব্দে ছিদাম সুদাম প্রভৃতি গোপবালক এবং (লিঙ্গবিপর্যয়ে) গোপীগণ সহ আমি এক এইরূপ চিন্তা করিবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোপালতাপনীর অহংগ্রহ উপাসনাকে এরূপে ব্যাখ্যা করিয়া মহাত্মা চৈতন্য যে অকিঞ্চনা ভক্তি প্রচার করিয়াছেন তাহার সঙ্গে গোপালতাপনীর মতকে এক করা হইয়াছে।

নূতন ভক্তি বিধান।

বহু দিন পরে এই ভক্তিপ্রধান ভারতে আর একটী নূতনবিধ ভক্তিবিধানের অভ্যুদয় দেখিয়া আমার আশা বিশ্বাস জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্য যে, এখানকার কতিপয় সুশিক্ষিত ভদ্রযুবক মৃদঙ্গ করতাল সহ হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, ভাগবতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, ভক্তির সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাঁরা যদিও ব্রাহ্মসমাজের লোক, কিন্তু ভক্তিপথের অনুরাগী হইয়া ইহাঁরা মহাপ্রভুর জীবন পাঠ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহাঁদের প্রচারিত ভক্তিবিষয়ক মত অতি উন্নত এবং বিশুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই, ইঁহারা এক অদ্বিতীয়

নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরপুরুষকে অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। নৃত্য, কীর্ত্তন, মত্ততা, নামজপ, সাধুসঙ্গ, গ্রন্থপাঠ, ব্রতাদি নিয়ম ও প্রেমসাধন; শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মাধুর্য্য ইত্যাদি সকল রসের ইহাঁরা প্রয়াসী, কিন্তু কোন বিগ্রহমূর্ত্তির সেবা করেন না। যাহউক, ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া সভ্য ভব্য হইয়া ভক্তিপথ অনুসরণ করা ইহা সামান্য কথা নহে। ভগবান্ করুন যেন ইহাদের দৃষ্টান্তে হরি-ভক্তির স্রোত বর্ত্তমান কালের শুষ্কজ্ঞানী বিলাসপরায়ণ ব্যক্তিগের মরু-ভূমি তুল্য হৃদয়কে অধিকার করে।

এ সকল শুভ চিহ্ন দেখিলে আমার গৌরাঙ্গের একটি অঙ্গীকার বাক্য মনে পড়ে। যৎকালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে যান, তখন শিষ্যদিগকে এই আশা দিয়াছিলেন যে আমি আরও দুই বার আসিব এবং এ দেশে আর দুই বার হরিসঙ্কীর্ত্তন হইবে। তিনি সশরীরে আসিবেন এমন মনে করিতে পারি না, সম্ভবও নহে তাঁহার কথার তাৎপর্য্যও বোধ হয় সেরূপ ছিল না। যে আধারে হরিভক্তির মত্ততা, নামসঙ্কীর্ত্তনের মধুরতা, সেই খানেই আমার গৌরাঙ্গ আছেন। তাঁহার জীবন ভক্তি ও ভক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেই হরিভক্তিসুধা অবতীর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ যদি চৈতন্যদেবকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়া থাকেন; তবে তাঁহাদের মধ্যে সেই অনুসারে গৌরাঙ্গ প্রভুও আসিয়া বসিয়া আছেন। এই জন্য বোধ হইতেছে, গৌর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা হইবার নহে। শত সহস্র লোক যখন তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রেমভক্তির স্রোতে ভাসি-তেছে, নামরসপানে ও বিতরণে সুখী হইতেছে, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতেছে, তখন আর কি গৌরের আসিবার বাকি আছে? আসিয়াছেনই বা কেন বলিতেছি? ভাবেতে কার্য্যেতে গৌরাঙ্গ চির কাল পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন এবং থাকিবেন।

একটি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রহ্মজ্ঞানীরা মূর্ত্তিপূজা না

মানিয়াও উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনাদিতে বিগলিত হন, অশ্রুপাত করেন, নামরসে ইহঁাদের আবেশ হয়, সময়ে সময়ে মত্ততাও জন্মে। ইহা দেখিলে বিশ্বাস হয় কিছু বস্তু ইহঁারা পাইয়াছেন। নিরাকারের পূজা অর্চ্চনায় এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস ইহা একটি নূতন দৃশ্য। পূর্ব্বতন নিরাকারবাদীদিগের বড় কঠোর ভাব ছিল, ভক্তিরসের লেশ মাত্র তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত না, অদ্বৈতবাদীরা ভগবানের লীলাবিহার মানিত না, কেবল তাঁহাকে অনন্ত নিরাকার নিষ্ক্রিয় অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নিজেদের হৃদয়কে নীরস করিয়া ফেলিত। আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী-দিগের মধ্যেও অনেকেই বৌদ্ধভাব বিশিষ্ট শুষ্ক নিরাকারবাদী, হরির মাধুর্য্যরসে বঞ্চিত, তর্ক বিতর্ক মতামতের বিবাদই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। তবে ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে গোস্বামিশিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত রাম কমল সেনের পৌত্র ব্রহ্মানন্দ শ্রীমান্ কেশব চন্দ্র সেন নীরস জ্ঞানকাণ্ডের স্রোত ফিরাইয়া দিয়া নিরাকার চিন্ময় অনন্ত ব্রহ্মেতে ভক্তি প্রেম অর্পণ করিবার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ভক্তিপথের অনুকূল বটে, তিনি কতক পরি-মাণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশ্য এবং গোপনে. জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সমাজের মধ্যে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীদের কঠোরতার অনেক দূর হইয়াছে।

নিরাকারে ভক্তি প্রেম মত্ততা ইহা কোন কালে কেহ শুনে নাই, হিন্দুশাস্ত্রে এ প্রকার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সাকার মূর্ত্তি ভিন্ন ভক্তি চরিতার্থ হয় না এইটি সাধারণতঃ প্রাচীন সংস্কার। ভাবুকের ভাব নিরাকারে সম্যক্ চরিতার্থ লাভ করিবে ইহা একটি নূতন কথা। অবশ্য যাহা কখন হয় নাই কিম্বা আমরা শুনি নাই তাহা চিরকাল অসম্ভব থাকিবে, ইহা কোন কার্য্যের কথা নহে। প্রত্যক্ষ ঘটনায় অবিশ্বাসই বা কিরূপে করা যায়? কেশবচন্দ্র সেন যেরূপ সরসভাবে পূজা স্তুতি প্রার্থনা করেন তাহা শুনিলে তাঁহার উপাস্য দেবতাকে সাকার বিগ্রহ অপেক্ষাও স্পর্শনীয় বোধ হয়। বাস্তবিক তিনি যে সকল উপদেশ দেন, যে প্রণালীতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করেন তাহাতে

মন গলে, চক্ষে জল আসে। নিরাকারে এত প্রেম ভক্তি অনুরাগ হইতে পারে ইহা পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না। আমি ইহাঁদের উপাসনাদি শুনিয়াছি এবং তাহা শুনিয়া আমার অশ্রুপাতও হইয়াছে। কৃতবিদ্য শিক্ষিত যুবাদিগকেও আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে দেখিয়াছি। মূর্ত্তি নাই, কল্পনা এবং ভাবান্ধতাও এখানে স্থান পায় না, অথচ মত্ততা, ক্রন্দন, কিরূপে এ সকল হয় সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি, ঐ সকল ব্যক্তি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী হইলেও ভগবানের চিন্ময় আনন্দঘন মূর্ত্তিকে এমন ভাবে ধ্যান ধারণা করেন, তাঁহাকে পিতা মাতা সখা জানিয়া দৈনিক কার্য্যের সঙ্গে এত দূর নিকট করিয়া দেখেন, যাহাতে বিগ্রহমূর্ত্তির আর আবশ্যকতা থাকে না। ব্রহ্মানন্দজী ঈশ্বরদর্শন স্পর্শন শ্রবণসম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হৃদ্বোধ হইলে তাঁহার দেবতা যে সাকার অপেক্ষাও জীবন্ত উজ্জ্বল ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় থাকে না। বিশ্বাসই সকলের মূল, চৈতন্যময় শক্তি অন্তর বাহিরে সকল স্থানে বিরাজ করিতেছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই দেবদর্শনের আশা চরিতার্থ হয় এ কথা অযুক্ত নহে। তবে এরূপ সূক্ষ্ম মত সাধারণে কত দূর ধরিতে সক্ষম হইবে বুঝিতে পারি না। যাহউক, ইনি যত দূর করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে ভক্তিপিপাসার্ত্ত মুমুক্ষুদিগের হৃদয় বহু পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতেছে।

অনন্ত অসীম নিরাকার দেবতা, অথচ তিনি সাকার পুত্তলিকা হইতেও সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া ভক্তিকে চরিতার্থ করেন এ কথা শুনিলে হঠাৎ প্রহেলিকাবৎ মনে হয়, কিন্তু ইহার ব্যাখ্যান আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহা মনে লাগে। সাকারবাদীরাও ঈশ্বরকে অসীম অনন্ত চিন্ময় বলিয়া স্বীকার করেন। নিরাকারবাদী ভক্তদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে অন্তবিশিষ্ট সীমাবদ্ধ বিগ্রহমূর্ত্তিতে পরিণত করেন, অনন্তকে অন্তবৎ পদার্থের সঙ্গে এক করিয়া ফেলেন; শেষোক্তেরা সেরূপ ভাবে দেখেন না। তাঁহারা স্বরূপতঃ ঈশ্বরকে অনন্ত সর্ব্বব্যাপী অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন,

কিন্তু মানবের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ত সে ভাব আয়ত্ত করিতে পারে না, এই জন্য ভক্তি প্রেমেতে তাঁহাকে ইহাঁরা জীবন্ত ব্যক্তিরূপে নানা স্থানে দেখেন, সূচ্যগ্রের ন্যায় এক ক্ষুদ্র বিন্দুমধ্যে ধারণা করেন। বিশ্বাসে অনন্ত অসীম সত্তা বর্ত্তমান থাকে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম ঘনচিদানন্দ হইয়া প্রেম নয়নের সম্মুখে নানা ভাবে প্রকাশ পান। সাকারবাদীর ঘনচিদানন্দ রূপ জড় মূর্ত্তির সহিত অভেদ, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তিকে প্রাকৃত দেহ না বলিয়া তাহাকে চিদ্ঘন অপ্রাকৃত বলিয়া থাকেন; নিরাকার-বাদী জড় একবারেই পরিত্যাগ করেন, কেবল চিন্ময় আনন্দঘন বিজ্ঞান ঘনরূপে বিশ্বাসের চক্ষে তাঁহাকে দেখেন,—দেখার অর্থ অনুভব—সুতরাং বিগ্রহমূর্ত্তির অভাব ইহা দ্বারা মোচন হইয়া যায়। তাঁহাদের ভাবোদ্দীপনের বিবিধ উপায় আছে। বিধাতার সৃজিত বিচিত্র শোভাশালী পদার্থনিচয় সমস্তই উদ্দীপন। এই উদ্দীপন এবং আলম্বন ঈশ্বর দুয়ের পৃথকত্ব কোন কালেই বিনষ্ট হয় না। সাকার ও নিরাকারবাদের মধ্যে মূল প্রভেদ এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু ঠিক বস্তু নিরবলম্বরূপে ধরিতে না পারিয়া নিরাকারবাদীরাও অনেক সময় সাকারবাদীর ন্যায় পূজা বন্দনা করিয়া থাকেন। এইজন্য আমার মতে সাধুতা ও মহত্ত্ব বিষয়ে উভয়ের তারতম্য কেবল বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকারের উপর নির্ভর করে না, ভক্তি একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ ঈশ্বরের দয়া মাতৃস্নেহ পুত্রবাৎ-সল্য প্রেম পবিত্রতা মহিমা সৌন্দর্য্য প্রভৃতিকে ব্রাহ্ম ভক্তেরা এখন এরূপ ঘন করিয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে তাহা গ্রথিত করেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাকার মূর্ত্তিও তাঁহাদের নিকট দূরের দেবতা বলিয়া বোধ হয়। এ সকল বড় গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা, সাধক ভিন্ন ইহাতে কেহ দন্তস্ফুট করিতে পারেন না। সে যাহউক, এক্ষণে ভক্তিসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানীদের সাধ্যসাধন তত্ত্ব এই স্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, প্রাচীন কালের ভক্তির সঙ্গে ইহার কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য অনৈক্য আছে তাহা সকলে বুঝিয়া লইবেন!

১। ভক্তির লক্ষণ। সত্যং শিবং সুন্দরং এই তিন স্বরূপবিশিষ্ট পদার্থে হৃদয়ের কোমল অনুরাগের নাম ভক্তি। সত্যস্বরূপে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, মঙ্গলস্বরূপে প্রেম ও ভালবাসা, সুন্দরে মোহিত হওয়া। তুমি আছ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি মঙ্গল আমি তোমাকে ভালবাসি ; তুমি সুন্দর আমি তোমাকে দেখিয়া মোহিত হই। সত্যং শিবং সুন্দরং ভক্তিশাস্ত্রের জপমন্ত্র। সুন্দর ঈশ্বরকে দেখিলে মন আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণের নাম অনুরাগ। বিশ্বাস বিহীন ভক্তি প্রকৃত নহে। এইজন্য উক্ত তিনটি স্বরূপে বিশ্বাস করিবে। যেখানে এই স্বরূপ দেখিবে তথায় ভক্তি অর্পণ করিবে।

২। ভক্তি ও যোগসাধনের মূলে সত্যস্বরূপে সাধন করিতে হইবে। তুমি নাই ইহাতে অবিশ্বাস, তুমি আছ ইহাতে বিশ্বাস। তুমি আছ বলিবামাত্র আর এক জনের সত্তা উপলব্ধি হইবে। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশানে অথবা কোন ভয়ানক স্থানে যাইবামাত্র তাহাদের শরীর ছম্ ছম্ করে এবং মনে হয় যেন সেখানে কে আছে। যদিও এ দৃষ্টান্ত ভাল হইল না, তথাপি "তুমি আছ" বলিবামাত্র শরীর ছম্ ছম্ করিবে, কেহ কাছে আছে ইহা বোধ হইবে। সমস্ত আকাশে তুমি ব্যাপ্ত আছ এবং আমার আত্মাতে তুমি আছ এ দুইয়ের প্রভেদ আছে। একটি পরিব্যাপ্ত অপরটি সঙ্কীর্ণ। তাঁহার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে তিনি। "তুমি আছ" ইহা বারংবার উচ্চারণ করিতে হইবে। কোন একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে হইবে, ঐ তুমি আছ! কখন ঊর্দ্ধে, কখন সম্মুখে কখন পার্শ্বে। সত্যস্বরূপের সাধনার পূর্ণতাই দর্শন। সেই দর্শন ভিন্ন বিশ্বাস স্থায়ী হয় না। সত্যস্বরূপের সাধন নির্গুণ, ইহাতে কোন গুণ আরোপিত হইবে না। নির্গুণ সত্তার ধ্যান করিতে হইবে। ইহা সফল হইলে উহাতে মঙ্গলাদি স্বরূপ দর্শন সহজ হইবে।

৩। সাধনের সময় মন চঞ্চল কিম্বা ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে সাধন ভঙ্গ হয়। ইহাকে পোষণ না করিয়া "দূর হ" বলিয়া তাড়াইতে হইবে। মন স্থির না হইলে সংযম হয় না। সাধনের সময় চারিটি

বিষয় স্থির রাখিতে হইবে। (১) স্থান, (২) আসন, (৩) শরীর, (৪) মন। স্থান ও আসন নির্দ্দিষ্ট চাই। শরীর পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইলে চিত্ত অস্থির হয়, এই জন্য একভাবে বসিতে হইবে। স্থান আসন শরীর স্থির হইলে মনও কতক পরিমাণে স্থির হয়। মন স্থির না হইলে সাধন হয় না।

৪। সংসার ও সামাজিক প্রতিবন্ধক সাধনের প্রধান শত্রু। সংসারের ঠিক বন্দোবস্ত অগ্রে না করিলে সাধনের ব্যাঘাত হয়। সামাজিক ব্যবহারে, কার্য্যে ও বাক্যে নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে।

৫। ভক্তি পাপ পুণ্যের অতীত। পাপ নষ্ট হইয়া পুণ্যের উৎপত্তি হইলে পরে সেই পুণ্যভূমিতে ভক্তির উৎপত্তি হয়। ভক্তি সত্যের উপর রং দেয় মত্ততা প্রেমের ফল। ভক্তির হেতু ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার হেতু নাই, এই জন্য ভক্তিকে অহৈতুকী বলে। আমার কিছু ভাল লাগে না, এই ভাবে ভক্তির আরম্ভ। আমার ভাল লাগে এই ভক্তির অবস্থা।

৬। ভক্তি পাপ পুণ্যের অতীত হইলেও ভক্তির আবার পাপ পুণ্য আছে। শুষ্কতা ভক্তির পাপ, প্রেম ও মত্ততা ভক্তির পুণ্য। হৃদয়প্রস্তরকে ব্যাকুল ক্রন্দনে বিগলিত করিতে হইবে। ব্যাকুল ক্রন্দনের জলে হৃদয় উর্ব্বরা হয় না, প্রেম ও আনন্দজলে হৃদয় উদ্যান উর্ব্বরা হয়। সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। অহৈতুকী ভক্তির ক্রন্দনও অহৈতুকী। সাধনভক্তির উপায় সাধন।

৭। যোগের সাধন মৃত্তিকার উপর; ভক্তির সাধন জলের উপর। দৈব ও সাধন দুই উপায়ে ভক্তি লাভ হয়। দেবদত্ত যে ভক্তি তাহা সাধন দ্বারা রক্ষিত হয়। সাধনের উপর নির্ভর না করিয়া সাধন করিবে, দেবপ্রসাদের উপর ফলের প্রত্যাশা রাখিবে। উভয় উপায় শিরোধার্য্য। দেবপ্রসাদ বায়ুর ন্যায় কখন কোন্ দিক হইতে আইসে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু সাধনের দ্বারা ঐ বায়ুকে সকল দিক হইতে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

৮। ভক্তি দেবপ্রসাদে হইলেও তাহার জন্য সাধন চাই, কিন্তু সাধনের জন্য ঈশ্বরের নিকট দাওয়া করা উচিত নয়। সাধন কর, পরে যথাসময়ে তিনি ফল দিবেন। তিনি ফল না দিলেও সাধন করিতে হইবে। যখন ভক্তি আসিতেছে না, তখন জানিবে যে অত্যন্ত আসিবে। তাহার জন্য ব্যাকুলতা চেষ্টা চাই। এই জন্য ভক্তি পাইলেও লাভ, না পাইলেও লাভ।

৯। "সত্যং শিবং সুন্দরং" ভক্তির বীজ মন্ত্র। সত্যসাধন যোগ ও ভক্তির সাধারণ ভূমি, শিবং ও সুন্দরং ভক্তির বিশেষ সাধন। স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনিয়াছ। ঐ দুই শাস্ত্র শিবং অর্থাৎ মঙ্গল ভাবের সাধন। ঈশ্বরের দয়া দুই প্রকার, সাধারণ এবং বিশেষ। অন্ন পান জল বায়ু ঔষধ পথ্য প্রভৃতি সাধারণ। নিজের প্রতি বিশেষ দয়াকে বিশেষ বলে। এই দুই দয়া স্মরণপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরকে ভালবাসার নাম স্মৃতিশাস্ত্র। প্রতিদিন জীবনের বিশেষ ঘটনা স্মরণ করিয়া ও লিখিয়া কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা সাধন করিতে হইবে। তুমি যদি কখন মানুষকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্য জান কিরূপে ভালবাসিতে হয়। যিনি উপকার করেন তাঁহাকে ভালবাসা যায়। তাঁহাকে দেখিলেই ভালবাসা হইবে। ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া ভালবাসিতে হইবে। প্রথমে স্মরণ করিয়া ভালবাসা, পরে দেখিয়া ভালবাসা। যখন তিনি দর্শন দেন তখন আর উপকার স্মরণ করিতে হয় না, দেখিবামাত্রই ভালবাসা উপস্থিত হয়। ইহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে।

১০। প্রেমময়কে দর্শন করিয়া যে ভালবাসা জন্মে তাহার হেতু নাই। দর্শনের প্রেমের নিকট স্মরণের প্রেম নিকৃষ্ট, কারণ শেষোক্তটি হেতুমূলক। চন্দ্রের উপকার স্মরণ করিয়া কেহ তাহাকে ভালবাসে না তাহাকে দেখিলেই ভালবাসা উপস্থিত হয়। প্রথমে দর্শনপ্রেমে হৃদয় আর্দ্র হয়, পরে তাহা ঘন হইয়া মেঘের ন্যায় হয়, আর একটু ঘন হইলে তাহা হইতে অশ্রুরূপে বারিবর্ষণ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া যদি অশ্রুপাত না হয়, তবে তাহা সম্যক্ দর্শন নহে। ভিতরে ভিতরে প্রেম যদি

হইয়া থাকে তাহা ঘন প্রেম নহে। অশ্রুকে সামান্য মনে করিও না, একটুকু অশ্রু একটি মুক্তা অপেক্ষাও মূল্যবান্।

১১। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়। পূর্ণিমাতে কটালে বান ডাকে। জল নদী খালে প্রবেশ করে, শুষ্কভূমি প্লাবিত হয়। সেইরূপ হৃদয়াকাশে প্রেমচন্দ্র উদিত হইলে জোয়ার হয়, পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বান ডাকে। তখন হৃদয় প্লাবিত হয়, পাপরূপ যে ময়লা জমিয়াছিল তাহা ভাসিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে খুব নীচেকার পাপ যায় না। ছোট ছোট খালে জল দেখিলে জানা যায় জোয়ার হইয়াছে, তেমনি অশ্রুপাত হইতে দেখিলে মনে হয় হৃদয়ের মধ্যে জোয়ার আসিয়াছে।

১২। প্রেমচন্দ্র যতই দেখিবে ততই হৃদয়ে জোয়ার হইবে ও বান ডাকিবে। এইরূপে ক্রমে হৃদয় নরম হইয়া উর্ব্বরা হইবে। সেই উর্ব্বরা ক্ষেত্রে নানাপ্রকার স্বর্গীয় পুষ্প ফুটিতে থাকে। ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় আর্দ্র হইলে বিনয় দীনতা ও দয়া এই তিনটি ফুল ফোটে। তখন হৃদয় উদ্যানের ন্যায় হয়। অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও ধনগর্ব্ব ভক্তির শত্রু। অহং ভাবকে ত্যাগ করিয়া বিনয়ী হইতে হইবে। ঈশ্বরকে রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া নিজে ফকিরী বেশে তাঁহার চরণ সেবা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব জানিয়া অকিঞ্চন হইতে হইবে। যখন প্রেমময় ঈশ্বর অন্তরে প্রবেশ করেন, তাঁহার সঙ্গে তখন সমস্ত জগৎ প্রবেশ করে। ঈশ্বর দেন, ভক্ত গ্রহণ করেন, তাহা পুনরায় তিনি জগৎকে বিতরণ করেন।

১৩। দূরবীক্ষণের দুই দিকের কাচে যেমন নিকট ও দূরের পদার্থ ছোট ও বড় দেখায়, তেমনি অহঙ্কার কাচে আপনাকে দেখিলে বড় দেখায়, বিনয়ের মধ্যে দিয়া দেখিলে ছোট বোধ হয়। ঈশ্বর সমস্ত কাজ করেন, ভক্ত বসিয়া বসিয়া দেখেন। শিবং সাধনে মন মুগ্ধ হইলে ভক্তির তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হয়।

১৪। সুন্দরের সাধন স্বতন্ত্র নহে। ইহা শিব সাধনের ফল। প্রেম যত ঘন হইবে তত ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। সে সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়, কিন্তু চেতনা থাকে। হাস্য ক্রন্দন নৃত্যাদি

করিলেও ভক্তের জ্ঞানচক্ষু অনিমেষে প্রেমচন্দ্রকে দেখে। নর্ত্তকী যেমন মস্তকে কলসী ঠিক্ রাখে, ভক্তও তদ্রূপ। বাহ্য বস্তুতে তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়।

১৫। ঈশ্বরদর্শনে অগ্রে মন মুগ্ধ হয়, পরে তাহা শরীরে প্রসারিত হয়। অজ্ঞানতা মত্ততা নহে, ভক্তের একটি নাম চৈতন্য সেই। সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখা প্রকৃত মত্ততা। প্রকৃত মত্ততা জীবনে মধুর ভাব ধারণ করত স্থায়ীভাবে অবস্থিতি করে। কখন কর্কশতা কখন মত্ততা, ইহা ঠিক নহে; জীবন মত্ত হইলে ভক্তের বাক্য ও ব্যবহার মধুময় হয়। বৃক্ষের শাখায় জল দিলে তাহা সজীব হয় না, মূলে জল দেওয়া প্রয়োজন; তদ্রূপ হৃদয় মত্ত হইলে জীবন নরম হয় না। মাদকসেবী যেমন ধোঁয়া গিলিয়া ফেলিয়া নেশার জমাট করে, সেইরূপ জীবনকে মত্ত করিবার জন্য ভাব ভিতরে পোষণ করিতে হইবে।

১৬। মত্ততা যেমন শরীরে কিম্বা ভাবে নহে, জীবন; তেমনি বাহ্যোপায়ে যে মত্ততা হয় তাহা দর্শনমূলক নহে, অবস্থামূলক। তাহা স্থায়ী হয় না। অতএব সজন মত্ততা অপেক্ষা নির্জ্জন মত্ততাই প্রকৃত। নির্জ্জনে প্রেমচন্দ্রকে দেখিলে মন মত্ত হয়। ইহা স্থায়ী এবং দর্শন-মূলক। সুতরাং নির্জ্জন প্রমত্ততাই ঠিক।

১৭। মত্ততা ও মিষ্টতা এক। ঈশ্বর মিষ্ট কি না আস্বাদন না করিলে তাহা জানা যায় না। মত্ততার সময় তাঁহার পানে চাহিলে মিষ্টতা হয়। এ বিষয়ে সাবধান, মিথ্যা কল্পনা যেন না আসে। মিষ্ট না লাগিলে "দয়াময় কি মধুর নাম" বলিবে না। জ্ঞানী চিনিকে মিষ্ট বলিতে পারেন, ভক্ত আস্বাদন না করিয়া তাহা বলিতে পারে না। মিষ্টতা ভোগ করা আর জ্ঞানেতে ঈশ্বরকে মিষ্ট বলা ইহার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। মত্ততাবিষয়ে নিজের ধাতু বুঝিবে। কখন আসে এবং কখন তাহা ছাড়িয়া যায় বুঝিতে হইবে। অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস কোটির কোটি মধ্যে এক জন পান করে। যখন মিষ্টতা ভোগে বঞ্চিত হইবে, তখন দুঃখিত হইবে, ব্যাকুল হইবে। বলিবে, আমি পাথর

থাকিব না। জল হইব, প্রেমিক হইব। ক্রমে বিচ্ছেদ অল্প হইয়া মত্ততা অধিক কাল স্থায়ী হইবে। যথার্থ মত্ততার মিষ্টতা অনেক ক্ষণ থাকে। কখন মিষ্টতা এবং কখন তিক্ততা আসে তাহা অনুধাবন করিবে।

১৮। ভক্তি স্বাভাবিক, এইজন্য ইহা সুলভ এবং দুর্ল্লভ। সুলভ এই জন্য যে, ভক্তি-উত্তেজক ব্যাপারের মধ্যে হৃদয়কে রাখিলে ভক্তি হয়। দুর্ল্লভ এই জন্য যে, ভক্তি এত কোমল যে, একটু আঘাত লাগিলেই উহা নষ্ট হয়। ভক্ত চটেন না, কিন্তু ভক্তি সহজে চটিয়া যায়। চক্ষুতে সামান্য কুটা পড়িলে ব্যথিত হইতে হয়, ভক্তিও তেমনি। মত্ততাও এইরূপ শীঘ্র হয় এবং শীঘ্র যায়। ভক্তিকে সমগ্র হৃদয় দিতে হইবে। ভক্তি যখন বাড়ে খুব বাড়ে, কিন্তু একবার ভাঙ্গিলে শীঘ্র গড়ে না। ঠিক যেন কাচের মত, ঠিক যেন দুগ্ধে গোরোচনা। অতএব ইহাকে কোনরূপ বাধা দিবে না। ঈশ্বরকে এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুকে ভাল বাসিবে। এক শৃঙ্খলে সমস্ত বাঁধা থাকিবে। তখন তাঁহার নাম মিষ্ট হইয়া যাইবে; সকলই মধুময় ভাব ধারণ করিবে।

১৯। নাম অমুল্য ধন। বস্তুতে প্রেম হইলে, তাহার নামে প্রেম হয়। বস্তু ছাড়া নাম নহে, নামছাড়া বস্তু নহে। এইজন্য নামেতে মত্ততা হয়। বস্তুর যেমন গুণ নামের তেমনি আকর্ষণ। কেহ কেহ বলে, নিকৃষ্ট সাধকদিগের জন্য আগে নাম সাধন আবশ্যক। যে বস্তুর মহিমা বুঝিয়াছে, সেই নামের মহিমা বুঝিতে পারে। আগে বস্তুতে প্রেম হইলে পরে তাহার নামে প্রেম হয়। ভক্তের পক্ষে নামসাধন ঈশ্বরদর্শন অপেক্ষা ন্যূন নহে। পরিত্রাণের আশায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করা বিশ্বাসীর পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু ভক্তকে ভক্তির সহিত নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। তোমার পক্ষে আগে দর্শন, পরে নামে মত্ততা। প্রেমোচ্ছ্বাস নাই, অথচ জগদীশ্বর জগদীশ্বর বলিয়া ডাকিতেছি, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ *।

* কবীর এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উপরোক্ত বাক্যের সহিত এক। "পণ্ডিতেরা যে বাদানুবাদ করেন তাহা মিথ্যা। রাম বলিলেই

২০। জীবে দয়া ভক্তিশাস্ত্রের একটী প্রধান আদেশ। শিবং এর প্রতি প্রেম হইলেই তাঁহার নামে ভক্তি এবং জীবে দয়া বর্দ্ধিত হয়। ব্রহ্মানুরাগের প্রতি ঘনানুরাগ হইলে তাঁহার নামে ভক্তি ও জীবে দয়া ঘন হয়। পরোপকারেতে অহঙ্কার আছে, অতএব তাহা করিবে না। পরোপকার যিনি করেন তাঁহার অন্যকে নীচ মনে হয়, এই জন্য ভক্তিশাস্ত্রে উহা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহাতে পরসেবা আছে। জীবে দয়া অর্থ পরসেবা। সেবিত উচ্চ ও সেবক নীচ হন। ভক্তের স্থান পরপদ-তলে। মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মের গন্ধ আছে বলিয়া তাহার প্রতি প্রেম হয়; কোন গুণের জন্য নয়। এক জনের অনেক দোষ থাকিতে পারে কিন্তু তথাপি সে প্রেমাস্পদ। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধরূপ একটু চিনি তাহাতে আছেই আছে। চারিদিকে উচ্ছের ক্ষেত, মধ্যে একটু আখ, চারিদিকে তিক্ত, মধ্যে একটু মিষ্টরস। ভক্তের প্রতি ভক্তের আরও অধিক প্রেম। জীবে দয়া বা প্রেম, ইহার সাধারণ ভূমি সম্পর্কমূলক, গুণমূলক নহে। জীবে ঘন দয়া না হইলে নামেও ভক্তি হয় নাই জানিবে।

জীব আমার প্রভু, তাঁহার সেবায় আমার পরিত্রাণ হইবে, ইহা একটি বিশ্বাসরাজ্যের কথা। পুণ্য হইবে বলিয়া পরসেবা করিবে। পিতা মাতা যেমন নির্গুণ রুগ্ন সন্তানকে ভাল বাসেন, তন্ন্যায় পরসেবা। প্রেমের কোন হেতু নাই। শুষ্কতাসত্ত্বেও যেমন বিশ্বাসের সহিত নাম

যদি লোকে পরিত্রাণ পায়, তবে খাঁড় বলিলেই মুখ মিষ্ট হইতে পারে। যদি অগ্নি বলিলে পা দগ্ধ হয় ও জল বলিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, আর যদি ভোজন বলিলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তবে রাম বলিলেই লোক নিস্তার পাইবে। দর্শন ও স্পর্শন না করিয়া কেবল নামোচ্চারণ করিলে কি হয়? ধন বলিলেই যদি ধনী হয় তবে আর কেহ নির্দ্ধন থাকে না। মনুষ্যের সঙ্গে শুক পক্ষী হরিনাম করে, কিন্তু সে হরির মহিমা জানে না। যদি কখন সে জঙ্গলে উড়িয়া যায়, তবে আর হরি স্মরণ করে না। বিষয়মায়াসংযুক্ত দেহই সত্য, এই কথা বলা হরিভক্তি জনের পক্ষে হাস্যের বিষয়। কবীর কহে "রামভজন না করিলে বাধা পড়িয়া যমপুরে যাইবি।"

সাধন করিবে, তেমনি প্রেম না থাকিলেও বিশ্বাসের সহিত আপনাকে শূদ্র জানিয়া ব্রাহ্মণবোধে সকল মানবের সেবা করিবে।

২১। পরসেবার জন্য দুই বল তোমার সহায়। এক আন্তরিক প্রেমের বেগ, অপর পরসেবায় পরিত্রাণ,—ইহাতে বিশ্বাস। সন্তানের প্রতি মাতার যেমন টান স্বাভাবিক, ঈশ্বরসন্তানের প্রতি তেমনি ভক্তের টান। যখন প্রেমের টান হইবে তখন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে। সর্ব্বত্র যাহাতে সেই প্রেমের বেগ হয় তাহা করিবে। এই যোগের সঙ্গে পরিত্রাণের আশা বিশ্বাসের যোগ হইলে প্রভূত বল বৃদ্ধি হইবে। পরিত্রাণ হইবে এই আশা থাকিলে মানুষ সকল কার্য্যই করিতে পারে। ভক্তি বিনয়ের সহিত পরসেবা না করিলে ধর্ম্ম হয় না। কাহারো কিছু সেবা করিয়া যদি শরীর মন না জুড়ায় তবে তাহা ঠিক নহে। পরিত্রাণ পাইব এইরূপ বিশ্বাসে যদি সামান্য কার্য্যও কর, তাহাতে পুণ্য হইবে। স্বাভাবিক স্নেহের অনুরাগ আবার বিশ্বাস মূলক অনুরাগ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু তোমার নিকট দুইটি বল আসিবে। সেবায় ছোট বড় নাই। সেবায় পরিত্রাণ, এই বিশ্বাসে জগতের লোকের সেবা করিবে। ভালবাসা একটি সাধারণ ভাব, পাত্রবিশেষে তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ মিশ্রিত হয়। সন্তানের কোন অভাব দেখিলে মাতার স্তনে যেমন দুগ্ধ আসে, জীবের দুঃখে ভক্তের তেমনি দয়া হইবেই হইবে।

২২। চক্ষু (বিশ্বাস চক্ষু) ভক্তির যন্ত্র। বস্তু না দেখিলে ভক্তি হয় না। ভক্তিরাজ্যের দ্বার চক্ষু। চক্ষুর দ্বারা ভক্ত ও যোগী ঈশ্বরকে দেখেন। যোগের দেখা কেবল "তুমি আছ"। কিন্তু সাদা চক্ষে ভক্তি হয় না। সজলনয়ন না হইলে ঈশ্বরের প্রেম পুণ্যের রং প্রতি-বিম্বিত হয় না। ক্রমে সেই জলে সমস্ত ভাসিবে। রূপের ভিতর সৌন্দর্য্যমাধুরী না দেখিলে ভক্তি হয় না। যতক্ষণ দর্শন না হয় কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রেমাশ্রু আসে তাহা কর। নিরীক্ষণ করিতে করিতে আঠার মত একটা বস্তু চক্ষের সঙ্গে রূপকে বদ্ধ করিয়া ফেলিবে।

২৩। ঈশ্বরদর্শন যোগীর লক্ষ্য, ভক্তের উপলক্ষ। দর্শনের জন্য দর্শন ভক্তিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। প্রত্যেক বার দর্শনে ভক্তের অনুরাগ প্রেম উদ্বেলিত হইবে। উচ্চ ভক্ত যিনি তাঁহার দর্শনমাত্র ভক্তি উথলিত হয়। একবার দেখিবামাত্র যদি তেমন ভাব না হয় তবে ভক্তচক্ষে দেখা হয় নাই। ভক্তিশাস্ত্রে দর্শন অপেক্ষা ভক্তি উৎকৃষ্ট। বলিতে পার, ভাবে মন মগ্ন হইলে কি দর্শন হয় না ? মত্ততার অবস্থায় দর্শন-সূত্রটি ধরিয়া রাখিবে। কিন্তু তখন দর্শনের কথা ভাবিবে না। যেমন একটি যন্ত্রের দুইটি মুখ, এক দিক্ ব্রহ্মরূপে মগ্ন, অন্যদিকে যেন উৎস হইতে জল উঠিতেছে। দেখা বন্ধ হইলে জল উঠিবে না। কিন্তু দর্শনের দিকে খেয়াল রাখিবে না। এক বার দেখিয়াই ভাবসাগরে ডুবিবে। বস্তু এক দিকে, ভাব এক দিকে। বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগীর ধর্ম্ম, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তের ধর্ম্ম। যোগ বস্তুপ্রধান, ভক্তি ভাবপ্রধান। " এই তুমি " ইহা বলিতে বলিতে ভাবের প্রাবল্য। এই প্রাবল্য স্থির কি অস্থির, কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি, পরে বিবেচ্য।

২৪। পুণ্যভূমিতে যোগ ভক্তি জ্ঞান সেবা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পাপের লেশ মাত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যাই পাপ প্রলোভন আসিবে অমনি প্রভূত তেজে "দূর হ" বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। পাপকার্য্য পাপ কথা বিনাশ করিয়া চিন্তা হইতেও পাপকে তাড়াইতে হইবে। অতএব পুণ্যসঞ্চার কর, জিতেন্দ্রিয় হও। পুণ্যের দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া জীবন যাপন করিবে। ব্রতধারী পবিত্র চিত্ত বলিয়া অন্য হইতে লোকে তোমাদিগকে ভিন্ন করিয়া জানিতে পারিবে।

২৫। সংসার-বাসনাশূন্য হইয়া ঈশ্বরস্পৃহাকে বৃদ্ধি করিবে। পার্থিব সুখবাসনা থাকিবে না। বাসনাবর্জ্জিত ব্রতধারী বলিয়া সাধারণ হইতে তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবে। সংসারী ও ব্রতহীনদিগের সঙ্গে ব্রতধারীর বিশেষ পার্থক্য থাকিবে। যদি সে পার্থক্য বুঝা না যায় তবে ব্রতপালন সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে। সমস্ত বাসনা ত্যাগ, অল্পে সন্তুষ্টি ও বৈরাগ্য, এই সকল ব্রতপালনের

লক্ষণ। সংসারের ধন মান সুখের লোভ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় ধনের লোভে প্রলুব্ধ হইতে হইবে। বাসনাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে।

অধুনাতন উল্লিখিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত, বিশ্বাস ও কার্য্যপ্রণালী সাধারণতঃ ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে, ইহাঁদের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহ আন্দোলন জীবনীশক্তির চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়; এই জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকার পাঠকগণকে এ বিষয়ে যত দূর আমি অবগত হইয়াছি তাহা শুনাই। ভক্তিবিষয়ক ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদরূপে উহা আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা আলোচনা ও অনুধাবনের বিষয়ও বটে। কারণ, পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সাধুগণ ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। ভরসা করি, এখানে ব্রহ্মসভার মত, বিশ্বাস, কর্ম্মকাণ্ড, ভজন ও সাধনপ্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত করিলে কাহারো ক্লেশকর বোধ হইবে না।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল সুবিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা নগরে ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য এক নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রসিদ্ধ পিরালী বংশীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার ভার গ্রহণ করেন এবং বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সরস উপাসনা আরাধনা প্রচলিত করেন। ইহাঁর জীবন ঋষিদিগের ন্যায় অতি মহৎ, দেখিলে প্রমাণ করিতে ইচ্ছা হয়। রামমোহন রায়প্রতিষ্ঠিত শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানকে দেবেন্দ্র বাবু উপাসনাদিদ্বারা অনেক পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী করত তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে কতক পরিমাণে ইনি উন্নত এবং বর্দ্ধিত করিয়া কিছু দিন সভার কার্য্য চালাইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি অতি প্রাচীন হইয়াছেন, একাকী পর্ব্বতে অরণ্যে বসিয়া যোগ ধ্যান করেন। ইহাঁর কতিপয় কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের দ্বারা সমাজের নিয়মিত কার্য্য এক্ষণে সাধিত হয়। এই মহাত্মার পর রামকমল সেনের পৌত্র এই

ধর্ম্ম এবং সভাকে বিধিপূর্ব্বক সংস্কার এবং কার্য্যকর করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কেশব চন্দ্র সেন্ যে সকল ধর্ম্মমত এবং সাধনানুষ্ঠান প্রচলিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে বিচিত্র অদ্ভুত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ভিতরকার সকল কথা শুনেন নাই তাঁহাদের পক্ষে ইহা এক নূতনবিধ অদ্ভুত ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে শেষোক্ত ব্যক্তিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্র পরিচিত; আমি যাহা কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি সে সমস্ত প্রায় তাঁহারই প্রচারিত মত ও বিশ্বাস। নিম্নলিখিত নূতন শ্লোকটির দ্বারা এ ধর্ম্মের সাধারণ ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।—

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

এই সুবিশাল বিশ্বই ব্রহ্মের পবিত্র মন্দির, নির্ম্মল চিত্তই তীর্থ, সত্য অবিনশ্বর শাস্ত্র, বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, প্রীতি পরম সাধন, স্বার্থনাশই বৈরাগ্য, ইহা ব্রাহ্মগণ বলিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত মতগুলি ইহাঁদের সাধারণ মূল মত, ইহাতে বিশ্বাসী না হইলে ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হওয়া যায় না।

সাধারণ মূল মত। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় নিরাকার চিৎস্বরূপ, তিনি অনন্ত, মঙ্গলস্বরূপ এবং পবিত্র। আত্মা অমর, মৃত্যু কেবল শরীরের বিয়োগ, পুনর্জ্জন্ম নাই, পরলোকে ইহ জীবনেরই উন্নতি হয় এবং কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র—বাহিরের জগৎ এবং আত্মানিহিত সহজজ্ঞান। বাহিরে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া, এবং অন্তরে স্বভাবতঃ তাঁহার অস্তিত্ব, পরকাল, নীতিবিষয়ক সমুদায় মূল সত্য শিক্ষা করা যায়। স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এ ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বর কথন অবতাররূপে মানবদেহ ধারণ করেন না। তাঁহার দেবভাব সকলেতে আছে, ব্যক্তিবিশেষে উহা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। ঈশা মুসা মহম্মদ নানক চৈতন্য এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি। তাঁহারা অভ্রান্ত

নিষ্পাপ নহেন, কিন্তু সাধু, এই জন্য তাঁহারা সকলের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন। পাপ করিলে তাহার দণ্ড হয়। ঈশ্বর পাপীর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক প্রকার যন্ত্রণা প্রেরণ করেন, তাহা ভোগ করিয়া জীব তাঁহার নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করে, তদনন্তর উভয়ের সম্মিলন হয়, ইহাকেই প্রায়শ্চিত্ত বলে। পাপচিন্তা, পাপকার্য্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যপথে গমনের নাম মুক্তি, ইহার উন্নতি অনন্তকাল। যিনি অসীম আনন্দ ও পুণ্যের আকর, জীব তাঁহাতে শান্তিলাভ করিবে, তাঁহার সহবাসই স্বর্গভোগ। আন্তরিক প্রেম ভক্তি বিনয় চিত্তসংযম ইহাই ইষ্টপূজার উপকরণ। এই পূজা চারি অঙ্গে বিভক্ত। ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ও গুণের আরাধনা, তাঁহাকে সদ্রূপে ধ্যান, তাঁহার দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা, এবং পাপ হইতে মুক্তি-লাভের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা। নিত্য পূজার দ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসমাধান হয়। এইরূপ উপাসনা, সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, সৃষ্টির শোভা ও কৌশল দর্শন, নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা, ইন্দ্রিয়দমন, পাপের জন্য অনুশোচনা,—ঈশ্বরের করুণার সহিত এই গুলি মিলিত হইলে ধর্ম্মসাধন হয়। এ ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। বিশ্বাস ভক্তি পবিত্রতা যাহার আছে সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। জাতিভেদ বিনাশ করিয়া সকলকে এক পরিবারে বদ্ধ করা এ ধর্ম্মের লক্ষ্য। অন্যান্য সকল ধর্ম্ম হইতে ইহা ভিন্ন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কাহারো বিরোধী নহে। অপর সকল ধর্ম্মের যে অংশ সত্য তাহা ইহার সম্পত্তি। এ ধর্ম্ম নিত্যকালের, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়াছে এবং বিশ্বব্যাপী। কর্ত্তব্য চতুর্ব্বিধ; (১) একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস, প্রীতি, উপাসনা ও সেবা করা। (২) নিজের শরীর রক্ষা, বিদ্যাশিক্ষা, আত্মশুদ্ধি। (৩) অপরের প্রতি সত্য কথন, অঙ্গীকার পালন, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়ব্যবহার, পিতা মাতা ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং আত্মীয়দিগকে প্রীতি, ও জগতের সকল নরনারীকে ভাই ভগিনীনির্ব্বিশেষে ভালবাসিয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের অভাব মোচন ও হিতসাধন। (৪) পশুপক্ষীদিগের প্রতি দয়া।

বিশেষ মত। ঈশ্বরকে আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্বাসের চক্ষে দেখা যায়, তাঁহার আদেশ অন্তরে শুনা যায়, হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করা যায়। যেমন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, তেমনি তিনি বিধাতা প্রত্যেকের পিতা মাতা অভিভাবক, সকলের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, তাঁহার কৃপা এবং দৈবশক্তি ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। যুগে যুগে তিনি ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিয়া জীব উদ্ধার করেন। সাধু মহাত্মাগণের জীবনে তিনি বিশেষরূপে প্রকাশিত। তাঁহারা পরিত্রাণের সহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মবিধান তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ মঙ্গলসঙ্কল্পের অন্তর্গত এক একটি বিশেষক্রিয়া। এই ধর্ম্মকে ইহাঁরা "নববিধান" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভগবান্ বর্ত্তমান কালে ভারতে ও বঙ্গদেশে বিবিধ লীলা করিতেছেন এইরূপ ইহাঁদের বিশ্বাস। এজন্য ব্রহ্মানন্দজী এবং তাঁহার পারিষদ ভক্তবৃন্দ বিশেষরূপে চিহ্নিত এবং আহুত হইয়া নববিধি প্রচার করিতেছেন। স্বর্গবাসী মহাত্মাদিগের সাধুতার অংশাবতাররূপেও ইহাঁরা অভিহিত হইয়া থাকেন। ঈশা মুসা মহম্মদ চৈতন্য শাক্য সক্রেটিশ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিবৃন্দ এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মহজ্জীবনরূপ পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া ঐ সকল মহাত্মাগণের সাধুতা উপার্জ্জনের জন্য ইহাঁরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন এবং তৎসঙ্গে অমরাত্মা মহাজনদিগের বিশেষ বিশেষ সদ্গুণের অনুকরণপ্রয়াসী হন। হিন্দুদিগের ন্যায় পুনর্জ্জন্মে ইহাঁদের বিশ্বাস নাই। তবে সত্য মঙ্গলভাব সাধুতাকে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত কালের গুণ বলিয়া মানেন, সুতরাং ভক্ত মহাপুরুষদিগের সাধুতা ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রেম চিরকালই সেই এক অখণ্ড বস্তু বলিতে বাধ্য হন। যুগে যুগে ধার্ম্মিক মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মে, কিন্তু তাহাদের সাধুভাব সকল মূলতঃ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত নিত্য কালের ধর্ম্মভাবই পৃথিবীতে গতায়াত করে, তাহা মূলেতে নূতন নহে, যোগাযোগের দ্বারা নবীভূত হয়, এবং সে স্বর্গীয় বস্তু, মরণশীল বা পরিবর্ত্তনশীলও নহে। এই অর্থে ইহাঁরা আধ্যাত্মিক পুনর্জ্জন্ম এক প্রকার স্বীকার করেন বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা আংশিক

পুনর্জন্ম, সর্ব্বাঙ্গীন নহে। এ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব "বিধান ভারত" নামক যুগধর্ম্মপ্রতিপাদক হরিলীলা মহাকাব্যে বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিবৃত আছে।

এ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা সাধক তাঁহারা পৃথিবীর যত ভাল মত ও কার্য্য আছে সকলই আপনার বলিয়া লয়েন, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সাধকদিগের ন্যায় ইহাঁদের অনেক আচার ব্যবহার আছে। প্রাতঃস্নান, নামগান, সঙ্কীর্ত্তন, ধ্যান, উপাসনা, যোগসাধন, ইন্দ্রিয়দমন, নিত্য উপাসনা, পরসেবা, জীবে দয়া, স্বপাকভোজন, বেদ পুরাণ ভাগবত বাইবেল্ কোরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ, ভক্তোৎসব, সাধুসঙ্গ, মানসে ভক্তযোগ, সংসার পালন সমস্তই আছে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে ধর্ম্মসাধন করা, পরিবার প্রতিপালন করা এ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। এই নিমিত্ত একদিকে যেমন যোগ ভক্তি সাধন কর্ত্তব্য, তেমনি যথা নিয়মে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাও বিধেয়। দান, উপবাস, জাগরণ, দরিদ্র ও সাধুসেবার বিধি প্রবর্ত্তিত আছে।

সাধারণ ব্যবহার। এ ধর্ম্মে কোন বাহ্য বেশভূষা নাই। মাদক-সেবন, দ্যূতক্রীড়া, আলস্যে বৃথা সময় ব্যয় নিষেধ। এই নব্য সম্প্রদায়ের সভ্যেরা বাল্য এবং বহুবিবাহকে পাপ মনে করেন, বিধবা ও সঙ্কর বিবাহ দেন, আহারাদি সম্বন্ধে কোন জাতি বিচার নাই, পরিষ্কার পুষ্টিকারক হয়, অথচ ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত, চিত্তকে অতিমাত্র প্রলুব্ধ না করে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সাধক শ্রেণীর মধ্যে অনেকে মৎস্য মাংস পলাণ্ডু ব্যবহার করেন না। তীর্থভ্রমণ নাই, কিন্তু গিরি নদী কানন উপবন সুরম্য স্থান সকল পর্য্যটনের ফলবত্তা ইহাঁরা স্বীকার করেন। স্ত্রীশিক্ষা দান বিধি, অবরোধপ্রণালী প্রচলিত আছে অথচ নাই। পূজার অগ্রে আহারসম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ নাই। ইন্দ্রিয়সংযম ও বৈরাগ্যসাধনবিষয়ে কোন অস্বাভাবিক সাধন দেখা যায় না। "যুক্তাহারবিহারস্য" ইত্যাদি শ্লোকের ইহাঁরা পক্ষপাতী। সাধারণ লোকের ন্যায় আহার, পান, নিদ্রা ও সংসারপালন করেন, কিন্তু গৃহাশ্রমকে ধর্ম্মসাধনের স্থান বলেন, ধর্ম্মানুসারে সকল কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন, সভ্য ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

আহার পানের জন্য ভাবিবে না, কিন্তু যথাসাধ্য পরিশ্রম করিবে, বৈরাগ্য বিষয়ে এইরূপ বিধি। স্বজাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন এবং রাজভক্তি পোষণ ধর্ম্মনিয়মের অন্তর্গত। ইহাঁদের কয়েক জন ধর্ম্মযাজক আছেন। তাঁহাদের প্রতি উপদেশ যে কেহ কল্যকার জন্য ভাবিবে না, কিন্তু অটল ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত প্রভুর সেবা করিবে। ইহাঁরা পুস্তক পত্রিকা প্রণয়ন, উপদেশ দান, বক্তৃতা, শাস্ত্রপাঠ, কথকতা নামগান করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন।

এধর্ম্মে সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, ধর্ম্মদীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং সম্প্রদায় স্থাপন দিবসে বার্ষিক উৎসব, প্রতি দিন আহারের সময় ঈশ্বরস্মরণ। এতদ্ভিন্ন গৃহপ্রবেশ ও অন্যান্য শুভকর্ম্মে ও গৃহকার্য্যে ইষ্ট দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক। কলিযুগে ইহা একটি বিধাতার অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মবিধান। ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ত্রিবিধ যোগ একত্রীভূত হইয়াছে।